ইসলামে সমাজবিজ্ঞান

ড. এম. মোসলেহ উদ্দিন
ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

ইসলামে সমাজবিজ্ঞান

ড. এম. মোসলেহ্ উদ্দিন
ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী

অনুবাদ
ড. এ. কে. এম. মুহিব্বুল্লাহ
মো. শাহেদ হারুন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.amarboi.org

ইসলামে সমাজবিজ্ঞান

মূল : ড. এম. মোসলেহ উদ্দিন
ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী

অনুবাদ : ড. এ. কে. এম. মুহিব্বুল্লাহ
মো. শাহেদ হারুন

ISBN : 978-984-8471-06-7

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা - ১২৩০

ফোন : ০২-৮৯১৭৫০, ০২-৮৯২৪২৫৬

E-mail : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com

Website : www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর : ২০১৪

আশ্বিন : ১৪২১

জিলহজ : ১৪৩৫

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র US $ 10

Islame Samaj Biggan (Sociology & Islam and Siagatul Ulum Al-Iztimaeyyah) originally written by Dr. M. Muslehuddin & Dr. Ismail Raji al-Faruqi. Translated by Dr. A. K. M. Muhibbullah and Md. Shahed Harun. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka - 1230. Phone : 02-8917509, 02-8924256. E-mail: *biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com*, Website : *www.iiitbd.org*, Price : Tk. 200, U.S $. 10

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

'ইসলামে সমাজবিজ্ঞান' শীর্ষক এ গ্রন্থটি মূলত দু'টি প্রামাণ্য গ্রন্থের অনূদিত সংকলণ। বইটির প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ড. এম. মোসলেহ উদ্দিন লিখিত Sociology and Islam শীর্ষক ইংরেজি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ যেটি ইসলামিক বুক ট্রাস্ট, কুয়ালালামপুর কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এতে সমাজবিজ্ঞান ও এর বিভিন্ন মতবাদকে ইসলামি সমাজ পদ্ধতির সাথে তুলনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ইসলামি সমাজের চিরন্তন মূলনীতিসমূহের সাথে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য মতবাদের বিরোধিতাকেও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। 'সমাজবিজ্ঞানের ইসলামিকরণ' শিরোনামে গ্রন্থটির তৃতীয় ভাগ ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকীর 'সিয়াগাতুল উলুম আল ইজতিমাইয়্যা' শীর্ষক আরবি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ যেটি IIIT কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ড. ফারুকী সংক্ষিপ্ত এ গ্রন্থটিতে সমাজবিজ্ঞানের ইসলামিকরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানের গভীরে প্রোথিত ইসলামি বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকাশে প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের প্রশিক্ষণের দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর শিক্ষক ড. এ. কে. এম. মুহিব্বুল্লাহ এবং মো. শাহেদ হারুন গ্রন্থটির অনুবাদ করে আমাদেরকে কৃতার্থ করেছেন। আশা করি গ্রন্থটি একদিকে জ্ঞানপিপাসুদের জন্য একটি উপহার হিসেবে বিবেচিত হবে, অপরদিকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য একটি রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবেও গণ্য হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ শেষে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে পেরে বিআইআইটি সত্যিই আনন্দিত। গ্রন্থটি পাঠকমহলে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হলেই কেবল আমাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের প্রয়াস কবুল করুন! আমিন॥

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রকাশনা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.amarboi.org

সূচি

সমাজবিজ্ঞান ও ইসলাম : ইসলাম এবং এর সামাজিক পদ্ধতির তুলনামূলক অধ্যয়ন
- ড. এম. মোসলেহ উদ্দিন

ভূমিকা vii

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায় বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান ০১
দ্বিতীয় অধ্যায় ইতিবাচকবাদ (Positivism), অঙ্গবাদ (Organicism) ০৫
তৃতীয় অধ্যায় সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য ধারা ০৯
চতুর্থ অধ্যায় সমাজ বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিভিন্ন পরিবর্তন ১৮
পঞ্চম অধ্যায় সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস ২০
ষষ্ঠ অধ্যায় সামাজিক বিবর্তন ২৭
সপ্তম অধ্যায় সামাজিক পরিবর্তন ৩০
অষ্টম অধ্যায় সমাজবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩৩
নবম অধ্যায় নীতিবিজ্ঞান ৪০
দশম অধ্যায় নৈতিকতার পরিবর্তন ৪৮

দ্বিতীয় ভাগ

একাদশ অধ্যায় ইসলামের সামাজিক মতবাদ ৫৩
দ্বাদশ অধ্যায় কুরআনের বাণী ৬২
ত্রয়োদশ অধ্যায় ইসলামি সমাজব্যবস্থা ৮৯
চর্তুদশ অধ্যায় আইন ও বিচার ১২৭
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম ১৪৭
ষোড়শ অধ্যায় মানুষ স্বভাবজাতভাবে ইসলামি সমাজের জন্য তৈরি ১৫৬
সপ্তদশ অধ্যায় ইসলামে সামাজিক বিবর্তন ১৬৩
অষ্টাদশ অধ্যায় উপসংহার ১৬৯
গ্রন্থপঞ্জি ১৭৭

www.amarboi.org

সমাজবিজ্ঞানের ইসলামিকরণ

- ড. *ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী*

পশ্চিমা বিশ্বে সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি	১৮৪
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কিছু নমুনা	১৮৫
পশ্চিমা জ্ঞান পদ্ধতির ত্রুটি	১৮৬
ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও জাতিগত মূল্যবোধ	১৮৯
সমাজবিজ্ঞানের ইসলামিকরণ	১৯২
কার্যকরিতা প্রসঙ্গে কিছু প্রস্তাবনা	১৯৫
অধ্যয়নের বিষয়বস্তু ও গবেষণার উপকরণ	১৯৭

www.amarboi.org

সমাজবিজ্ঞান ও ইসলাম

ইসলাম এবং এর সামাজিক পদ্ধতির তুলনামূলক অধ্যয়ন

ড. এম. মোসলেহ্ উদ্দিন

www.amarboi.org

ভূমিকা

সমাজবিজ্ঞান নিঃসন্দেহে একটি জটিল বিষয়। যেহেতু এর বিশ্লেষণ ও আলোচনার ক্ষেত্র আনেক ব্যাপক। তদুপরি সমাজবিজ্ঞানীগণ তাদের এই বিদ্যা চর্চায় দুরূহ মতবাদ ও কঠিন শব্দের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো জটিল রূপ দিয়েছেন।

সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমাদেরকে অসংখ্য মতবাদের প্রবক্তাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু ও বৈচিত্রময় পদ্ধতির মুখোমুখি হতে হয় । এ প্রসঙ্গে Peter H. Mann-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

'সামাজিক কাঠামোর সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার প্রতিফলন বৈচিত্রময় ও জটিল প্রক্রিয়ায় আমরা অধ্যয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাই। তাই যদি আমরা দাবি করি সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন তা অযৌক্তিক দাবি মনে হবে। কোনো সমাজবিজ্ঞানী কখনো অস্বীকার করবে না যে সমাজের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য বিষয়। শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে বিষয়টি জটিল ও দুরূহ। বরঞ্চ এটাও একটা কারণ যে সমাজবিজ্ঞানী নিজেও এই অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের অংশ। এর সাথে তার তাবৎ মূল্যবোধ, আগ্রহ ও উন্নাসিকতা জড়িত[১]।'

সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কিত অধ্যয়নের অংশ হিসেবে সমাজের মানবিক আচরণের সাথে সম্পৃক্ত। এখানে আলোচনার মূল ভিত্তি হলো, সামাজিক কাঠামো এবং আন্তঃ ব্যক্তি ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া। তাই সমাজবিজ্ঞানীর প্রধান সমস্যা হচ্ছে মানব সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করা যা কিনা একটি বৈচিত্রময় ও অবিরাম প্রক্রিয়া। এই জটিলতা বোঝাতে আমরা আবারো Mann এর বক্তব্য তুলে ধরতে চাই। যে বিষয়ে কোনো বিশদ ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় সমাজবিজ্ঞানীগণ এই চেষ্টা করেই সময় অপচয় করছে[২]।

মানবিক আচরণ ও তার ধরনের ব্যাখ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোনো সাধারণ সূত্রের আওতায় আনা অসম্ভব। তাই Comte যখন মানুষ ও সমাজের একটি সাধারণ বিজ্ঞানের কথা বলেন তখন মূলত একটি অসাধ্য সাধনের কথা বলেন।

---

[১] Mann, Methods of Sociological Enquiry, P. 2

[২] Ibid

www.amarboi.org

Comte প্রথম ব্যক্তি নন যিনি সমাজ অধ্যয়নের জন্য একটি ইতিবাচক বিজ্ঞানের সন্ধান করে বেড়ান। এ বিষয়ে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে গ্রিকরাও কিছু কিছু উদ্যোগ নেয়। কিন্তু সেই থেকে এযাবৎ সামাজিক প্রপঞ্চসমূহের অবিরাম ও ক্ষণে আকস্মিক পরিবর্তনের কারণে তারা বারবার হোঁচট খায়। কোনো সাধারণ মতবাদের প্রচলন ঘটানো সম্ভব হয়নি। যার আলোকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও তার ধরন নিয়ে আলোচনা করা যায়। তাই বলা যায় চরম জটিলতার কারণে সামাজিক প্রপঞ্চসমূহকে নির্দিষ্ট কোনো বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের আওতায় আনা সম্ভব নয়।

আমরা বিভিন্ন মতবাদের আলোকে যখন সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব, তখন তা এক বিভ্রান্তিকর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। এখানেই আমরা ইসলামি সমাজব্যবস্থার সাথে সমাজবিজ্ঞানের পার্থক্য খুঁজে পাব। আরো অনেক তারতম্যও উপলব্ধি করতে পারব। যেমন- সাংঘর্ষিক সমাজ বৈজ্ঞানিক মতবাদের সাথে ইসলামি সমাজব্যবস্থার চিরঞ্জীব মূলনীতির পার্থক্য। তাদের সীমাবদ্ধতার সাথে আল্লাহর আইনের সার্বজনীনতার পার্থক্য এবং পরিবর্তন মানব মানসের সাথে প্রজ্ঞাময় আল্লাহর স্থায়ী পরিকল্পনার পার্থক্য। যদি আমরা সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ঘরানার মতবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাব এযাবৎ অসংখ্য মতবাদের জন্ম হয়েছে। কিন্তু একটির সাথে আরেকটির কোনো মিল নেই। বরঞ্চ অনেক সময় পরস্পর বিরোধিতা চোখে পড়ে। সমাজ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ক্ষণে ক্ষণে আমূল পরিবর্তনের শিকার হয় বলে এর আদি উৎস খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাই এর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারেও সংশয় দেখা দেয়। প্রতিটি মতবাদই অমিমাংসিত থেকে যাওয়ার কারণে অপেক্ষায় থাকেতে হয় কখন এর বিরুদ্ধবাদীরা এর ব্যাখ্যা দিবে। তারাও অবশ্য পরস্পরবিরোধী সাংঘর্ষিক মতবাদ চর্চার বেড়াজালে আবদ্ধ। বৈষয়িক প্রপঞ্চসমূহ এতটাই জটিল ও বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে যে সমাজ বৈজ্ঞানিক মতবাদসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভবনার পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে The Nature and Types of Sociological Theory[৩] এর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো : আমরা এখন ইতিবাচকবাদ ও সংগঠনবাদের মূল সংশ্লেষণ যা সমাজবিজ্ঞানে প্রথম সংগতির জন্ম দেয়- এত দূরে সরে এসেছি যে, এর দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মূল পরিপ্রেক্ষিত এখন আর খুঁজে বের করা

---

[৩] Martindale, The Nature and Types of Sociological Theory, P. 7-9

www.amarboi.org

সম্ভব নয়। মূল সূত্রের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেই ইতিবাচক সংগঠনবাদের পূর্ণ ভাবার্থ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সমাজবিজ্ঞানের পরবর্তী যুগের সাংঘর্ষিক মতবাদের ক্ষেত্রে একই কৌশল প্রযোজ্য। যদিও এখানে মতবাদজনিত যে রূপান্তর আমরা দেখতে পাই তার উৎপত্তি ঘটে সমাজ-রাজনৈতিক আন্দোলনের চাপে। একই সময়ে সমাজ বৈজ্ঞানিক প্রাতিষ্ঠানিকবাদের ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে পুরানো আদলে তবে অনাকাঙ্ক্ষিত ও ভিন্ন রূপে।

তাই এখনো আমাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে পুরাতন সমাজবিজ্ঞানগুলোকে নতুন করে মূল্যায়ন করা। তবে সমস্যার শেষ এখানেই নয়। কিছু কিছু বিষয় এমন রয়েছে এক কালে তা গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও এখন সেগুলো অর্থবহ নয়। যেমন বর্তমানে সমাজের ভৌগলিক, বৈচিত্রময় পরিবেশ ও আবহাওয়াজনিত ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন এখন আর নেই। জৈবিক ও জাতিগত সামাজিক মতবাদের মতে এগুলোকেও বাদ দিতে হবে।

এই বিষয়ে সবচেয়ে জটিল সমস্যা হচ্ছে করণীয় কী রয়ে গেছে তা নির্ধারণ করা। সমাজবিজ্ঞানের প্রথম আবির্ভাব হয় পশ্চিমা দর্শনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরূপে। কিন্তু নতুন মতবাদের প্রবক্তাগণ পুরাতন ধারার প্রতিপত্তিকে যখন খর্ব করল তখন এটি একটি স্বাধীন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। তারপর যখন এই ক্ষেত্রে নতুন বিশেষায়িত বিশ্লেষণ পদ্ধতি সংযুক্ত করা হলো তখন তা একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হলো। এতে করে নিজস্ব রহস্য ও সত্য উদঘাটনের সক্ষমতা অর্জন করল। সাথে সাথে সকল সূত্রকে নিজেদের নির্ধারিত মানদণ্ডে বিচার করার সুযোগ পেল। সমাজবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য পশ্চিমা জ্ঞান বিজ্ঞানের পদ্ধতির সাথে ব্যাপক সম্পর্ক রয়েছে। প্রথম দিকে সমাজবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তখন সমাজ বৈজ্ঞানিক মতবাদ চর্চাও প্রধান দায়িত্বগুলোর একটি ছিল এই সম্পর্কগুলো তুলে ধরা। এতে করে ধীরে ধীরে খোদ সমাজবিজ্ঞান থেকেই আমরা অনেক দূরে যাই। ফলে এক পর্যায়ে নিজেদেরকে মতবাদসমূহের সাধারণ ইতিহাসের গণ্ডিতে আবিষ্কার করতে হয়।

নির্দিষ্ট সমাজ বৈজ্ঞানিক মতবাদের সাথে অনেক সময় বিভিন্ন স্বার্থ জড়িত থাকতে দেখা যায়। তাই দর্শনের বাইরে অন্যান্য বিদ্যারও উপস্থিতি চোখে পড়ে। সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক মতবাদগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিল ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান। তাছাড়া দর্শনের সাথে তা ছিল একেবারে শুরু থেকে। তুলনামূলক পদ্ধতির

www.amarboi.org

আবির্ভাব ঘটলে এর সাথে যুক্ত হয় সমাজ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াবাদের। এই সময়টিতে অন্যান্য নতুন মতবাদগুলোর সাথে আরো অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদের কথা বলা যায়। এই মতবাদ ইতিহাস ও নৃবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আইনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। পক্ষান্তরে সামাজিক ক্রিয়া মতবাদ সম্পর্ক স্থাপন করে ইতিহাস ও অর্থনীতির সাথে। বহুত্ববাদী আচরণবাদের সম্পর্ক হয় মনোবিজ্ঞান ও Demography বা জনমিতির।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে, সে আলোকে বলা যায় সকল মতবাদের সংহতি একটি অসম্ভব বিষয়। মানবজাতিকেও সমাজবিজ্ঞান উপহার হিসেবে কোনো ইউরোপীয় উপহার দিতে পারবে না। বড়জোর যদি শক্তি ও যুক্তির সমন্বয়ে নতুন একটি সংশ্লেষণ উপহার দিতে পারে। এই কারণেই হয়তো নিউটন ও মেক্সওয়েল চেষ্টা সাধ্যের মাধ্যমে যুক্তির আলোকে দৈবক্রমে তাদের মতবাদগুলোর ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন এবং সেগুলোকে যার যার ভালোবাসার আগুনে পুনরায় নিক্ষেপ করেন[৪]।

সমাজবিজ্ঞানের গতি প্রকৃতি সংক্ষেপে তুলে ধরতে আমরা Prof. Martinedale-এর The Nature and Types of Sociological Theory এর কিছু উদ্ধৃতি পেশ করলাম। কিন্তু তার শেষ মন্তব্য বিশ্লেষণ করলে তা আরো হতাশাব্যঞ্জক মনে হবে। নিউটন ও মেক্সওয়েলের সমাজ বৈজ্ঞানিক মতবাদ এখন সেকেলে এবং অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। পক্ষান্তরে ইসলাম সমাজ ও জীবনের যে দিকনির্দেশনা আমাদের দিয়েছে তা যথার্থ ও সুনিয়ন্ত্রিত, যা কিনা সর্বকালীন ও সর্বজনীন।

---

[৪] Martindale, op. cit, p. 541

www.amarboi.org

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে সমাজবিজ্ঞান

ক. সংজ্ঞা

Robert Mertin-এর মতে সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে, অতি প্রাচীন বিষয়ের অতি সাম্প্রতিক বিজ্ঞান। তবে সমাজ সম্পর্কিত বিদ্যাগুলোর একটি হওয়াতে এটি মানবিক আচরণ নিয়ে বিশ্লেষণ করে। তাই এটি জীববিজ্ঞান, পর্দার্থ ও রসায়নের মতো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলো থেকে ভিন্ন। একই কারণে সাহিত্য, সংগিত ও কলার মতো মানবিক বিভাগ থেকেও ভিন্ন।

সাধারণত এর সংজ্ঞা দেওয়া হয় মানব সমাজের উৎপত্তি, ইতিহাস ও সংবিধানের অধ্যয়ন অথবা বিজ্ঞান হিসেবে। বিভিন্ন উপাদান, প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে এযাবৎ যা কিছু অর্জন করেছে তার আলোকে বলা যায় এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব ও সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞানের সমৃদ্ধি। এখানে মানব জাতিকে দেখা হয় দলবদ্ধ হয়ে বসবাসকারী জীব হিসেবে। তাছাড়া আরো অনেক সংজ্ঞা রয়েছে।

একটি বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান চেষ্টা করে যাচ্ছে সাধারণিকরণ চর্চার। যে কোনো বিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু সূত্র কিংবা মৌলনীতির আওতায় তা করা। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু হচ্ছে ছোট পারিবারিক দল থেকে সামাজিক পর্যায় বৃহত্তর দল[১]।

যেহেতু উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজবিজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। সেই হিসেবে বলা যায় এর বয়স দুই শত বছরের বেশি নয়। Witz এর মতে ১৮৩০ থেকে ১৮৪২ সালের মধ্যে যে লিখনিগুলো প্রকাশ পায় সেগুলোর কল্যাণেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান স্বীকৃতি পায়। Auguste Comte এর Course de Phelosophie Positive এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা না করলেও Comte একটি নতুন নাম উপহার দেন। যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

---

[1] Mann, Methods of Sociological Enquiry, P. 2

www.amarboi.org

নিজের একটি আসন গড়ে নেয়। Comte যে প্রকল্প হাতে নেয় তার উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের ইতিবাচক পদ্ধতিসমূহের ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির বিস্তার ঘটানো[২]।

খ. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিবর্তন

যুক্তির পক্ষে প্রমাণ আবিষ্কার করার মাধ্যমেই গ্রিক দর্শন বিজ্ঞানের জগতে তাদের প্রথম দর্পণের সূচনা করে। নতুন যুক্তির আলোকে বুঝতে সক্ষম হয় যে যুক্তির আলোকে স্বপ্রণোদিত পন্থায় বাস্তব প্রমাণাদির ভিত্তিতে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এভাবেই যুক্তিবাদ বিজ্ঞানের একটি অন্যতম চর্চার মাধ্যমে পরিণত হয়।

ইটালিতে জন্ম নেওয়া রেনেসাঁর কারণে যখন কলা ও শিল্পের ব্যাপক উন্নতি হতে থাকে। তখন চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে আলোকিত জনেরা বিশ্বাস করতে থাকেন যে যথার্থ জ্ঞান চর্চার পদ্ধতি অবলম্বন করে যদি নিরীক্ষাকে কাজে লাগানো যায় তাহলে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে।

এভাবেই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান চর্চার অগ্রযাত্রার সূচনা হয়। অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীর দিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। পরবর্তী শতাব্দীতে ডেকার্ত ও গ্যালিলিও এর কল্যাণে তার মধ্যে পূর্ণ গতির সঞ্চার হয়[৩]। অতঃপর নিউটন তাঁর মধ্যাকর্ষণ সূত্রের (১৬৮৭) মাধ্যমে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রাকে আরো ত্বরান্বিত করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে George Burkeley তার De Motu (১৭১৩) প্রবন্ধে বৈষয়িক বিশ্বের মহাজাগতিক শক্তির সাথে জগতের নৈতিক বিশ্বের মনস্তাত্ত্বিক শক্তির একটি তুলনামূলক আলোচনা করেন। সৌরজগতের উপাদানগুলো একটি আরেকটির যেভাবে আকর্ষণ করে মানুষের মনের ক্ষেত্রেও একটি আরেকটিকে আকর্ষণ করে। মহাজাগতিক উপাদানগুলোর মতোই একজন মানুষ কাছের জনের প্রতি আকর্ষণ বেশি অনুভব করে। তার এই প্রবন্ধের নতুন ধারণাই সমাজ বৈজ্ঞানিক ধারণার সূত্রপাত ঘটায়। মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সমাজবিজ্ঞান আলোর মুখ দেখে বলা যায়। আমাদের আলোচ্য বিষয় Sociology বা সমাজবিদ্যা হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের শেষ ধারা যা উনবিংশ শতাব্দীতে স্বীকৃতি লাভ করে।

---

[2] Witz, Introduction to the Science of Sociology, P. 10

[3] Hosolitz, A Reader's Guide to Social Sciences, P. 8

www.amarboi.org

গ. সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারা

প্রখ্যাত দার্শনিকদের হাত ধরে সমাজবিজ্ঞান তার অগ্রযাত্রা শুরু করে। যেমন, ভলতেয়ার, মন্তেস্কো, গোটে, ফারগোসন ও তাঁর সহযোগীরা। তারা সবাই একই ধারায় চিন্তাভাবনা না করলেও কিছু কিছু বিষয়ে তাদের মতামত ছিল এক। তারা সবাই ছিলেন Enlightenment period বা আলোকিত যুগের অগ্রপথিক। বিজ্ঞানের পথে জঞ্জাল সৃষ্টিকারী সকল সনাতন বাধা তারাই দূর করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামাজিক প্রপঞ্চসমূহের বৈধতা ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পেলে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রায়োগিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলো নব-বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই সময়টাতে ইউরোপে আমরা নৃবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, ভূগোল, আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্বকে মজবুত অবস্থানে পৌঁছে বলে দেখতে পাই।

বিভিন্ন কারণে উনবিংশ শতাব্দীকে আমরা প্রগতির যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি। এই শতাব্দীতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামাজিক বিবর্তন এক যুগে নতুন সামাজিক চিন্তার প্রবর্তন ঘটায় যা Comte এর ইতিবাচকবাদে প্রতিভাত হয়। তার এই Positivism পরবর্তীতে ইতিবাচক সংগঠনবাদ হিসেবেই সুধী সমাজের ব্যাপক সংস্পর্শে আসে।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিবাচকবাদ ও অঙ্গবাদ

ক. ইতিবাচকবাদ (Positivism)

ইতিবাচকবাদ হচ্ছে Comte এর প্রবর্তিত একটি দার্শনিক ধারা। এখানে শুধুমাত্র ইতিবাচক বাস্তবতা ও পর্যালোচনাযোগ্য প্রপঞ্চসমূহের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফলে উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলোর সূত্র ও সম্পর্কগুলো বিশ্লেষণ করা। এই ক্ষেত্রে আদি উৎস ও কারণসমূহ কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়[1]। ইতিবাচকবাদ দ্বারা Comte মূলত সামাজিক যথার্থতাকে বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আলোকেই সমাজের সংস্কার হবে। ইতিবাচকবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল নিরীক্ষার ভিত্তিতে শুধুমাত্র বাহ্যিক বিশ্বের বিশ্লেষণ করা।

Parsons এর মতে একটি মতবাদ হিসেবে ইতিবাচকবাদের বিশ্বাস হচ্ছে এটাই যে সকল মানবিক কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশনা ও বিশ্লেষণের জন্য বিজ্ঞানই যথেষ্ট ও চূড়ান্ত[2]। ইতিবাচকবাদের প্রয়োগের মাধ্যমে Comte চেয়েছিলেন সমাজবিজ্ঞান তার প্রয়োগ করে বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে একে পুনর্গঠিত করতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি পুরাতন ধারার সংগঠনবাদকে তাঁর নিজের ইতিবাচকবাদের সাথে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই Readon এর মতে Comte এর এই প্রকল্প ছিল আভিধানিক। তাছাড়া তার ইতিবাচকবাদও ছিল অনেকটা ত্রুটিপূর্ণ। Comte মূলত দর্শনের সাথে বিজ্ঞানের অযৌক্তিক সংশ্লেষণের অপচেষ্টায় অভিযুক্ত। তার মহান উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতি, মানবজাতি ও সমাজের একটি সমন্বিত ও সার্বজনীন বিজ্ঞানের প্রবর্তন। তবে মানব মানসিকতার বিষয়ে সম্পৃক্ত না হওয়ার কারণে তাঁর ইতিবাচকবাদ অনেকটাই ভিত্তিহীন ও আভিধানিক হয়ে ওঠে। তাছাড়া প্রকৃতিবাদের মোড়কে যে মতবাদের প্রচলন ঘটান তার সাথেও সাংঘর্ষিক[3]।

---

[1] The Oxford English Dictionary, Positivism.

[2] Parsons, Theories of Society, P. 1209

[3] Reardon, Religious Thought in the Nineteenth Century, P. 24

www.amarboi.org

খ. অঙ্গবাদ (Organicism)

এই মতবাদ অনুযায়ী সমাজের সাংগঠনিক কাঠামো হচ্ছে বৈষয়িক উপাদানসমূহে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর অন্তর্নিহিত যোগ্যতার ফসল[৪]। Martindale এর মতে মতবাদসমূহের ঐ ধারাকে বুঝায় যার আওতায় পৃথিবীর সবকিছুর চিত্র তুলে ধরা হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের আদলে। দর্শন হিসেবে অঙ্গবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করে বিশ্ব, মহাজগৎ অথবা সবকিছুর সার্বিকতার বিশ্লেষণ করা। মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেমন সম্পর্ক তেমন সম্পর্কের মাধ্যমেই সবকিছুই জীবিত ভাবা। পক্ষান্তরে, ইতিবাচকবাদের প্রত্যেক প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা তার মাধ্যমেই করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে কঠোর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরন করতে হবে। এর বাইরে কোনো প্রবণতা, ধারণা ও মতবাদের গুরুত্ব দেওয়া যাবে না[১]।

এভাবেই আমরা অঙ্গবাদ ও ইতিবাচকবাদের মধ্যে টানাপোড়েন দেখতে পাই। প্রথমটির উৎপত্তি আদর্শবাদ থেকে হলেও দ্বিতীয়টির উৎপত্তি হয় বিজ্ঞানের উত্থানের সাথে সাথে। কেউ যদি অঙ্গবাদকে সঠিকভাবে বুঝতে চায় তাহলে তাকে আদর্শবাদের দ্বারস্থ হতে হবে। তাহলেই তার প্রকৃত অর্থ বুঝা সম্ভব। দার্শনিক আদর্শবাদের মতে সত্য নিজেই ধ্যান ধারণার প্রকৃতিতে লুকিয়ে রয়েছে। আধুনিক ভাষায় বলা যায়, সকল সত্যের মধ্যে ধ্যান ধারণাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ[২]।

প্লেটোর ধারণা মতে বস্তু সম্পর্কিত ধারণা একই থেকে যায়। তবে বস্তু সদা পরিবর্তনশীল। যেমন, কেউ ঘোড়া সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে অনেক ঘোড়া দেখলেও তার সেই ধারণা পাল্টায় না। কিন্তু ঘোড়াগুলোর মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসতে পারে। সহজ ভাষায় বলা যায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি কিংবা পর্যালোচনার চাইতে ধারণাই হচ্ছে জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তাই বলা যায় গ্রিক আদর্শবাদ অনুযায়ী তা বুঝা হয় তার চেয়ে সে বিষয়ে ধারণা করাটাই উত্তম।

অঙ্গবাদ যেহেতু আদর্শবাদ থেকেই উৎসারিত সেহেতু বুঝার চাইতে ধারণার উপর গুরুত্বরোপ করে বেশি। কিন্তু Comte এর ইতিবাচকবাদ এর বিপরীতে পর্যালোচনামূলক বুঝার উপর নির্ভরশীল।

---

[4] The Oxford English Dictionary, Organicism.

[১] Martindale, The Nature and Types of Sociological Theory, P. 52-53

[২] Ibid, P 53

www.amarboi.org

Comte এর মতে ইতিবাচকবাদ হচ্ছে সামাজিক প্রপঞ্চের উপর ঐ সকল পদ্ধতির প্রয়োগ যেগুলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে। তিনি চেয়েছেন উন্নতি ও প্রগতির ঊনবিংশ শতাব্দীর চাহিদা মেটাতে ইতিবাচকবাদ ও অঙ্গবাদের মধ্যে সংশ্লেষণ ঘটাতে। কিন্তু ইতিপূর্বের আলোচনা থেকেই আমরা বুঝেছি এই দুইয়ের মধ্যে ঐক্য সাধন করা সম্ভব। ইতিবাচকবাদ যেখানে প্রায়োগিক জ্ঞানের পক্ষে সেখানে অঙ্গবাদ হচ্ছে প্রাচীন গ্রিক দর্শনের আদর্শবাদের পক্ষে। কেউ যদি কঠোরভাবে ইতিবাচকবাদ অবলম্বন করতে চায় তাহলে তাকে অঙ্গবাদ পরিত্যাগ করতে হবে। তাই আমরা দেখেছি অবশেষে ইতিবাচক অঙ্গবাদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে হয়েছে।

আমাদের আরো লক্ষ্য রাখতে হবে যে, Comte কে সমাজবিজ্ঞানের পিতা মনে করা হলেও Saint Simon মূলত সমাজের বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন নিয়ে আলোচনা করেন। Comte শুধুমাত্র তার শিষ্য হিসেবে তার এই ধারণাকে নতুন করে তুলে ধরেছেন। মূলত Comte (১৭৯৮-১৮৫৭) ও Herbert Spencer (১৮২০-১৯০৩) হচ্ছেন প্রাথমিক সমাজবিজ্ঞানের প্রবক্তা মাত্র।

অধ্যাপক Martindale সমাজ বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলোর সতর্ক বিশ্লেষণ করেন। তার মতে এগুলোকে (১) সাংঘর্ষিক মতবাদ (২) সমাজতাত্ত্বিক প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ (৩) সামাজিক আচরণবাদ ও (৪) সমাজতাত্ত্বিক ক্রিয়াবাদ এই চার ভাগে বিভক্ত করা যায়।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য ধারা

ক. সাংঘর্ষিক মতবাদ (Conflict Theory)

আগেই বলা হয়েছে ইতিবাচক অঙ্গবাদ ছিল প্রাচীন গ্রিক দর্শনের রক্ষণশীলতার সাথে ঊনবিংশ শতব্দীর উদারতাবাদের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। কিন্তু চিন্তাধারায় উভয় মতবাদ ছিল বিপরীতমুখী। সমাজ সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে অঙ্গবাদের মূল ভিত্তি ছিল কৃষ্টি ও প্রথা; আর এগুলোকে ইতিবাচকবাদ মনে করত অন্ধ অনুকরণ ও অযৌক্তিক খোলশ ও প্রাচীন ভ্রান্তির প্রতিফলন। তাই সাংঘর্ষিক এই দুই মতবাদের মধ্যে কখনো সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়।

তাছাড়া আন্ত-মানবিক সংঘর্ষ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অঙ্গবাদ ছিল বেজায় দুর্বল। Comte সামাজিক সংঘর্ষকে বেশি ভয় করতেন। তিনি এমন একটি কর্তৃত্ববাদী সমাজের স্বপ্ন দেখতেন যেখানে বিরাজ করবে বর্ণ ব্যবস্থা।

প্রতিটি সমাজই মূলত সংঘাতপূর্ণ। Heraclitus সৃফীবাদের (Sophists) মত প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকগণ মনে করতেন সামাজিক সংঘর্ষই হচ্ছে সামাজিক বাস্তবাদের প্রাথমিক অবস্থা। মধ্য যুগের আরব বিশ্বে ইবনে খালদুন এর মত দার্শনিকও সামাজিক সংঘর্ষের উপর একটি মতবাদ দিয়ে যান। তাঁর মতে সভ্যতার বিবর্তনে বিদুঈন ও শহরবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। একই সংঘর্ষ ও সংগ্রামের ভিত্তিতে Marchiavelli রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। পরবর্তী যুগে সেগুলোর উৎকর্ষ সাধন করেন Jean Bodin, Hobbes ও অন্যান্যরা।

ইতিবাচক অঙ্গবাদ যখন সংঘর্ষজনিত সামাজিক বাস্তবতার ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়। তখন সামাজিক চিন্তার জগতে নতুন এক মোড় দেখা দেয়। আর এই বিদ্যার পুনর্গঠনে প্রচেষ্টার নতুন একটি উদ্যোগ দেখা দেয় সংঘর্ষ কেন্দ্রিক মতবাদের চর্চাকে কেন্দ্র করে।

ইতিবাচক অঙ্গবাদের সামঞ্জস্য ও সংহতিমূলক পরিভাষার জায়গায় দেখা দেয় যুদ্ধ ও সংগ্রাম। এই ক্ষেত্রে যখন দলীয় সংঘর্ষের গুরুত্ব বেড়ে গেল তখন মানব জাতির উন্নয়নের চিন্তাধারায় পরিবার ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব হারিয়ে যায়।

www.amarboi.org

ইতিবাচক অঙ্গবাদ ও সংঘর্ষ মতবাদ বাস্তবে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ হলেও সমাজবিজ্ঞান মূলত কোনো আদর্শ নয়। বরঞ্চ, এটি হচ্ছে সামাজিক অবস্থার সমর্থনে বিভিন্ন মতবাদের সমাহার। সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যা সামাজিক জীবনের পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের কথা বলে। কিন্তু ইতিবাচক অঙ্গবাদের আবির্ভাব হয় একটি আদর্শগত মতবাদ হিসেবে তেমনি আবির্ভাব ঘটে সংঘর্ষ মতবাদের। উভয়েরই প্রচেষ্টা আবর্তিত ছিল সমাজ বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুকে ঘিরে। ফলে দৃশ্যপটে নতুন একটি মতবাদের আবির্ভাব দেখা দেয়। যার নাম হয় Sociological Formalism বা সমাজ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানিকতাবাদ।

খ. সমাজ বৈজ্ঞানিক আকৃতিবাদ

সমাজ বৈজ্ঞানিক আকৃতিবাদের মূল ভিত্তি ছিল পশ্চিমা দার্শনিক যুক্তিবাদের কিছু মৌলিক পরিপ্রেক্ষিত। এটি ছিল প্রয়োগবাদ ও বোধবাদের বিপরীত। জ্ঞানের প্রত্যায়নে এখানে বোধশক্তির পরিবর্তে যুক্তিকে মনে করাই হলো মৌলিক উপাদান[১]। একে মনে করা এমন এক সার্বিক মতবাদ যা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর লক্ষ্য হচ্ছে চিন্তাধারার আলোকে জগতের ব্যাখ্যা দেওয়া, যুক্তির আলোকে ব্যক্তিগত থেকে সামাজিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ করা এবং অযৌক্তিক সবকিছুর বিনাশ সাধন করা[২]।

প্রাচীন গ্রিক যুক্তিবাদে যুক্তির এই বিশ্বাস ছিল অপরিবর্তনীয় যা আকৃতি হিসেবে পরিচিত ছিল। চিন্তাধারার পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু যে সকল ধারণা বস্তু থেকে উৎসারিত তা কখনো বদলাবে না। তাই প্রাচীন বিশ্বে ধারণ, আকৃতি ও ধারণারই আধিপত্যই ছিল বেশি। কিন্তু আধুনিক বিশ্বের যুক্তিবাদ পরিচালিত হয় বোধগম্য গাণিতিক সূত্র দ্বারা। তাই বিজ্ঞানের কর্তব্য হচ্ছে শুধুমাত্র যুক্তি ও প্রয়োগের ধোপে টিকলেই কোনো জ্ঞানকে গ্রহণযোগ্য বলে প্রচার করা।

আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তিবাদ হচ্ছে নতুন স্বরূপ, নিয়ম ও মূলনীতির অনুসন্ধান। Immanuel Kant (১৭২৪-১৮০৪) তাঁর অদ্ভূত প্রকৃতির যুক্তিবাদ প্রবর্তন করে বলেন প্রপঞ্চজনিত বিদ্যা হচ্ছে দুই ধরনের : আকৃতি সম্পর্কীয় আর তা হচ্ছে নিশ্চিত এবং অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্পর্কীয় যা হচ্ছে শুধুমাত্র সম্ভবনা। আকৃতি এমন ধারণা যা অন্তর বহন করে অথবা জ্ঞানের এমন বস্তুনিষ্ঠাকে তার প্রচলিত রূপ দান করে অন্তর্ভুক্ত বিষয়। পক্ষান্তরে নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার সাথে সম্পৃক্ত এবং

---

[1] The Oxford English Dictionary, Rationlism.

[2] Ency. Of Social Sciences, Rationlism, (New York, 1931)

www.amarboi.org

আহরণ করা হয় বাহ্যিক পরিবেশ থেকে। তাই পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে। এই মতবাদের আলোকে সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় অন্তর্ভুক্ত বিষয় থেকে আহরিত নির্বস্তুক সামাজিক আকৃতির অধ্যয়ন। কিন্তু আকৃতি যেহেতু অন্তর থেকে উৎসারিত তাই এগুলো প্রায়োগিক কিছু নয়। বরঞ্চ আদর্শগত অথচ সমাজবিজ্ঞানের দাবি প্রয়োগবাদ এবং বিজ্ঞাসম্মত অধ্যয়ন ও নিরীক্ষা। তাই সমাজ বৈজ্ঞানিক আকৃতিবাদ দ্বারা এর দাবি পূরণ হওয়ার নয়। সুতরাং খুঁজে বেড়াতে হবে অন্য মতবাদ।

গ. সামাজিক আচরণবাদ

আকৃতিবাদী সংজ্ঞার আলোকে যখন বিষয়বস্তুও সমাজ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অপূর্ণতার শিকার হয় তখন আবির্ভাব হয় সামাজিক আচরণবাদের সমাজ বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের জন্য নতুন প্রায়োগিক পদ্ধতি প্রবর্তন করতে চায়। এজন্য প্রাচীন ধারাগুলোর পদ্ধতিগত দুর্বলতা ও আকৃতিবাদের প্রয়োগ বিরোধটির প্রবণতা পরিহার করার উদ্যোগ নেয়। খোঁজ শুরু হয় নতুন ইতিবাচকবাদী পদ্ধতির।

নব্য আদর্শবাদ ও তার শাখা প্রশাখাসমূহের সুবাদে ইউরোপে এই নতুন ধারার বিস্তার দেখা যায়। যেমন, বহুত্ববাদী আচরণবাদ, প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ ও সামাজিক কর্ম ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞানের জগতে ঢুকে সমাজ বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুসমূহের সূক্ষতর সংজ্ঞা খুঁজতে থাকে।

যেহেতু বিভিন্ন প্রপঞ্চের সাথে জড়িত সেহেতু Giddings এর নাম দেয় বহুত্ববাদী আচরণবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও স্বাধীন দলের বৈচিত্রের সমাহার হিসেবে দেখলেই সামাজিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

Gabriel Trade (১৮৪৩-১৯০৪) তাঁর প্রবন্ধসমূহের মাধ্যমে এই ধারার উৎপত্তি ঘটান। তাঁর মতে সমাজের মৌলিক একক হচ্ছে বিশ্বাস ও চাহিদা। আর মৌলিক গতি হচ্ছে পুনরাবৃত্তি, বিরোধিতা ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়া যা অনেকটা Hegel-এর সংশ্লেষণ ও বিভাজনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

Trade এর মতে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এক ধরনের সীমাবদ্ধতা যা প্রচারের সহায়ক এবং খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়া হচ্ছে আবিষ্কার যা কিনা সকল প্রকৃতির উৎস। অনুকরণ হচ্ছে আবিষ্কার অথবা নতুন ব্যক্তিগত মতবাদের সামাজিক প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতার প্রক্রিয়া। বিরোধিতা প্রতিভাত হয় যুদ্ধ, প্রতিযোগিতা ও আলোচনার মাঝে, যার শেষ হচ্ছে খাপ খাওয়ানো কিংবা নতুন আদর্শের উৎপত্তি। অনুকরণের মধ্যে দেখা গেছে অনেক সমস্যাই লুকিয়ে রয়েছে। অনুকরণ যখন অস্তিত্ব লাভ করে তখন তা

www.amarboi.org

এক জটিল কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়। তখন আর তাকে মৌলিক সামাজিক বাস্তবতা মনে হয় না। এটা কল্পনা করা সহজ যে বানর অনেক কিছুই দেখে দেখে করে। কিন্তু তাকে দিয়ে কোনো কিছু করানো দুরূহ ব্যাপার। তাই প্রকৃত অনুকরণ হচ্ছে শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা থেকে উৎসারিত[৩]। এই মতবাদের যে ঘাটতিটি লক্ষ্য করা গেছে তা হচ্ছে ভাষা সম্পর্কিত আন্ত-মানবিক মিথস্ক্রিয়াকে এখানে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে[৪]।

এটা স্পষ্ট যে বহুত্ববাদী আচরণবাদের মতবাদ ও পদ্ধতির দ্বন্দ্ব এতদিন সমাহিত ছিল। যার অর্থ হলো বোধবাদ ও ইতিবাচকবাদের মত যে এই মতবাদের অন্তর্নিহিত টানাপোড়নগুলো লুকিয়ে রাখা হয়। মতবাদ ও পদ্ধতি উভয়ক্ষেত্রে রূপান্তরকে সাধুবাদ জানানো হয়। এগুলোর পেছনে ছিল সামাজিক আচরণবাদের অন্যান্য শাখাসমূহ[৫]।

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ তার আকষর্ণের কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে পায় অঙ্গ ও ব্যক্তিত্বের মাঝে। পক্ষান্তরে, বহুত্ববাদী আচরণবাদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল গণ প্রপঞ্চ[৬]।

ব্যক্তিত্ব বলতে বুঝায় আচরণের কম বেশি সংগঠিত রূপকে। যেমন, চিন্তাভাবনা, অনুভূতি ও কর্মকাণ্ড যা প্রতিটি ব্যক্তিকে করে বৈশিষ্টমণ্ডিত।

Mead এর মতে অহংয়ের আবির্ভাব তখনই ঘটে যখন ব্যক্তি চিন্তাশীলতার সাথে নিজেকে নিয়ে ভাবতে পারে। যখন নিজেই নিজের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে। Mead (১৮৬৩-১৯৩১) মনে করেন সামাজিক শৃঙ্খলার মনোজাগতিক ভিত্তি হচ্ছে আত্ম-সংযম ও সহমর্মীতা। এগুলোর উৎস হচ্ছে সমাজিকরণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া থেকে উৎপাদিত হয় এমন এক পরিণত সামাজিক সত্ত্বার যা আত্মসমালোচনা ও চিন্তাশীলতার অলংকারে ভূষিত। তাই এই সত্ত্বা পারে নিজের আচরণকে সংযত করতে এবং অন্যদের অনুভূতি ও প্রত্যাশাকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে। তাহলে তার পক্ষেই সম্ভব সাফল্যের সঙ্গে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ও আন্ত-ব্যক্তি সম্পর্ক চর্চা করা[১]।

গুরুত্বপূর্ণ সংকেতের মাধ্যমে যোগাযোগ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে Mead বিশেষ অবদান রাখেন। ব্যাবহার ও পারস্পরিক বুঝা পড়ার আলোকে যে অর্থ তৈরি হয় তার মূল

---

[3] Martindate, The Nature and Types of Sociological Theory P. 337

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid, P, 339

[১] Biesanz, Introduction to Sociology, P. 334

www.amarboi.org

উৎস হচ্ছে প্রথাগত সংকেত। তাঁর মতে গুরুত্বপূর্ণ সংকেত হচ্ছে এমন একটি অঙ্গভঙ্গি যা অহংয়ের মধ্যে একই ধরনের আচরণ অথবা প্রবণতার উদ্রেক করে এই অংশিদারিত্বের প্রবণতা যোগাযোগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যখন ভাষার ব্যবহার হয় তখন ইঙ্গিতপূর্ণ সংলাপ থাকে সচেতন অবস্থায়[২]।

বহুত্ববাদী আচরণবাদের তুলনায় প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ সমাজ বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর সূক্ষ্মতর সংজ্ঞা নির্ণয়ে সক্ষমতা দেখায়। এখানে আন্ত-মানবিক আচরণের ভাষাগত কাঠামোর সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়। ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত মতবাদগুলোর আরো উন্নয়ন সাধিত হয় এবং এর সাথে সামাজিক কাঠামোর সম্পৃক্ততা আলোচনা করা হয়। এটাও লক্ষণীয় যে বহুত্ববাদী আচরণবাদের তুলনায় সমাজের সঠিক চিত্রায়নে এই মতবাদ ছিল আরো অনেক ভারসাম্যপূর্ণ উদারতাবাদের প্রবক্তা[৩]।

কিন্তু Martinadale এর মতে (এই মতবাদ) হচ্ছে একেবারেই আংশিক যার কারণে প্রতীকী প্রক্রিয়ার মধ্যেই তার ব্যাখ্যা সীমাবদ্ধ। তাই বলা যায় সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণে তা অপর্যাপ্ত[৪]।

সামাজিক কর্ম মতবাদ যেখানে ইতিহাস ও অর্থনীতির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা যেখানে তার আগের দুইটি শাখা মনোবিজ্ঞান ও জনমিতির সাথে তাদের সখ্যতা গড়ে তোলে। এই মতবাদের সুতিকাগার ছিল জার্মানি এবং প্রবক্তারা তাদের চিহ্নিত সমস্যগুলোর সমাধান দেয় ভিন্নভাবে।

এই মতবাদের পুরোধা ছিলেন Max Weber (১৮৬৮-১৯২০)। যখন Kant বলতে চেয়েছেন যে জ্ঞানের সঠিকতার উৎস হচ্ছে আকৃতি সেখানে তার বিরুদ্ধাচারণ করে যে মনোবিজ্ঞানের অধ্যায় সামাজিক আকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বরঞ্চ এর প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে সামাজিক কর্ম। তাঁর মতে সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে এমন একটি বিজ্ঞান যার লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক কর্মকাণ্ডসমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া। যাতে করে তার গতি ও প্রতিক্রিয়ার কারণিক ব্যাখ্যা চর্চা করা যায়[৫]। সামাজিক সম্পর্ক ও কাঠামোর ভিত্তিতে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাতে নির্দিষ্ট সামাজিক কর্মকাণ্ডের অস্তিত্বের সম্ভাবনাই প্রতিফলিত হয়। একটি রাষ্ট্রের কথাই ধরা যাক, তার জনগণের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতেই তার রূপরেখা গড়ে ওঠে। যখন তাদের কর্মকাণ্ড স্থির হয়ে যায় তখনই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলিন হয়ে যায়।

---

[২] Hosolitz, A Reader's Guide to social Sciences, P. 179

[৩] Martinadale, op. cit, P. 374

[৪] Ibid, P. 437

[৫] Ibid., P. 385

www.amarboi.org

Weber আচরণ ও প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে সংকেত বিজ্ঞানের পুর্ণগঠন চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, কর্ম হচ্ছে এক ধরনের সামাজিক গুণ। যদি তার সাথে যুক্ত হয় বস্তুনিষ্ঠ অর্থ। এই ক্ষেত্রে কর্মী হিসেবে ব্যক্তি অন্যের আচরণ বিবেচনায় রেখেই তার কর্মকাণ্ডের গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে[৬]।

সামাজিক আচরণবাদের ঘাটতি দেখা দেয় প্রধানত যখন মৌলিক ভাবনাগত সামাজিক কর্ম থেকে সামাজিক কাঠামোর দিকে উত্তোরনের সঠিক কোনো ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়। অথচ এটি এমন এক ক্ষেত্র যেখানে সকল শক্তির সমাবেশ প্রতিফলিত হয়। মোদ্দাকথা, Weber ধারণাগত উত্তোরনের জন্য যে সংকেত বিদ্যার ব্যবহার করেছেন তা মতবাদজনিত উত্তোরণ বা সংস্কারের কোনো উত্তম বিকল্প ছিল না[৭]।

Martindale মনে করেন, মতবাদের সংস্কার করতে গিয়ে নতুন কোনো উন্নয়নের চিন্তায় যখন সামাজিক আচরণবাদের পুরোপুরি বর্জন করা হয় তখন আসলে খুব একটা বেশি পার্থক্য চোখে পড়ে না[৮]। সামাজিক আচরণবাদের মর্যাদা তারাই খর্ব করে যারা এর উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন[৯]।

যখন এক সাথে কেউ তিনটি শাখাই ধরে রাখতে চাইবে তখন সে দেখবে যার মতবাদ যত দুর্বল তার পদ্ধতি তত সরল। যার মতবাদ যত সরল তার পদ্ধতি তত দুর্বল। তাই স্পষ্ট তারতম্য দেখা না দিলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। যদিও দেখা যায় মনে রাখতে হবে তা সমাজ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ারই সার্বজনীন মতবাদের অংশ[১০]।

ঘ. সমাজ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াবাদ

সামাজিক আচরণবাদের সাথে ক্রিয়াবাদের পার্থক্য এটাই যে সামাজিক আচরণবাদ প্রতিক্রিয়া হিসেবে খোনেই দেখা দিয়েছে। তারই বিরুদ্ধবাদ ধারণা হিসেবে ক্রিয়াবাদী মতবাদ দেখা দিয়েছে। তাই এটি অনেকটাই অঙ্গবাদের কাছাকাছি। তবে পার্থক্য এতটুকু যে এখানে কাঠামোর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। আর আমাদের আলোচ্য মতবাদে ক্রিয়ার উপর। এই মতবাদে সামাজিক ক্রিয়ার অধ্যয়নে জোর

---

[৬] Weber, The Theory of Soceal and Economic Organization tr. Henderson and Parsons, P. 88

[৭] Martindale, op. cit.,P 437

[৮] Ibid, P. 437

[৯] Ibid, P. 441

[১০] Ibid, P. 442

www.amarboi.org

দেওয়া হয়। যেহেতু এই মতবাদে সামাজিক কর্মকাণ্ডই হচ্ছে সামাজিক পূর্ণতা লাভের প্রধান চালিকাশক্তি তাই সামাজিক কাঠামোর অধ্যয়নে পরিসংখ্যান বোধগম্য কোনো ফল বয়ে আনতে পারে না। তাই সমাজবিজ্ঞান সামাজিক কর্মকাণ্ডের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে। Martindale-এর মতে সামাজিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে এমন চালিকাশক্তি যা নির্দিষ্ট একটি বৃত্তকে আয়ত্তে আনতে পারে শুধু এর বেশি কিছু নয়।

এই পর্যায়ে আমরা আলোচিত বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তুলে ধরতে পারি। এখানেও এ প্রসঙ্গে Martindale-এর বক্তব্যই উপযুক্ত : সামাজিক আচরণবাদ যে নতুন নাটকের প্রবর্তন করতে চেয়েছিল তা ইতিবাচক অঙ্গবাদের নাটক থেকে ভিন্ন কিছু নয়। প্রথম থেকেই ইতিবাচক অঙ্গবাদ নির্দিষ্ট একটি সমস্যার জোয়ালে বন্দী ছিল। তার চেষ্টা ছিল ইতিবাচক পদ্ধতিতে সমাজের একটি আদর্শবাদী বিশ্লেষণ পেশ করা। এই দুই চালিকাশক্তির মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব দেখা দিল তখন একই ধারার মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিপ্লব দেখা দিল। কিন্তু এক পর্যায়ে সমঝোতার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে ইতিবাচক অঙ্গবাদ বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সংঘর্ষ মতবাদ আগের ইতিবাচকবাদী ধারা সংরক্ষণ করলেও সামাজিক বাস্তবতার বিশ্লেষণে তা ছিল একেবারেই ভিন্ন। পরবর্তীতে আকৃতিবাদী দারা সামাজিক বাস্তবতার সংজ্ঞায়ন ও তার ইতিবাচকবাদী পদ্ধতি থেকেও আলাদা কিছু নিয়ে আবির্ভূত হয়। আর এই সকল কারণেই অনেক সমাজবিজ্ঞানীগণ এই সকল মতবাদই বর্জন করেন।

সামাজিক আচরণবাদ প্রাচীন অঙ্গবাদের সামাজিক সংজ্ঞাকে মেনে নেয়নি। তবে আকৃতিবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আরো আদর্শবাদী অবস্থানে ফিরে যায়। তাছাড়া ইতিবাচকবাদের ভিত্তিতে নতুন একটি সমাজবিজ্ঞানের ভিত গড়ে তুলতে চায়। তাই দেখা যায় ইতিবাচক অঙ্গবাদ যে সমস্যার জোয়ালে বন্দী ছিল সামাজিক আচরণবাদেরও একই অবস্থা হয়। পদ্ধতি ও মতবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে এখানে অন্তবিপ্লব দেখা যায়। মতবাদ যত সূক্ষ্ম হয় পদ্ধতিগত সমস্যা ততই জটিল হতে থাকে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই সকল অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে সামাজিক আচরণবাদের অনেক সদস্য ক্রিয়াবাদের দিকে চলে যায়।

আধুনিক আলোচনাগুলো বুঝতে হলে ক্রিয়া সংক্রান্ত চারটি মতবাদ যে কাউকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বুঝতে হবে। ক্রিয়াকে বুঝতে হবে সঠিক কর্মকাণ্ড হিসেবে এবং ব্যবস্থাকে বুঝতে হবে কর্মকাণ্ড কর্তৃক পরিচালিত বিষয় হিসেবে। শুধুমাত্র শেষেরটিই সমাজ বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে ক্রিয়াবাদকে বৈশিষ্টমণ্ডিত করে তোলে।

সহজ ভাষায় বলা যায় সামাজিক আচরণবাদ ও সামাজিক ক্রিয়াবাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে প্রথমটি হচ্ছে এক ধরনের সামাজিক নামবাদ যার কোনো বাস্তবতা নেই।

www.amarboi.org

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সামাজিক বাস্তবতার আধুনিক রূপ। তাই মাঝে মধ্যে বলা হয় সামাজিক ক্রিয়াবাদ হচ্ছে এক ধরনের সামাজিক অঙ্গবাদ। ক্রিয়াবাদের প্রধান ধারণা সামাজিক ব্যবস্থার প্রাধান্যকে ঘিরে। আর ধারণা যে এই ব্যবস্থার সকল এককের গুরুত্ব মাধ্যমিক পর্যায়ের।

সামাজিক ক্রিয়াবাদের উৎস তিনটি : প্রাথমিক সমাজবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের ক্রিয়াবাদী শাখা ও সামাজিক নৃবিজ্ঞান। তাই ব্যাপারটা উপলব্ধি করলে হাস্যকর মনে হবে যখন দেখা যাচ্ছে যে সমকালীন ক্রিয়াবাদীরা নিজেদের উৎসের সন্ধানে নৃবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হচ্ছে[১১]।

উপসংহারে তিনি বলেন :

সামাজিক ক্রিয়াবাদের ক্ষেত্রে এই ধারণা এড়িয়ে যাওয়া দুস্কর হবে যে বৃত্ত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং সমাজবিজ্ঞান পুনরায় প্রাচীন ধারায় ফিরে গেছে। তবে আজো সমাজবিজ্ঞানের আদর্শগত উপাদানগুলো দুর্বল হয়ে চললেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রক্ষণবাদী ধারায় ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তবে বিষয়টি সামাজিক আচরণবাদের অনুবাদ ও উপাদানবাদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তার মত গুরুত্ববহ নয়। নতুন অগ্রগতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে নব্য অঙ্গবাদ। সাধারণ আকৃতিতে সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় মতবাদ চর্চা করা হয় এবং এটাই হচ্ছে সকল বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু।

সামাজিক ক্রিয়াবাদের পূর্বপুরুষদের দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার আরেকটি কারণ আছে। পদ্ধতিগত সমস্যা সামাজিক আচরণবাদের কম বেশি ছিল। বহুত্ববাদী আচরণবাদ সমাজ বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যানের ওপর জোর দেয়। কিন্তু জটিলতা দেখা দেয় যখন তাদের নির্বাচিত সমস্যগুলোর ক্ষেত্রে ঐ সকল পরিসংখ্যান প্রয়োগে ব্যর্থ হয়। তখন নতুন করে আচরণ মাপকাঠির প্রবর্তন করা হয়। তারা আরো হতাশ হয় যখন দেখে নিত্য নতুন সকল প্রচেষ্টাই পুরাতন কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক ধাপে গিয়ে থেমে যায়। তাই প্রতিক্রিয়া হিসেবে সামাজিক আচরণবাদের অন্যান্য সদস্যরা পরিসংখান পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ফলে সামাজিক আচরণবাদের সকল তাত্ত্বিক ফলাফলের আবির্ভাব হয় কোনো ধরনের পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনা ছাড়াই।

সমাজ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াবাদের দুইটি ধারা হচ্ছে : বৃহৎ ক্রিয়াবাদ যার উৎস হচ্ছে সামাজিক অঙ্গবাদ ও নৃবিজ্ঞান। আর ক্ষুদ্র ক্রিয়াবাদ যার উৎস Gestall এর মনোবিজ্ঞান। এই দুইটি ধারার মধ্যেই প্রতিষ্ঠাতাদের ইতিবাচক ধারায় ফিরে

[১১] Ibid., PP. 461-62

www.amarboi.org

যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ক্রিয়াবাদীরা সমাজ বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার উপর জোর দেওয়ার বিশেষ রেওয়াজ রয়েছে।

সামাজিক ক্রিয়াবাদ এখানে ততটা বিকশিত হয়নি যার আলোকে বলা যায় তার সম্ভাবনাগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে যাচাই করা যায়। তবে বিভিন্ন সূচকের আলোকে বলা যায় বর্তমানে ভাষা সংক্রান্ত মতবাদ ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধীয় সামাজিক আচরণবাদের মতবাদের উপর সামাজিক ক্রিয়াবাদ বেজায় ক্ষুব্ধ। তাই ধারণা করা হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা আমূল পরির্তন আনবে[১২]।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সমাজবিজ্ঞান পুনরায় প্রতিষ্ঠাতা পুরুষদের ধারায় ফিরে যাওয়া। যদিও প্রতিষ্ঠাতাদের কারো কোন ভীত বলতে কিছু নেই।

সমাজবিজ্ঞান নিঃসন্দেহে অনেক বিস্তৃত বিষয়। অধ্যাপক Martindale যা বলেছেন তা হচ্ছে বিভিন্ন ধারার আলোকে সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ। তার মতে এটাই একমাত্র সম্ভাব্য পথ নয়। আরো তিনটি পথ রয়েছে যার আলোকে সমাজ বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিশ্লেষণ করা যায়। তা হতে পারে মতবাদগুলোর কাঠামোগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে কিংবা জাতীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা চালিয়ে যে কোনো জাতির নিজস্ব আদলেও সমাজ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বিশেষ নমুনা তৈরি করা যেতে পারে।

কিন্তু সমাজবিজ্ঞান যদি জাতীয় প্রভাবের অধিনস্থ থেকে বিকশিত হতে থাকে তাহলে তা এমন এক হাতিয়ারে পরিণত হবে যা হবে অনেকটা আঞ্চলিক। ফলে সমাজবিজ্ঞান অচিরেই তার লক্ষ্যচ্যুত হবে। এমনিতেই সমাজ বৈজ্ঞানিক মতবাদের ঘন ঘন পরিবর্তনের কারণে ব্যাপক বিভ্রান্তি ও মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। তদুপরি যদি কোনো আঞ্চলিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় তাহলে বিষয়টি আরো লেজেগোবরে হয়ে যাবে।

---

[১২] Ibid, P. 537

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিভিন্ন পরিবর্তন

সমাজবিজ্ঞানের জীবনধারা

জীবনধারার বিবেচনায় সমাজবিজ্ঞান অবিরত বিভিন্ন পরিবর্তনের শিকার। এর কারণ যদি কেউ বিশ্লেষণ করে তাহলে সহজেই বোঝে আসবে তা হয়েছে এই জন্য যে খোদ সমাজকে কখনো কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার আওতায় আনা সম্ভব নয়। অতএব আমরা কিভাবে আশা করতে পারি এর উৎপত্তি, ইতিহাস ও সংবিধান সহজে অধ্যয়ন করা যায় যা কিনা আবার সমাজবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য?

পৃথিবীতে অনেক বিচিত্র ধরনের সমাজ রয়েছে। এগুলোও আবার সময়ের আবর্তে পরিবর্তনশীল। তদুপরি প্রতিটি সমাজবিজ্ঞানীর রয়েছে নিজস্ব স্বাদ ও রুচি যার প্রভাবে সে সমাজের ব্যাখ্যা তৈরি করে। তাছাড়া সমাজবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে নিবিড় সম্পর্ক। তাই একজন সমাজবিজ্ঞানী যখন আন্ত-মানবিক সম্পর্কের জটিল সমস্যার সমাধান করতে চায়। তখন সমাজবিজ্ঞানের পাশাপাশি ইতিহাস ও দর্শনেরও দ্বারস্থ হয়।

মনোবিজ্ঞানের কথাই ধরা যাক এটি হচ্ছে ব্যক্তিগত আচরণ সমন্ধীয় বিজ্ঞান। আর সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান। এখন তা করতে গিয়ে যদি তাকে নির্দিষ্ট মনোজাগতিক সত্যের উদঘাটন করতে হয়। তাহলে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে। তেমনি নৃবিজ্ঞান হচ্ছে সংস্কৃতিসমূহের বিজ্ঞানসম্মত ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ যদি তার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করা হয়। তাই সমাজবিজ্ঞান যখন বিভিন্ন সংস্কৃতির অধীনে আন্ত-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিরূপণ করতে চায় তখন নৃবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে হয়। মানবিক আঙ্গিকে বলা যায় ভূগোল হচ্ছে বাহ্যিক পরিবেশে মানব জাতির খাপ খাওয়ানো প্রক্রিয়ার অধ্যয়ন। তাই সমাজবিজ্ঞান যখন বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাবাধীন মানব জাতির মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে চায় তখন তাকে ভূগোলের দ্বারস্থ হতে হয়। অর্থনীতির কাজ হচ্ছে বৈষয়িক পণ্য ও সেবাসমূহের উৎপাদন ও বিতরন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করা। তেমনি

www.amarboi.org

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুসন্ধান করে ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির উৎস ও বিতরণ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ। সমাজবিজ্ঞানকেও অহরহ এমন সকল মানবিক বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে হয় যেগুলো অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কিত, তখন তাকে এই বিজ্ঞান দুইটির সাহায্য নিতে হয়। সামাজিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে আইন। সুতরাং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অধ্যয়ন করতে গেলে সমাজবিজ্ঞানকে আইনের সাথে সম্পৃক্ত থেকেই তা করতে চায়। ইতিহাস হচ্ছে মানব অতীতের রেকর্ড। তাই আন্ত-মানবিক সম্পর্কের অতীত ঘাটতে গেলে তাকে ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয়। দর্শন যেহেতু মানবিক কর্মকাণ্ডের মৌলনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান সেহেতু দর্শনের উপর সমাজবিজ্ঞানকে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়।

উপরোল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও আরো অনেক কারণে সমাজবিজ্ঞানে আমরা ব্যাপক ও ঘন ঘন পরিবর্তন দেখতে পাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সময়ের আবর্তে সমাজ বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার পবিবর্তন জানতে হলে যে কাউকে সর্বাগ্রে সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস পড়তে হবে।

www.amarboi.org

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস

ক. গ্রিক যুগ

প্রাক Comte যুগের বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগেই সমাজবিজ্ঞানের সূচনা হয়। যখন মানুষ পারস্পরিক আচার আচরণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকে। সামাজিক প্রপঞ্চের প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা গ্রিকদের মাধ্যমে শুরু হলেও তাদের থেকেও পুরাতন যুগে হয়তো নৈতিক ও সামাজিক ধারণার চর্চা শুরু হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সভ্যতা, দার্শনিক ও ধর্মগুরুরা নৈতিক মূলনীতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে মানবিক সম্পর্কের কিছুটা পর্যালোচনা করেন। উদাহরণ স্বরূপ প্লেটো ও অ্যারিস্টটলেন নাম উল্লেখ করা যায়। তবে পর্যালোচনাগুলো নির্দিষ্ট কোনো বিধি বিধানের আওতাভুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। বরঞ্চ এগুলোর ভিত্তি ছিল প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ কিছু অভিজ্ঞতা। কারণ ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কের সাধারণিকরণ নয়। বরঞ্চ এগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল দার্শনিকদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে তুলে ধরা এবং এগুলোই এক পর্যায়ে জনপ্রিয় আচরণ বিধিতে পরিণত হয়[১]।

বিজ্ঞান চর্চার সময় সাধারণত বলা হয়ে থাকে সকল বিজ্ঞানের জননী হিসেবে দর্শনই হচ্ছে অতীত বিজ্ঞানের মূল উৎস। গ্রিক দর্শনের দুইটি শাখা ছিল। একটি হচ্ছে Cosmology বা মহাবিশ্বজ্ঞান। আরেকটি যুক্তিবাদ। এই দুইটি বিষয়ে ওপর ভিত্তি করেই আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। মহাবিশ্বজ্ঞানে বিশ্বের সৃষ্টি; বিবর্তন ও কাঠামো নিয়ে আলোচনা করে। প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রিষ্টপূর্ব) ছিলেন একজন যুক্তিবাদী। যিনি বিশ্লেষণমূলক চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে মত দেন যে যুক্তির সঠিক প্রয়োগ হলেই সত্যের কাছাকাছি যাওয়া যায় এবং এটাই হচ্ছে জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ইন্দ্রজাত জ্ঞান চর্চার পদ্ধতি থেকে উত্তম।

মানব প্রকৃতির উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে মানব আচরণের উৎস হচ্ছে তিনটি। চাহিদা, যা প্রধানত যৌন; আবেগ যা রক্তের উষ্ণতা থেকে উৎসারিত

---

[১] Collier's Ency., Sociology, Vol. 21, P. 152-53.

www.amarboi.org

এবং জ্ঞান যার উৎস হচ্ছে মাথা। কাঙ্ক্ষিত যে কোনো ইউরোপীয় সমাজের ব্যাপারে তিনি Republic গ্রন্থে লিখেন যে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা প্রবল তাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজে নিয়োজিত করা উচিত। আবেগ যার মধ্যে বেশি তাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে সৈনিক হিসেবে আর যুক্তির আলোকে আলোকিত মানুষ হতে পারে একজন দার্শনিক যে ইউরোপকে পরিচালনা করবে[২]।

তবে এই সব পর্যালোচনাকে বিজ্ঞানসম্মত বলা যায় না। কারণ এগুলো হচ্ছে ইউরোপীয় চিন্তাধারা মাত্র। প্লেটোপূর্ব যুগের কোনো লিখিত উপাদান আমাদের কাছে না থাকলেও এতটুকু অন্তত বলা যায় যে সুফিবাদীরা (Sophists) গ্রিসের অন্যান্য এলাকা থেকে এসে এথেন্সে তাদের মতবাদ প্রচার করে। তারা পৃথিবী সম্বন্ধীয় প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসী ছিল। তারা মানুষের সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করত। যেখানে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক আইন ও নিয়ামকসমূহের কার্যকর ও সক্রিয় ঠিক আধ্যাত্মিক ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তির বিপরীতে। তাদের বিশ্বাস ছিল প্রকৃতি আত্মবাদী কিংবা অহংবাদি। শক্তির জয় হচ্ছে প্রাকৃতিক আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সবাই নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে ব্রতী।

সুফিবাদীরা সরকার ও সমাজের চুক্তির উপর যেমন জোর দেয় তেমনি প্রকৃতির আদি অবস্থানের উপর গুরুত্বারোপ করে। Hoppocrates (৪৬০-৩৮০ খ্রিষ্টপূর্ব) তার কাজগুলোতে প্রথম বারের মতো মানব সমাজের উপর বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বায়ু, জল ও স্থলের উপর গবেষণা করেন। তিনি ইউরোপ ও এশিয়ার বাসিন্দাদের উপর আবহাওয়া ও ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব পর্যালোচনা করেন। সেই অনুযায়ী তিনি তাদের চারিত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্টের বর্ণনা দেন। পরবর্তীতে ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) ও Bodin (১৫৩০-১৫৯৬) এর আবির্ভাব পর্যন্ত এ নিয়ে বিস্তারিত আর কেউ আলোচনা করেননি[৩]।

সুফিবাদীদের দর্শন বলতে কিছু ছিল না। তারা শুধুমাত্র বাহ্যিক জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক পর্যালোচনা করে। তাদের এই উপদেশমূলক ধারণাগুলোকে বিশদ দর্শনের রূপ দেন সক্রেটিস (৪৭১-৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্ব)। সুফিবাদীদের বিপরীতে তিনি তার মানবতাবাদে প্রাচীন বৈষয়িক দর্শনের যুক্তিবাদী ধারার অনুপ্রবেশ ঘটান। তিনি প্রচার করেন মানবিক গুণাবলিই হচ্ছে জ্ঞান। এর মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে জ্ঞানের উৎস হিসেবে যুক্তির উপর জোর দিতে হবে। পরিণত পর্যায়ে তিনি

---

[2] Chaplin, Systems and Theories of Psychology, P. 15

[3] Barnes, An Introduction to the Hestory of Soceology, P. 7

www.amarboi.org

নৈতিকতার উপর জোর দেন। তিনিই সর্বপ্রথম মত প্রকাশ করেন যে নৈতিকতার আইনই হচ্ছে প্রাকৃতিক আইনের মূল প্রতিবাদ্য বিষয়। তাই তিনি নৈতিকতার সার্বজনীন সংজ্ঞার অনুসন্ধানের উপর জোর দেন।

এই মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্ভবত প্লেটো ন্যায় বিচারের পূর্ণাঙ্গ একটি সংজ্ঞার অনুসন্ধান করেন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি রাষ্ট্র ও সমাজের পর্যালোচনা করেন। সক্রেটিসের ছাত্র হওয়ার সুবাদে তিনি উত্তমরূপে বুঝতে পারেন গুরু সার্বজনীন নৈতিক মতবাদ দ্বারা কী বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি রিপাবলিকে এর সংজ্ঞায়নের চেষ্টাও করেন। সমাজের প্রসঙ্গ আসলে তিনি বলেন শ্রমের বিতরণ শুধু তার অর্থনৈতিক ভিত্তি নয়। বরঞ্চ তার নৈতিক ভিত্তিও বটে।

এভাবেই প্লেটো সমাজের অর্থনৈতিক ও উপযোগিতাবাদী ব্যাখ্যা পেশ করেন। পক্ষান্তরে তার শিষ্য অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিষ্টপূর্ব) মনে করেন সুসংগঠিত সমাজের মূল ভিত্তি হচ্ছে সামাজিকতা ও বন্ধাত্ব। স্বভাবজাতভাবে মানুষ হচ্ছে সামাজিক প্রাণী। তাই মানব ব্যক্তিত্বের উন্নয়নের জন্য সামাজিক সম্পর্ক জরুরি। তিনি সামাজিক চুক্তির পক্ষপাতি ছিলেন না। কেননা তাঁর মতে সমাজ হচ্ছে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ারই ফলাফল।

অ্যারিস্টটল যে মতবাদ পেশ করেন তা প্লেটোর তুলনায় অনেকটা পূর্ণাঙ্গ তুলনামূলক আলোচনা। তারা উভয়ে ব্যক্তিগত অঙ্গবাদ ও সমাজ এবং সমাজের উপর বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করেন। মানুষ ও সমাজের উপর বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাব নিয়ে যখন অ্যারিস্টটল আলোচনা করেন তখন তিনি Hippocrates এর মতবাদকেই প্রাধান্য দেন। তবে ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে তিনি তথাকথিত গ্রিক শ্রেষ্ঠত্বই প্রমান করেন[৪]।

প্লেটো ও অ্যারিস্টটল উভয়ে এই মতবাদের উপর জোর দেন যে সামাজিক স্থিতিশীলতাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। তাই ব্যক্তির উপর সমাজ প্রাধান্য পাবে। ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বকে অনেক ধকল পোহাতে হয়। এই ব্যক্তিত্বকে পুনরুদ্ধার করেন অ্যারিস্টটলের শিষ্য আলেকজান্ডার দ্যি গ্রেট যিনা ছিলেন মেসিডোনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

খ. রোমান যুগ

রোমানরা সামাজিক দর্শনের উন্নয়নে ততটা আগ্রহী ছিল না। বরঞ্চ তাদের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলা। তাই তারা আইনের

---

[4] Barnes, op. cit, P. 9

www.amarboi.org

উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিষয়ে অধিক শ্রম ব্যয় করে যা আমরা নিম্নের বর্ণনা থেকে উপলব্ধি করতে পারব :

আলেকজান্ডার খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শুরুতে প্রাচ্য জয়ের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করেন তা ধিরে ধিরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ণতা লাভ করে। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা একটি সাধারণ সমাবেশস্থলে পরিণত হয়। তখন তা আর একক সম্প্রদায়ের এলাকা থাকল না। প্রাচীন নগর রাষ্ট্রগুলোর কোনো অস্তিত্ব থাকল না এবং আধুনিক যুগের মতো রাজনীতি সচেতন দেশেরও অস্তিত্ব ছিল না। স্বাভাবিক কারণেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে মেসিডোনিয়া, মিশর ও এশীয় এলাকায় রোমানদের অধীনে একক রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বাস্তবেও পরবর্তী কয়েক শতাব্দী এই অনুমানের স্বাক্ষী থাকে। প্রথম শতাব্দীর শুরুতে Stoic-এর দর্শনের প্রবক্তাগণ একটি বিশ্ব রাষ্ট্রের ধারণা প্রচার করেন। যেখানে রাজত্ব করবে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার ও বিশ্বজনীন নাগরিকত্ব। তবে এই পরিভাষাগুলো যত না ছিল আইন সংক্রান্ত তার চেয়ে বেশি ছিল নীতি সংক্রান্ত। তখন এ সকল দার্শনিক মতবাদের উন্নয়নও ব্যাখ্যার নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়[৫]।

রোমানদের মধ্যে Seneca (৬৫ খ্রিষ্টপূর্ব) সর্বপ্রথম সামাজিক দর্শন চর্চা শুরু করেন। এই চর্চার মাধ্যমে তিনি সোনালি যুগের প্রাথমিক পর্বের পুনর্জাগরণ কামনা করেন। তখন বর্ণ ও সম্পদের ভিত্তিতে সামাজিক কোনো ভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু এক পর্যায়ে মানুষের মধ্যে অভিন্ন মালিকানার কারণে অতৃপ্তি দেখা দেয়। তার মধ্যে দেখা দেয় সম্পদ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা। ফলে দেখা দেয় বাড়তি অন্যায় ও অবিচার যা নিয়ন্ত্রণ করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন দেখা দেয়।

এই মতবাদের বৈশিষ্ট খ্রিষ্টান যাজকরাই এর প্রবর্তন ঘটায়। তারা রেনেসাঁর সোনালি প্রাকৃতিক রাষ্ট্রের ধারণার উপর ভিত্তি করে একটি বিশ্বজনীন সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। এই রাষ্ট্রে থাকবে না কোনো জবরদস্তিমূলক সরকার। এডেনের পতনের আগে মানুষের অবস্থান আসলে এমনই ছিল।

এই মতবাদের কারণে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। এক পর্যায়ে তা ধর্মনিরপেক্ষ ও আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষের সংঘর্ষে পরিণত হয়। যা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়।

এ যাবৎ আমরা গ্রিক থেকে রোমান যুগ পর্যন্ত ইতিহাসের এক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছি। যাতে আমরা জানতে পেরেছি গ্রিক দর্শনের সামাজিক বিবর্তন

---

[5] Sabine, A History of Political Theory , P. 159

www.amarboi.org

সমন্ধে। আরো জানতে পেরেছি এই শতাব্দীগুলোতে সামাজিক চিন্তাধারার বিরূপ বিকাশ ঘটেছে। এখন আমাদের জানতে হবে মধ্যযুগের সামাজিক দর্শন সম্বন্ধে।

গ. মধ্যযুগ (১০০০-১৪০০)

এই যুগে ধারণা করা হতো সমাজ হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক উপাদান। তেমনি সরকারও প্রয়োজনীয় ও প্রাকৃতিক বিষয়। সমাজের স্থিতিশীলতার জন্য যার প্রয়োজন অনেক। স্মরণীয় যে এই সময়টিতে ইবনে খালদুন ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতবাদ সংঘর্ষ মতবাদ হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। যাতে তিনি বিভিন্ন দলের সংঘর্ষ তোলেন। যেখান থেকে সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যেতে পারে। এই সংঘর্ষের আলোকেই ইবনে খালদুন রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীগণ এই মতবাদের উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হন। এরপর আমরা রেনেসাঁ যুগের উপর আলোকপাত করতে পারি।

ঘ. রেনেসাঁ যুগ (১৪০০-১৬০০)

এই যুগে প্রথমেই মনে পড়ে Machiavelli (১৪৬৯-১৫২৭) এর কথা। তিনি বলে যান স্বভাবজাতভাবে মানুষ খারাপ। তাই সুযোগ পেলেই তার পশু সুলভ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। পক্ষান্তরে Bodin মনে করেন সভ্যতার বিকাশের জন্য অতিপ্রয়োজনীয় হচ্ছে একটি সার্বভৌম ক্ষমতা। Machiavelli এর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম ছিল Prince। এই গ্রন্থে অবশ্য Machiavelli চরিত্রেরই প্রতিফলন দেখতে পাই আমরা। তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অনৈতিক মাধ্যম অবলম্বন করার জন্য যে সমর্থন ব্যক্ত করেন তার জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল সরকার মূলত শক্তি ও ছল চাতুরীর উপর নির্ভরশীল। রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষমতা সুসংহত করে তা বৃদ্ধি করা। এর জন্য কার্যকারিতা প্রমাণ করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নীতির সফলতাগুলো তুলে ধরেন। প্রায়শ তিনি একজন শাসক যদি দক্ষতার সাথে অনৈতিকতার প্রয়োগ করে সফল হতে চান তার কী কী সুবিধা রয়েছে এ বিষয়ে আলোকপাত করতেন। পক্ষান্তরে Jean Bodin যে সার্বভৌমত্বের কথা বলেন তার আইন প্রয়োগে ও ব্যাখ্যায় একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সংগঠিত রাষ্ট্রের জন্য এ ধরনের একচ্ছত্র অধিকারের প্রযোজন রয়েছে। তার মূল লক্ষ্য ছিল রাজার ক্ষমতাকে সংহত ও বৃদ্ধি করা। তাঁর মতে রাষ্ট্র হচ্ছে রাজনৈতিক অধঃস্তনদের সাথে রাজনৈতিক উর্ধ্বতনদের সম্পর্ক। পরবর্তীতে এই মতবাদের আরো উন্নয়ন ঘটান Hobbes। যিনি ছিলেন আলোকিত যুগের একজন অগ্রপথিক।

www.amarboi.org

ঙ. আলোকিত যুগ (১৬০০-১৮০০)

এ যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যুক্তি। এখানে সনাতন কিংবা অতিপ্রাকৃতিক কোনো কিছুর দ্বারস্থ হওয়া যাবে না। এটিকে বলা হয় Enlightenment। যার মূল মতবাদ ছিল যুক্তিবাদ। এ যুগে যখন জাতি রাষ্ট্রের আবির্ভাব হতে থাকে। তখন চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব বেশি বেড়ে যায়। এই সকল নতুন শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর উৎপত্তি ও প্রত্যায়ন সামাজিক ও রাজনৈতিক দার্শনিকদের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। এই সমস্যার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক জবাব ছিল সামাজিক চুক্তির মতবাদ[৬]।

Thomas Hobbes (১৫৮৮-১৬৭৯) ছিলেন আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে সবার প্রথম। যিনি আধুনিক চিন্তাধারার আলোকে রাজনৈতিক মতবাদগুলোর ব্যাখ্যা দাঁড় করান। তিনি প্রথম যে সমস্যাটি পর্যালোচনা করেন তা হচ্ছে মানবিক আচরণ সমন্ধীয় আইনের ব্যাখ্যা। অতঃপর একটি স্থিতিশীল সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলো তুলে ধরা।

তাঁর মতে প্রতিটি মানুষ অনুপ্রাণিত হয় তার নিরাপত্তা ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিবেচ্য বিষয়সমূহ দ্বারা। এগুলোকে যারা প্রভাবিত করবে তারাই তার কাছে গুরুত্ববহ। ব্যক্তি পর্যায়ে সবাই যেহেতু সমান শক্তি ও চাতুরীর অধিকারী সেহেতু কেউ একা নিরাপদ থাকতে পারে না। তাই তাদের অবস্থা হলো তাদের কোনো আচার আচারন নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো সুশীল ক্ষমতা বা কর্তৃপক্ষ যদি না থাকে তাহলে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়তে থাকবে[৭]।

তাঁর মতে স্বভাবজাতভাবে মানুষ হচ্ছে অসামাজিক। তবে অশৃঙ্খল ও গোলযোগপূর্ণ অবস্থার দুঃখ দুর্দশা থেকে রেহাই পেতে তারা একটি সুশীল সমাজের অধীনে থাকতে একতাবদ্ধ হয়। এই লক্ষ্যে তারা তাদের ব্যক্তি ক্ষমতাগুলোকে একটি সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে। এই প্রক্রিয়া হচ্ছে তাঁর মতে এক ধরনের সামাজিক চুক্তি। একই ধারায় Locke (১৬৩২-১৭০৮) মানুষের সামাজিকতার উপর জোর দেয়। তাঁর মতে এই চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদ রক্ষা। তাই কোনো সরকার যদি এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। এভাবে তিনি সম্পদের উপযোগিতার উপর জোর দেন এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে Hobbes এর মতপার্থক্য পোষণ করেন। এরপর Rousseau (১৭১২-১৭৭৮) সম্পদের উপযোগিতা নয়। বরঞ্চ যে বিষয়টি

---

[6] Barnes, op. cit, P. 29

[7] Sabine, op. cit, PP. 463-64

www.amarboi.org

সামাজিক চুক্তিতে মানব জাতিকে অনুপ্রাণিত করে তা হচ্ছে সমাজের নৈতিক মূল্যবোধ।

David Hume (১৭১১-১৭৭৬) Hobbes এর বিরোধিতা করে বলেন যে নিজেকে রক্ষা করা ছাড়াও মানুষের আরো অনেক চাহিদা রয়েছে। মানুষ চায় সহানুভূতি ও স্নেহ মমতা এবং সে তখনই সুখী হয় যখন বদান্যতামূলক কর্মকাণ্ড দ্বারা অন্যদেরকে কৃতার্থ করতে পারে। এই বিবেচনায় মানুষ কিন্তু নৈতিক প্রাণী। তার অর্থ হলো তিনি সরাসরি সামাজিক চুক্তির মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন।

Hume সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি যিনি মানবিক আচরণের উপর সহমর্মীতার প্রভাবের উপর জোর দেন। তিনি সমাজের একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে সমাজের উৎস হচ্ছে যৌন চাহিদা এবং এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত সামাজিক বাস্তবতা। এখান থেকেই পরিবারের উৎপত্তি হয়, সুকুমার বৃত্তি যাকে ধরে রাখে। যারা একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তারাই একত্রে বসবাস করে। সহমর্মীতার এই বন্ধন পারিবারিক দলকে সাংগঠনিক ঐক্যের সুবিধার ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। এভাবেই বংশধারার পরিবার ও গোষ্ঠী দল এক পর্যায়ে সমাজ হিসেবে বিস্তৃতি লাভ করে।

এভাবেই সামাজিক চিন্তাধারা নৃবিজ্ঞান থেকে ইতিহাসের দিকে যায়। আর ধীরে ধীরে অন্যান্য বিজ্ঞানের শাখাগুলো যেমন ভূগোল, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইনের সাথে সম্পৃক্ত হতে থাকে। এই সকল বিদ্যার দ্বারস্থ হয়েই সমাজবিজ্ঞানীগণ সমাজের ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। তথ্য উপাত্তের ভাণ্ডার এক সময় এতটাই বৃদ্ধি পায় যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথেও সম্পৃক্ত হওয়াটা জরুরি হয়ে পড়ে। ফলে ১৮৩০ সালে Comte তার The Course de Philosophie Positive গ্রন্থ নিয়ে আবির্ভূত হন। তিনি এর মাধ্যমে সমাজের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের কথা বলেন এবং সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু বিধি বিধানের অনুসন্ধান করেন। যেগুলো সাধারণ হিসেবে প্রবর্তন করা যায়। তাঁর এই প্রচেষ্টাই সামাজিক চিন্তাধারাকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

কিন্তু এরপরও এ ধরনের আরো অনেক মতবাদের আবির্ভাব দেখা দেয় যেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল পরস্পরবিরোধী। তখন কোনটা রেখে কোনটি বাদ দেওয়া যায়, এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও দুস্কর হয়ে পড়ে। শুধু এরই মধ্যে সমস্যা সীমাবদ্ধ নয়। বরঞ্চ সামাজিক আইন ও বিবর্তনের বিষয়ে আরো অনেক জটিল সমস্যা দেখা দিতে থাকে।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক বিবর্তন

সংজ্ঞা

সামাজিক শব্দটি মানব জাতির বেলায় প্রযোজ্য। আর তা হচ্ছে এমন আচরণ যা অন্যান্যদের পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ অতীত ও বর্তমান আচরণসমন্ধীয় অভিজ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়[১]।

আর বিবর্তনের অর্থ হচ্ছে নিম্ন কিংবা উর্ধ্বগামী রেখা বরাবর কোন উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

প্রগতি সম্পর্কিত সামাজিক বিবর্তন দ্বারা সমাজের উন্নয়ন ও প্রগতিকে বুঝায়। ইতালীয় দার্শনিক Vico এর মতে একটি সরল রেখাকে আবলম্বন করে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলে না এমনকি পুনরাবৃত্তিমুখি রেখাকে ঘিরেও নয়। বরঞ্চ এর গতি হচ্ছে বক্র প্রকৃতির। এখানকার প্রতিটি বাঁক যতই আগের দিকে যাবে ততই আগেরটির চাইতে পরিণত ও সমুন্নত হবে[২]।

তিনি মনে করেন ঐতিহাসিক উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে যুগে যুগে মানব আত্মার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যে সামষ্টিক মানবিক পবিবর্তন দেখা দেয় তা। আর এর পেছনে রয়েছে সৃষ্টি ও পরিবর্তন। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সামাজিক বিবর্তন কখনো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু Comte তা নিয়ন্ত্রণ করারই একটি অলিক স্বপ্ন দেখেছিলেন।

স্মরণ করা যেতে পারে যে Comte ও Spencer কে মনে করা হয় সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু Spencer সামাজিক বিবর্তনের বিষয়ে Comte এর বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে সামাজিক বিবর্তনের বিষয়টি প্রাকৃতিক বিবর্তন আইনের আওতায় স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য ছেড়ে দেওয়া উচিত।

মজার বিষয় হচ্ছে, Comte জোর দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে মানবিক জ্ঞান যদি উন্নত করার লক্ষ্য থাকে তাহলে এটাকে ইতিবাচক অথবা বিজ্ঞানসম্মত তুলনামূলক অধ্যয়ন, নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তাঁর মতে যদি

---

[1] A Dictionary of the Social Science, Social, P. 273

[2] Barnes, An Introduction to the History of Sociology, PP. 56-57

www.amarboi.org

কোনো ব্যক্তি বা উদ্ভিদের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে সমাজ হচ্ছে এক ধরনের সামষ্টিক অঙ্গবাদ। তাই সমাজ ও অঙ্গবাদে কার্যক্রম ও কাঠামোর মধ্যে সামঞ্জস্যের বিধান করতে হবে যাতে অভিন্ন লক্ষ্যে পৌছাতে পারে। যদি উন্নয়নের ধারা নিজস্ব অঙ্গ প্রতঙ্গের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নয়ন চর্চা করে তাহলে তার চূড়ান্ত পরিণতির প্রতিফলন দেখা যাবে মানব সমাজে এবং এটাই হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায়। Spencer আগেই তিনি অনুমান করেন যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথার্থ সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে যখন কার্যক্রম বিশেষায়িত পর্যায়ে পৌছায় তখন সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়। Comte যে প্রধান সামাজিক ধারণাগুলো দিয়ে যান তা হচ্ছে :

১. সমাজ ও রাষ্ট্রে অঙ্গজনিত মতবাদ। পরবর্তীতে Spencer এই মতবাদকে আরো উন্নত রূপ দেন।

২. সার্বজনীন সমাজ বৈজ্ঞানিক মতবাদ হচ্ছে এটাই যে রাষ্ট্র কোনো উপযোগিতা সম্বন্ধীয় যৌক্তিক মতবাদের ফসল নয়। বরঞ্চ ঐতিহাসিক উন্নয়ন ও সামজিক প্রয়োজনের প্রাকৃতিক অবদান।

তিনি বলেন, সামাজিক সংগঠনগুলো সামাজিক মতবাদের মতোই মানব মস্তিষ্কের তিনটি কার্যক্রমের ফসল-অনুভূতি, কর্ম ও বুদ্ধি। সামাজিক বিবর্তন ও তার উন্নয়ন বিধানকারী আইন সম্বন্ধে Comte বলেন, সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতির মৌলিক গতি প্রকৃতি নির্দিষ্ট আইন দ্বারা পরিচালিত এবং তা নির্দিষ্ট পর্যায়ে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। কিন্তু তারপরও আইনি সমঝোতার ভিত্তিতে মানব জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতার মাধ্যমে তা ত্বরান্বিত ও পরিবর্তিত করা যেতে পারে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সামাজিক উন্নয়নের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পৃক্ততার ব্যাপারে Spencer অনেক আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে সামাজিক বিবর্তনের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন Comte -এর বিরোধী।

Spencer তাঁর সমাজবিজ্ঞানের ধারা গড়ে তুলে ছিলেন বিবর্তন সম্বন্ধীয় সাধারণ আইনের ভিত্তিতে। এ সকল আইনের একটি মৌলিক ধারা ছিল শক্তির অবিরাম আধিপত্য। আর দুইটি ধারার একটি ছিল- বিষয়ের অবিনশ্বর প্রকৃতি এবং দ্বিতীয়টি ছিল গতির চলমান ধারা। এই দুইটি অবশ্য শক্তির চলমান আধিপত্য থেকে উৎসারিত। নিম্নে তাঁর সার্বজনীন বিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ সূত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

www.amarboi.org

বিবর্তন হচ্ছে বিষয়ের সংহতি এবং গতির সংহতিপূর্ণ বিভক্তি। যার কল্যাণে বিষয় আপেক্ষিক অনিশ্চয়তা ও অসংলগ্ন ঐক্য থেকে অপেক্ষাকৃত সুসংহত বৈচিত্রের দিকে ধাবিত হয় এবং তখনই স্থবির গতি একটি সমান্তরাল রূপান্তরের দিকে যায়[৩]।

Spencer তাঁর এই সূত্রের প্রয়োগ করেন সকল প্রপঞ্চে। এর দ্বারা তিনি মূলত বিবর্তনকে অস্তিত্বের সংগ্রামের ফল হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তিনি সমাজের সাথে দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তুল্‌নামূলক বিশ্লেষণ করেন। মূলত বিবর্তন ও অঙ্গ সম্বন্ধীয় সমাজের এই দুইটি মতবাদই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের উন্নয়নে Spencer -এর অবদান।

আমাদের আরো গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করতে হবে যে Comte যখন ইতিহাসের দর্শন সম্বলিত Polity প্রকাশ করেন তার কয়েক বছর পরই ডারউইনের আবির্ভাব হয়। প্রথমেই ডারউইন Comte এই মতবাদকে অস্বীকার করেন যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সামাজিক পরিবর্তনের ধারা পরিবর্তন করতে পারে। তাদের মতে নিঃসন্দেহে সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে একটি বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া। তবে এটি পরিচালনা করে এমন সব চলমান শক্তি যেগুলো মানবিক কর্মকাণ্ড দ্বারা পবিবর্তন করা সম্ভব নয়। এর অর্থ এই নয় যে তার বিবর্তন মতবাদে ডারউইনবাদের প্রয়োগ চেয়েছিলেন। তাহলে এখন সামাজিক বিবর্তনের অর্থ উপলব্ধি করতে সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ বুঝতে হবে।

[3] Barnes, op. cit., P. 116

www.amarboi.org

সপ্তম অধ্যায়

সামাজিক পবিবর্তন

সংজ্ঞা

সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে কোনো সমাজের বিরাজমান অর্থ ও মূল্যবোধের পরিবর্ত[1]। সামাজিক পবিবর্তনের অধ্যয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি সামাজিক স্থবিরতার পরিবর্তে সামাজিক গতির সাথে সম্পৃক্ত। আর অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক গতিশীলতার আলোকেই সমাজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে।

সমাজ যদি বিশ্লেষণযোগ্য সকল এককের মূল হয় তাহলে দুইটি বিষয় এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়- ক. কাঠামো ও খ. কর্মকাণ্ডের সমষ্টি। সামাজিক স্থবিরতা হচ্ছে সামাজিক কাঠামোর তুলনামূলক অধ্যয়ন। পক্ষান্তরে সামাজিক গতিশীলতা হচ্ছে সামাজিক কর্মকাণ্ড ও পরিবর্তনের বিশেষায়িত অধ্যয়ন, বিধায় এটির গুরুত্বই বেশি।

Moore-এর মতে পরিবর্তনের বিশ্বজনীন উৎস হচ্ছে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ। তবে অন্যরা মনে করেন পরিবর্তনের উৎস হচ্ছে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অথবা প্রচার, আবিষ্কার ও উদঘাটন। সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধীয় অনেক মতবাদই এ যাবৎ দেখা দিয়েছে। ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) জৈবিক বিবর্তনের একটি মতপার্থক্যের প্রবর্তন ঘটান। তিনি বলেন যে, সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও সাংস্কৃতিক ধরন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি হচ্ছে প্রাকৃতিক বিষয়। যদি প্রাকৃতিক পরীক্ষায় এগুলোর কার্যকারিতাও খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা প্রমাণিত হয় তাহলে টিকে যাবে। সামাজিক বিবর্তনবাদীরা মানব ইতিহাসের গতি প্রকৃতিকে দেখেন উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছার গতি হিসেবে যা অসভ্যতা থেকে সভ্যতায় পৌঁছানোর অগ্রগতির মধ্যেই প্রতিফলিত হয়।

কেউ কেউ আছেন যারা মনে করেন বিবর্তনের গতি হচ্ছে সরল রৈখিক ও ঊর্ধ্বমুখী। আবার অনেকেই মনে করেন এটি ঘটে আকস্মাৎ এবং এর পরেই দেখা

---

[1] A Dictionary of social science : Social Change, P. 647

www.amarboi.org

দেয় বিরতি। আবার এর বিপরীতে অন্যরা মনে করেন তা ঘটে পর্যায়ক্রমে। হয়তোবা নিয়মিত সিঁড়ির ধাপ অনুসারে অথবা ক্ষনিক বিরতির পরপর।

বিতর্কমূলক মতবাদে ইতিহাসকে দেখা হয় ঊর্ধ্বমুখী ঘূর্ণয়মান গতি হিসেবে যার প্রতিটি ধাপে রয়েছে নিজস্ব দুর্বলতা ও পরস্পর বিরোধিতা। এগুলোর সুরাহা হয় পরবর্তী ধাপের সংঘর্ষের মাধ্যমে। এর বিপরীত ধরনের বিবর্তনমূলক মতবাদ হচ্ছে Primitivism বা আদিবাদ। এর বক্তব্য হচ্ছে মানুষ একটি মঙ্গলজনক পর্যায় থেকে পিছলে মন্দের দিকে ফিরে যায় যার কারণে অগ্রগতির পরিবর্তে দেখা দেয় অধপতন।

সামাজিক পবিবর্তনের Cyclic বৃত্তি মতবাদ বলা হয়। শেষতক আসলে মানব জাতির ভাগ্যে তেমন উন্নতি বলতে কিছু নেই। বরঞ্চ রয়েছে পেন্ডুলাম সদৃশ উত্থান পতন। Moore তাঁর গ্রন্থ Social Change এর মধ্যে মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে সমাজের তুলনা করেন। তাঁর মতে সমাজকেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সদৃশ একটি জীবনচক্র অতিবাহিত করতে হয়। তারও রয়েছে জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু। তাই পরিবর্তনের চূড়ান্ত গন্তব্য নয় বরঞ্চ বিলুপ্তি।

স্বেচ্ছাবাদী (Voluntaristic) মতবাদ মনে করে ব্যক্তি অথবা বিশ্বের ক্ষেত্রে ইচ্ছা শক্তি হচ্ছে প্রধান নিয়ামক। স্বেচ্ছাবাদীরা মনে করেন পরিবর্তনের উৎস হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা, পরিকল্পনা এবং দলীয় অথবা ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড। যেমন Thomas Carlyle মনে করতেন ঘটনাবলি হচ্ছে ব্যক্তিগত ইচ্ছার ফলাফল ঠিক এর বিপরীতে যন্ত্রবাদী (Mechanistic) মতবাদের প্রবক্তাগণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে কোনো গুরুত্ব দেননি। তাদের মতে এগুলো অন্ধ শক্তি সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং এগুলোর কাছে আইন ও সরকার অসহায়।

Summer বিশ্বাস করতেন যে সামাজিক পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে লোক প্রথার পরিবর্তন। মানুষের চেষ্টা সাধ্য এই ধরনের পরিবর্তন প্রতিরোধ করতে পারবে না। মানুষ যদি সময়ের আগেই এই পবিবর্তন আনতে চায় তখন বিরাজমান প্রথাই নাশকতার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা রুখে দিবে।

নিয়ামক মতবাদ মনে করে পরিবর্তনের উৎস হচ্ছে একক নির্ধারনী নিয়ামক কিংবা একাধিক নিয়ামকের সমষ্টি। একক নিয়ামকবাদীরা কতগুলো নিয়ামকের পরিবর্তনের সাথে সামাজিক পরিবর্তনকে সম্পৃক্ত করেন। যেমন আবহাওয়া, জনসংখ্যা, সামরিক শক্তি, বন্দর ও সমুদ্র, ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক।

www.amarboi.org

বহু নিয়ামকবাদীরা বিশ্বাস করেন উপরোল্লিখিত নিয়ামকগুলোর একাধিক কিংবা সব কটির ভূমিকার উপর জোর দেন। নির্দিষ্টবাদীরা আবার নিরেট একক নিয়ামকের ভূমিকায় ব্যাপক বিশ্বাস করেন আর তা হচ্ছে প্রযুক্তি। তারা বিশ্বাস করেন সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উৎস হচ্ছে প্রযুক্তির পরিবর্তন। পক্ষান্তরে মার্কস মনে করেন অর্থনৈতিক নিয়ামক হচ্ছে সকল পরিবর্তনের মূল ভিত্তি। হেগেল যেখানে মনে করতেন বিবর্তন হচ্ছে চিন্তাধারা কেন্দ্রিক, জ্ঞানচর্চা, বিতর্ক ও সংশ্লেষণের ফলাফল। যেখানে মার্কস মনে করতেন বিবর্তন মূলত উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি সামাজিক পরিবর্তনকে ঘিরে অনেক মতবাদই দেখা দিয়েছে। তবে সমাজবিজ্ঞানীগণ কোনোটিকেই সাধারণ মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করেননি[২]। এমনকি সমাজকেও নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞার আওতায় আনা যায়নি। সামাজিক বিবর্তনের বিষয়টিও নির্ধারিত হয়নি। তার চেয়েও করুণার বিষয় হচ্ছে খোদ সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুরও পূর্ণাঙ্গ কোনো সংজ্ঞা এখনো পাওয়া যায়নি।

[2] Biesanz, Introduction to Sociology, P. 429

www.amarboi.org

অষ্টম অধ্যায়

সমাজবিজ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. পুনর্গঠন

সংক্ষেপে বলা যায় সমাজবিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন। অন্য অর্থে বলা যায় তা হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সমাজের অধ্যয়ন। এর কল্যাণে সাধারণ মানব সমাজের শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য উপাদেয় কোনো বিশ্বজনীন আচরণবিধি খোঁজে পাওয়া যেতে পারে।

খ্রিষ্ট যুগেরও বহু পূর্বে সক্রেটিস এই ধরনের আচরণবিধির ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। তার এই ব্যাখ্যাই ছিল গ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের অনুপ্রেরণা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গ্রিক দর্শনের যুক্তিবাদী ধারা বিভিন্নরূপে কাজ করে যায়। প্লেটো এই প্রচেষ্টার উদ্যোগ নিলে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তা চলতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক কোঁত এসে ঘোষণা দেন যে সমাজের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যাতে করে তার সময়ে প্রচলিত সামাজিক মতবাদগুলোকে নির্দিষ্ট সার্বিক ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা যায়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীগণ নিজ নিজ পদ্ধতিতে বিষয় চর্চা করার কারণে দৃশ্যমান কোনো ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া তারা তা করত নিজস্ব রুচি ও স্বার্থ অনুযায়ী। তদুপরি যেহেতু সামাজিক পরিস্থিতিভেদে মানব জাতির চিন্তাধারা, আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ড বৈচিত্রময় হওয়ার কারণে এ কাজটি আরো দুঃসাধ্য প্রমাণিত হয়। মানব জাতির প্রতিটি দলই সামাজিক সম্পর্কের জটিল বুননে বৈচিত্রমণ্ডিত। কোথাও যদি সদস্যদের মাঝে ব্যাপক পারস্পরিক আকর্ষণ দেখা যায় অন্য সদস্যরা হয়তো এই ক্ষেত্রে ভীষণ নির্লিপ্ত। কাউকে সদস্যরা যেখানে সম্মানের চোখে দেখে অন্যরা তাকে দেখে অবজ্ঞার চোখে। কোনো দলে সহযোগিতার চর্চা দেখা দিলেও অন্য কোনো দলে হয়তোবা বিরাজ করে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা। কোনো দলে একক নেতৃত্বের কর্তৃত্ব বিরাজ করলেও অন্য কোন দলে হয়তো দেখা গেল সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে সাম্যপূর্ণ[1]।

---

[1] Hosolitz, A Reader's Guide to Social Science, P. 158

www.amarboi.org

এটা অনস্বীকার্য যে বাহ্যিক শক্তি, বিশ্বাস ও কৃষ্টি ব্যক্তি ও দলগত আচার-আচারণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং এই কারণেই ব্যক্তি ও দল একে অপর থেকে ভিন্ন। এই সকল কারণে সমাজের মধ্যেই অন্তর্নিহিত সামাজিক পরিবর্তনের কারণে সমাজগুলো একে অপর থেকে ভিন্ন রূপ লাভ করে এবং পুরাতন উপকরণের জায়গায় নতুন উপকরণ দেখা দিলে একটি সমাজ ভিন্ন একটি সমাজে পরিণত হয়। এই কারণে সমাজের কোনো সার্বজনীন ও সাধারণ সংজ্ঞা প্রবর্তন করা অসম্ভব। যেমন Spencer এর মতে সমাজ হচ্ছে কয়েকটি ব্যক্তির একটি দল যারা সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ। পক্ষান্তরে Sumner ও Keller মনে করেন তা হচ্ছে মানব জাতির স্থায়িত্ব ও জীবিকা নির্বাহের নিমিত্তে মানব জাতির কোনো দল যখন সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় তখনই গড়ে ওঠে সমাজ। অনেকেই আবার মনে করেন সমাজ হচ্ছে সামষ্টিকতা। তারা অবশ্য সহযোগিতার উপর জোর দেননি।

লেনিনের মতে সমাজ হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত এমন দল যারা সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ থেকে সামাজিক একক হিসেবে চিন্তা করার মতো কিংবা সংগঠিত হওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে একত্রে বসবাস করে এসেছে। Kent মনে করেন সমাজ হচ্ছে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন সংগঠিত গোষ্ঠী। তবে এতদসত্ত্বেও প্রাধান্য পাওয়া অনেক সংজ্ঞায় আমরা দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও দলীয় বৈষম্যগুলো উপেক্ষা করা হয়েছে[2]।

দেখা যাচ্ছে সমাজের সংজ্ঞা অনেক। তার সার্বজনীন ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা কোনটি হতে পারে তা চিহ্নিত করা কঠিন। কারণ আন্তর্জাতিক মানবিক সম্পর্কের বুনন অনেক জটিল ও বৈচিত্রময়। তার চাইতেও দুঃখের বিষয় হচ্ছে খোদ সমাজবিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ কোনো সংজ্ঞা আমরা এখনো পাইনি। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে সমাজের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন কিংবা বিজ্ঞানসম্মত অথবা অন্য কোনো ভিত্তিতে তার পুনর্গঠন কি আদৌ সম্ভব?

খ. বিজ্ঞান ও সমাজ

Ward হোক কিংবা Spencer হোক কিংবা Comte সমাজ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজ। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তাব দেওয়া বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের যাতে করে সমাজ সম্বন্ধে প্রায়োগিক সামাজিক জ্ঞান অর্জন করা যায়।

---

[2] A Dictionary of Social Sciences Society, P. 674

www.amarboi.org

তাহলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে বিজ্ঞান কি এবং এটা কি প্রকৃত জ্ঞানের উৎস হতে পারে?

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে অধ্যয়নের এমন একটি শাখা যার বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রতিভাত কোনো সত্য অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ একক অথবা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার আওতায় শ্রেণি বিন্যস্ত তথা যেগুলোকে সাধারণ সূত্রের আওতায় কম বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়। এই ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যাতে স্বচ্ছ ক্ষেত্রে নতুন নতুন সত্য উদঘাটিত হয়[৩]।

আমরা যদি বুঝতে যাই অসংখ্য ও বৈচিত্রময় সামাজিক ধরনগুলোকে বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনার আওতায় আনা সম্ভব কিনা। তাহলে জানতে হবে পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে। বলা হয়ে থাকে একজন বিজ্ঞানী সব সসময় বস্তুনিষ্ঠ হতে চান। উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রপঞ্চের ধরন যাই হোক না কেন তিনি দুইটি প্রধান উপকরণের প্রয়োগ করেন- তত্ত্ব ও প্রায়োগিক গবেষণা। তত্ত্বের ক্ষেত্রে যুক্তি, ভাষা ও তর্কের প্রয়োগ করা হয়। যাতে পরীক্ষা নিরীক্ষার বাহ্যিক জগৎ থেকে আহরিত বিভিন্ন উপাত্তের সম্পর্কসমূহের সম্ভবনার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

প্রায়োগিক গবেষণা হচ্ছে ধৈর্যমণ্ডিত সর্তক ও কঠোর পর্যালোচনার মাধ্যম এই উপাত্তগুলো সংগ্রহ করার। অতঃপর সূক্ষ্মতার সাথে বিস্তারিতভাবে এগুলো নথিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া যাতে অন্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার ও ফলাফলগুলো পর্যালোচনা করতে পারেন। তত্ত্ব ও প্রয়োগেক গবেষণা একে অপরের সম্পূরক। একটি অপরটি ছাড়া শূন্য ও স্থবির কোনোটিই একা টিকে থাকতে পারে না। যে মতবাদকে সত্যের আলোকে সংগ্রহ করা হয়নি তা হচ্ছে অর্থহীন সংগ্রহ[৪]। যদি তাই হয় তাহলে সেই সমাজের অধ্যয়ন কি কখনো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আলোকে করা যায়, যার কোন সংজ্ঞা এখনো যথাযথভাবে নির্ধারিত হয়নি? ঐ মানব জাতির আচরণ কি কখনো বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার আওতায় আনা সম্ভব যার প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি এবং যে কোনো মুহূর্তে যে বৈচিত্রময় কর্মকাণ্ডের কোনটি বেছে নিবে যার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই।

মানুষ হচ্ছে এমন সকল চালিকাশক্তির সমাবেশ যার উত্তম হচ্ছে মন অথবা অনুভূতির বিভিন্ন অবস্থা। হব্‌স এর মানবিক আচরণ অনেক ধরনের চালিকাশক্তি

---

[3] The Ozford English Dictionary : Science

[4] Beisanz, Introduction to Sociology, P. 11

www.amarboi.org

দ্বারা পরিচালিত; ভয়, সম্মান ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোপরি নিজস্ব স্বার্থ। তদুপরি মানবিক আচরণ হচ্ছে অত্যন্ত হেঁয়ালিপূর্ণ ও অস্থির প্রকৃতির যার কারণে কোনো বিজ্ঞানসম্মত নিয়মের আওতায় তাকে আনা কঠিন।

তাছাড়া, খোদ বিজ্ঞানেরও যথার্থ বলতে কোনো কিছু নেই। এই অবস্থা অনেকটা সমাজবিজ্ঞানের মতোই, প্রস্তাবনাগুলো যে সকল বিশ্লেষণের আলোকে পেশ করা হয় তা হলো : যতদূর আমরা জানি অন্যান্য বস্তুগুলোই। তাই সামাজিক এই পর্যায়ে অথবা আমাদের সংস্কৃতিতে সম্ভবনার ভাষায়ও তা প্রকাশ করা হয়। যদিও আমরা 'ক' ধরি তাহলে ১৩ হওয়ার সম্ভবনা ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ। এমনকি আণবিক বিশ্বেও নিশ্চয়তার চাইতে সম্ভাবনার পরিমাণ বেশি[৫]। তাই বিজ্ঞান থেকে আহরিত বিদ্যা নিশ্চিত কিছু নয় যেহেতু এটিও অনুমানভিত্তিক স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভরশীল। এখানে যুক্তির ভিত্তিতেই কোনো কিছু ধারণা করা হয়।

গ. যুক্তি

যুক্তির সংজ্ঞা হচ্ছে, এমন এক বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি যা কোনো উদ্দেশ্য সাধনে চিন্তাধারণা উন্নয়নে অথবা কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে অথবা মানব মনের চিন্তা প্রক্রিয়ার দিকনির্দেশনার উন্নয়নে প্রয়োগ করা হয়[৬]।

প্লেটো মনে করেন, যুক্তি হচ্ছে এমন উপকরণ যার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে, নির্যাস অথবা অপরিবর্তনীয় আকৃতির বোধগম্য হয়। যুক্তির মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান বোধ পরিবর্তনশীল বাহ্যিক বিশ্বের ইন্দ্রজাত ধারণা হতে প্রাপ্ত মতবাদ থেকে ভিন্ন। এখান থেকেই ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত সঠিক যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত উৎস বিদ্যার (Epistenological) জন্ম হয়। যুক্তি হচ্ছে উচ্চমার্গের বোধশক্তি। এই অন্তর্নিহিত গুণের কারণেই মানব জাতি অন্যান্য প্রাণিকুল থেকে ভিন্ন। এর কল্যাণেই সে প্রত্যক্ষভাবে সার্বজনীন সত্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়, অথবা এমন সকল মূলনীতি যার আলোকে যৌক্তিক বলে বিবেচিত এই বিশ্ব পরিচালিত হয়[৭]।

স্মর্তব্য যে প্লেটোর ধারণা ও আকৃতি সমন্ধে যে ধারণা দিয়ে গেছেন তার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এই বিশ্বাস যে বাস্তবতা হচ্ছে অপরিবর্তনীয় ধারণার সমষ্টি। তিনি তাঁর

---

[5] Ibid, P. 13

[6] Oxford Dictionary: "Reason"

[7] A Dictionary of Social Science, "Reason", P 5-7

www.amarboi.org

চিন্তা অথবা যুক্তিমুখী প্রক্রিয়ায় এই উপসংহারেই পৌছান। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরই শিষ্য এ্যারিস্টটল দ্বিমত পোষণ করেন এবং বলেন যে বাস্তবতার সাথে অদৃশ্য ধারণাসমূহের কোনো সম্পর্ক নেই। বরঞ্চ মানবিক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে আহরিত ব্যক্তি পর্যায়ে পর্যালোচনা যোগ্য প্রপঞ্চের সাথেই তার সম্পর্ক। এখানেই ধরা পড়ে প্লেটোনিক মতবাদের দুর্বলতা।

অ্যারিস্টটলকে বলা হয়, তিনি যুক্তিবাদের সাথে প্রয়োগবাদ অথবা নিরীক্ষার সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থ Politics এ সামাজিক প্রপঞ্চসমূহের নিরীক্ষামূলক অধ্যয়নের প্রবর্তন ঘটান। পক্ষান্তরে প্লেটো অধিকাংশতই কম বিজ্ঞানমুখী ধারণামূলক পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

কোনো কোনো বিষয়ে অ্যারিস্টটল তাঁর গুরু প্লেটোর সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও তিনি ছিলে গুরুর মতোই যুক্তিবাদী এবং যুক্তির জন্য তার ভালবাসা ছিল অগাধ।

চিন্তা অথবা যুক্তি নির্ভর প্রক্রিয়া যে নির্ভরযোগ্য ফলাফল এনে দেয় তা প্রমাণ করতে তিনি যুক্তির এমন ধারণা প্রবর্তন করেন যা থেকে Syllogism বা তুলনামূলক বিশ্লেষণ মতবাদের উৎপত্তি হয়। এই মতবাদের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে বৃহৎ যুক্তি, ক্ষুদ্র যুক্তি ও উপসংহার।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৃহৎ যুক্তি হচ্ছে মানুষ মাত্রই মরণশীল। এর ক্ষুদ্র যুক্তি হচ্ছে, প্লেটো একজন মানুষ। ফলাফল হিসেবে এর উপসংহার দাঁড়াবে যে, প্লেটো মরনশীল।

এ ধরনের যুক্তি অসম্পূর্ণ বলে ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অ্যারিস্টটলের মতে যদি বলা হয়, মানুষ জীবন্ত। সকল গ্রিক মানুষ-এর অর্থ এই নয় যে প্রাচীন গ্রিকরাও বেঁচে আছে। এর অর্থ হচ্ছে বাস্তবতা নিরূপনের ক্ষেত্রে যুক্তির উপর নির্ভর করা যায় না।

ইবনে তাইমিয়্যা তাঁর কিতাব আল-আক্‌দ ওয়াল নাক্‌ল (যুক্তি ও বাণী) গ্রন্থে এই ধরনের দর্শনের ব্যাপক সমালোচনা করেন। তাছাড়া আল-রাদ্দ আলাল মান্তিকিয়্যীন (যুক্তিবাদীদের অপনোদন) গ্রন্থে অ্যারিস্টটলের যুক্তি ও মতবাদের খণ্ডন করেন। পশ্চিমাদের মধ্যে Hume অ্যারিস্টটলের কারণিক মতবাদের খণ্ডন করেন। তারও কয়েক শতাব্দী আগে ইমাম গাজ্জালী কারণিকতার শৃঙ্খলাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করেন।

হেউমের মতে প্রকৃত জ্ঞানের একমাত্র উৎস হচ্ছে অভিজ্ঞতা। তিনি যুক্তির গোড়ায় আঘাত করে বলেন যুক্তি চর্চার অর্থই হচ্ছে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো, তেমনি

www.amarboi.org

বিজ্ঞানের কারণিক জ্ঞানচর্চাও নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা অভিজ্ঞতার ধোপে কারণিকতা টিকতে পারে না।

হিউমের বলেন, যদি নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর বিবেচনা করা হয় তাহলে এর বাইরে কোনো যুক্তি চর্চা করা যাবে না। যদি বস্তুসমূহের অবিরত একাত্মতাও আমরা পর্যালোচনা
করি তাহলেও অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো বস্তুর ব্যাপারে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি না[৮]।

মনের কথা বলতে গিয়ে হিউম বলেন, এটি হচ্ছে ধারণা, স্মৃতি, কল্পনা ও অনুভূতির স্রোত। তিনি মনকে প্রকৃত সত্তা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। বৈজ্ঞানিক মূল্য সম্বন্ধে তার কথা হচ্ছে তারা কখনো প্রকৃতির সন্তান হতে পারে না। বরঞ্চ তা হচ্ছে মানব সন্তনের কাল্পনিক ক্রিয়ার ফসল[৯]।

ঘ. অভিজ্ঞতা

হিউম মনে করেন প্রকৃত বিজ্ঞানের উৎস হচ্ছে অভিজ্ঞতা। তবে যুক্তিবাদীরা এর সমালোচনা করেন এই বলে যেহেতু অভিজ্ঞতার হচ্ছে ইন্দ্রজাত ধারণার ফলাফল সেহেতু তা প্রতারণার শিকার হতে পারে। Descartes এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে ইন্দ্রজাত জ্ঞান অসংলগ্ন ও বৈচিত্রময় হতে পারে। তাই সদা পরিবর্তনশীল ইন্দ্রসমূহের স্বাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়[১০]।

যুক্তিবাদ হচ্ছে অভিজ্ঞতাবাদ অথবা ইন্দ্রিয়বাদের বিরোধী মতবাদ যার বক্তব্য হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস ইন্দ্রজাত ধারণা অথবা অভিজ্ঞতা নয় বরঞ্চ যুক্তিই হচ্ছে তা। যুক্তিবাদীরা মনে করেন মানব মানসের অন্তর্নিহিত গুণ হচ্ছে সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধীয় ধারণা। তাই একমাত্র সেটাই হতে পারে বস্তু সম্বন্ধীয় ধারণা। তাই একমাত্র সেটাই হতে পারে বস্তু সম্পর্কীয় সঠিক জ্ঞানের আধার।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, যুক্তিবাদীদের কাছে অভিজ্ঞতার কোনো মূল্য নেই যেহেতু তার উৎস হচ্ছে বাহ্যিক পরিবেশ এবং তা পরিবর্তনযোগ্য ও স্থান ভেদে একে অপর থেকে ভিন্ন। হবসের মতো প্রয়োগবাদীরা মনে করেন ইন্দ্রজাত ধারণাই হচ্ছে সকল

---

[8] David Hume, Selections, ed. Charles W. Hendel, P. 43 Krawier, System and Theories of Psychology, P. 22

[9] Krawier, System and Theories of Psychology, P. 22

[10] Martindale, The Nature and Types of Sociology Theory, P. 216

www.amarboi.org

জ্ঞানের উৎস। এভাবে তারা যুক্তিবাদীদের বিরোধিতা করে মানব মানসে অন্তর্নিহিত ধারণা সম্বন্ধীয় মতবাদকে অস্বীকার করেন। পক্ষান্তরে হিউম তাঁর মতবাদ থেকে মানব মানসকে উৎখাত করেন। যদি তাই হয় তাহলে যা দাঁড়ায় তা হলো না বিজ্ঞান, না যুক্তি, না অভিজ্ঞতা এমনকি না ইন্দ্রজাত ধারণা প্রকৃত জ্ঞানের উৎস হতে পারে।

উপরোক্ত কোনো মতবাদের আওতায় সমাজবিজ্ঞান তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। কেননা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সমাজের অধ্যয়ন কোনো কাজে আসবে না, যেহেতু খোদ বিজ্ঞানেরই রয়েছে নিজস্ব সীমাবদ্ধতা ও প্রমাণিত খুঁত।

যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এখন আমরা নৈতিকতা বা নীতি বিজ্ঞানের দিকে যেতে পারি। প্লেটো ও অ্যারিস্টটল মানব মানসের নৈতিক প্রবণতার আলোকে সমাজের বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। তবে অধ্যাপক ব্রাউন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Principles of Ethics গ্রন্থে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের নৈতিক মতবাদের কিছু ঘাটতি তুলে ধরেন :

প্লেটো ন্যায়বিচার ও কল্যাণ সম্বন্ধে চমৎকার লিখেছেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব মতবাদে শিশু হত্যা, অসহায় ও বৃদ্ধাদের হত্যা করার বৈধতা ছিল। অ্যারিস্টটলের নৈতিকতা সর্বযুগের জন্য মূল্যবান কিছু কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে দাসত্ব যেমন ছিল ন্যায় সংঙ্গত তেমনি যুক্তি সঙ্গত।

যে কোনো রাষ্ট্রের অধিকর্তাদের জন্য প্লেটোর Republic ও অ্যারিস্টটলের Politics ছিল চমৎকার দিকনির্দেশনা। তবে এই কাজ দুইটির মধ্যে গ্রিক সামাজিক চিন্তাধারার ইউরোপীয় বৈশিষ্টের প্রতিফলনই দেখা যায়। সেগুলোতে নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের এমন কোনো সঠিক সংজ্ঞা নেই যা বাস্তব সমাজে প্রযোজ্য।

www.amarboi.org

নবম অধ্যায়

নীতিবিজ্ঞান

ক. সংজ্ঞা

নীতিবিজ্ঞান হচ্ছে ঐ বিজ্ঞান যা মানব জাতির আচরণের সাথে সম্পৃক্ত। যার আলোকে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় নির্ধারন করা হবে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Ethics। এটি গ্রিক শব্দ Ethos থেকে এসেছে। যার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে প্রথা ও ব্যবহার। যেগুলো নির্দিষ্ট দলের বৈশিষ্ট হিসেবে চিহ্নিত। এগুলোর কারণেই কোনো গোষ্ঠী অপরাপর দল কিংবা গোষ্ঠী থেকে পার্থক্যমণ্ডিত হয়ে থাকে। তাদের এই বৈশিষ্টগুলোই চাল চরিত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এর সমার্থক ল্যাটিন শব্দ হচ্ছে Moral যা এসেছে Mores থেকে[১]।

সক্রেটিসের মতে, নৈতিক অভিজ্ঞতার বৈশিষ্টসমূহ ও তার বিপরীতে সাধারণ নৈতিক মতবাদগুলোর পরস্পর বিরোধিতা ও অসারতা বিশদভাবে পর্যালোচনা করা ছাড়া কোনো নীতিবিজ্ঞানের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সক্রেটিস যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, কবি, বক্তা ও দার্শনিকদের মত যারাই মানব জাতিকে জীবন সমন্ধীয় শিক্ষা দিয়েছেন, তাদের কেউ যুক্তি, তর্ক কিংবা পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়ে নিজেদের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। তাদের সবাই ছিলেন অস্থির চিত্তের। তাই মূল সমস্যা হচ্ছে কী কী ভালো তা খুঁজে বের করা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো চিহ্নিত করা। মানুষ নিজের দৃষ্টিতে কোনো কিছুকে ভালো মনে করে ভুল করে বসে। কেননা অন্যান্য কল্যাণের তুলনায় তা তুচ্ছ[২]।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জার্মান দার্শনিক Neitzsche নৈতিক আপেক্ষিকতার কথা বলেন। তার মতে একমাত্র কল্যাণই মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে বৃদ্ধি করতে পারে। তবে স্থান ও কালের বৈচিত্রের কারণে এটি অর্জন করতে হয় বিভিন্ন নৈতিক উপকরণের মাধ্যমে। তাই তিনি বিশ্বজনিন কোনো আচরণবিধি

---

[1] Dewey, Ethics, P. 3

[2] Ency. Britannica, article "Ethics" vol. 10, P. 762

www.amarboi.org

প্রবর্তনের প্রয়োজন মনে করেননি। তিনি মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন চেয়েছেন। কেননা তার মতে, খ্রিষ্টিয় মূল্যবোধ নৈরাশ্যবাদ আর অবক্ষয় ছাড়া কিছুই নয়। তার মতে, যাদের ক্ষমতা অধিগ্রহণের ইচ্ছা ছিল, নৈতিকতা তাদের জন্য ছিল একটি মাধ্যম জাতীয় হাতিয়ার মাত্র। তাই উদ্দেশ্যভেদে আমরা ব্যবস্থারও ভিন্নতা দেখতে পাই। যে শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর সেই সঠিক অবস্থানে থাকে। আর যে দুর্বল তার ভাগ্যে লেখা থাকে অসত্যের কালিমা।

Dewey -এর মতে কৃষ্টি ও প্রথার উপর ভর করেই নৈতিকতার আগমন ঘটে। কেননা প্রথা শুধুমাত্র কর্মকাণ্ডের অভ্যাসগত পদ্ধতি নয়। বরঞ্চ এমন আচরণ পদ্ধতি যেগুলোকে গোষ্ঠী অথবা সমাজ প্রত্যায়ন করে। তাই গোষ্ঠীর প্রথা বিরোধী কিছু করার অর্থই হচ্ছে তাদের অসন্তুষ্টি ও প্রতাখ্যান কেড়ে নেওয়া। তাই সবাই প্রথা পালনে নিষ্ঠাবান থাকে এবং এখান থেকেই জন্ম হয় প্রথাগত নৈতিকতার।

খ. প্রথাগত নৈতিকতা (Customary Morality)

দলীয় জীবন দলীয় আত্মীয়তার রূপ লাভ করে যখন একদল ব্যক্তি মনে করতে লাগল তারা সবাই অভিন্ন পূর্বপুরুষের বংশধর। তাই Totem বা প্রাণিবাদী দল পারিবারিক বা আত্মীয়তা দল থেকে ভিন্ন তার ব্যাপকতার কারণে। টটেম দল অনেকগুলো পরিববার নিয়ে গঠিত এবং নির্দিষ্ট উপাস্য জন্তু বা উদ্ভিদের কল্যাণে এটি একটি বিশেষ টটেম দল হিসেবে চিহ্নিত। এভাবেই বৃহত্তর দলের আদলে একটি সমাজ গড়ে ওঠে।

Sumner মনে করেন আদি দলগুলোর মুখ্য চিন্তা ছিল খাদ্য, আত্মরক্ষা ও অন্যান্য প্রাথমিক জরুরত। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা অথবা যুক্তিমুখী প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে ব্যক্তির মন সক্রিয় হয়ে চাহিদা মেটাবার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। একটি প্রাণীর প্রাথমিক চাহিদা হচ্ছে বেঁচে থেকে বড় হওয়া। তা করতে হলে তার শরীরের চাহিদা তাকে মেটাতে হবে। তার পরই মন কি চায় তার দিকে নজর দেয়।

দলীয় জীবন দলের সদস্যদের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। তাদের দলীয় যে নৈতিকতা সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে তার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রথা। Sumner এর মতে প্রথাগুলো আবার এমন সকল কর্মপন্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যেগুলো দলের সবার কাছে প্রত্যায়িত ও অভিন্ন বলে বিবেচিত অথবা নৈতিক বলে চিহ্নিত[3]।

---

[3] Sumner, Folklore, P. 30

www.amarboi.org

প্রথার ক্রমবিকাশের কথা বলতে গিয়ে এটা বলাই যথার্থ হবে যে মানব জাতি তাদের অসভ্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বংশানুক্রমে কিছু মনস্তাত্ত্বিক আচরণ, চাহিদা, কৌশল ও বাহ্যিক আচরণ পায়। এগুলো তাকে খাদ্য, যৌন চাহিদা ও অন্যান্য প্রয়োজন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে। এখান থেকেই উৎসারিত হয় গণ প্রপঞ্চ, সাদৃশ্যের ব্যাপকতা এবং পারস্পরিক অবদান যেগুলো এক যোগে লোক প্রথার সৃষ্টি করে যা নির্দিষ্ট জনগণের আচরণবিধি হিসেবেও পরিচিতি লাভ করে। জনগণ তাদের অজান্তেই লোক প্রথাকে আপন করে নেয় যার কারণে কে তা প্রবর্তন করল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এই লোক প্রথা এক সময় কৃষ্টিতে পরিণত হয় যা নৈতিকতা অথবা প্রথার রূপ ধারণ করে[৪]।

নবজাত জীবজন্তুর উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে উদ্দেশ্যের সাথে মাধ্যমের সম্পর্ক বিষয়ে যদি কোনো অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে চাহিদা মেটাবার চেষ্টা প্রবল হয় না। পরীক্ষা ও ব্যর্থতার এই পদ্ধতি পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ, পরাজয় ও হতাশারই উদ্রেক করে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অপরিপক্ক পরীক্ষা পদ্ধতি। তবে শুরুতে মানব জাতির প্রচেষ্টার ধরন এ রকমই ছিল। চাহিদা ছিল জবরদস্তিমূলক চালিকা শক্তি। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় তা মেটাবার প্রচেষ্টা চালানো হবে তা নির্ধারণ করত আনন্দ ও বেদনা। এভাবেই কাজ কিভাবে করতে হবে তা নির্ধারণ করা হলো। এরই আলোকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোন পদ্ধতিতে উত্তমরূপে সাধিত হবে তা নির্ধারিত হলো। এভাবে ধীরে ধীরে জন্ম নিল বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা এবং একে অপরের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে লাগল। এভাবে কোন পদ্ধতি সর্বোত্তম হতে পারে তা চিহ্নিত হতে লাগল।

এ যাবৎ আমরা আদিম সমাজের নৈতিকতার উন্নয়নে প্রথার ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। যথার্থ পদ্ধতি চিহ্নিত করার ক্ষমতা থেকে প্রথা আইনের শক্তি অর্জন করে এবং ভালো বলে বিবেচিত হয়। নৈতিকতার সঠিক মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার কারণে প্রথাভঙ্গ সমগ্র সমাজের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ইতিহাস এটারও স্বাক্ষী যে পুরো সমাজ কিংবা দলের সবাই পুরানো প্রথা ওপর অসন্তুষ্ট হয়। যদি সেই প্রথা জীবনের নতুন কোনো বিষয় বা সমস্যার সমাধান দিতে না পারে। এখান থেকেই উৎসারিত হয় চিন্তাশীল নৈতিকতার যা প্রথাগত নৈতিকতার জায়গা দখল করে নেয়।

---

[৪] Ibid, P. 19

www.amarboi.org

গ. চিন্তাশীল নৈতিকতা

চিন্তাশীল নৈতিকতার বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে নৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি। অ্যারিস্টটল এ প্রসঙ্গে বলেন, যে নৈতিক কর্মকাণ্ড চর্চা করতে চাইবে তার একটি নির্দিষ্ট মনের অবস্থা থাকতে হবে। প্রথমত সে কী করছে তা তাকে জানতে হবে। দ্বিতীয়ত তাকে তা বেছে নিতে হবে এবং ঐ কাজের জন্যই তাকে বেছে নিতে হবে। তৃতীয়ত এই কর্মকাণ্ড হবে সুসংগঠিত ও স্থির প্রকৃতির প্রতিফলন। মানুষের চাল চরিত্র একই প্রকৃতির। তাঁর মতে, একজন মানুষ ভাল হয় শিক্ষার মাধ্যমে যা হচ্ছে এ ধরনের চারিত্রিক প্রশিক্ষণ এবং এই শিক্ষা সে গ্রহণ করে উত্তম পরিবারে ও উত্তম নগরীতে[৫]।

কিন্তু আমরা যদি নৈতিকতার ক্রান্তিয় মতবাদ নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখব তা একেবারেই ভিন্ন। Kant (১৭২৪-১৮০৪) এর মতে নৈতিক আইনের আগেই ভালো ও মন্দের মতবাদ চর্চা করা যাবে না। বরঞ্চ তার পরেও তাকে অবলম্বন করে। তাঁর মতে মঙ্গল হচ্ছে নৈতিক বিধানের অধিনস্থ বিষয়। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, স্বভাবজাত প্রবৃত্তি একজন মাকে বলে শিশুর যত্ন নিতে। কিন্তু নৈতিকভাবে ভালো হতে হলে তাকে নৈতিক বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। আর তা না হলে সে তার শিশুর যত্ন নেওয়াটাকে বাধ্যতামূলক মনে করবে। এভাবেই বলা যায় একটি কাজ তখনই ভালো হয় যখন তা করা হয় নৈতিক বিধানের আলোকে।

বিস্তারিত বুঝতে বলতে হয়, একজন মানুষ একজন গ্রাহকের সেবা করে হয়তো পেশাদারি সফলতার আকাঙ্ক্ষাবশত অথবা তার উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা উত্তমরূপে সম্পন্ন করা পেশাদারির অভ্যাসবশত। কিন্তু তার একই কাজ নৈতিকভাবে উত্তম বলে তখনই বিবেচিত হবে যখন নৈতিক বিধানের অধিনস্থ হবে তার অন্যের সেবা করার আকাঙ্ক্ষা এবং তদ্বারা তার আচরণ প্রভাবিত হবে[৬]।

তাই বলা যায় দায়িত্ব ও শ্রদ্ধাই হচ্ছে কোনো কাজ ভালোভাবে করার উত্তম পন্থা। কোনো কাজ করার আগে আমাদের জানতে হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব কি এবং নিজেদের জিজ্ঞেস করতে হবে আত্মবিরোধে না জড়িয়ে কাজটিকে সার্বজনীন করার কোনো ইচ্ছা আমরা করি কি না। উদাহরণস্বরূপ, এটা বলা বিপদে পড়লে আমি কি এমন কোনো প্রতিশ্রুতি করতে পারি কিনা যা আমার করার ইচ্ছা নাই?

---

[5] Ency. Britannica, article Ethics vol. 10, P. 762

[6] Dewey, op. cit., P. 240

www.amarboi.org

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রতিভাত হয় যে কাজকে সার্বজনীন করার বিষয়টি স্ববিরোধী। কারণ এই ধরনের নীতি মানলে কখনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাবে না। কেউ প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না। সঠিক কাজের মূলনীতি সংক্ষেপে বলতে গিয়ে কান্ট বলেন, এমনভাবে কাজ করো যেন তার জন্য মজুরি তুমি নিজেই দিবে। এর অর্থ হলো অন্যান্য সবাইকে স্বার্থ হাসিলের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা। সুতরাং যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় যে অন্যকে তার স্বার্থ উদ্ধারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে তা ভীষণ অনৈতিক।

এই মতবাদের সমস্যা তখনই দেখা দিবে যখন নিজের কল্যাণের স্বার্থে অন্যের কল্যাণের সংঘর্ষ দেখা দিবে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের সন্তুষ্টি বিধানকে অনেক মূল্যায়ন বলে মনে করে। এই ক্ষেত্রে কান্টের মতবাদ অকার্যকর ও অর্থহীন মনে হবে। আবার প্রশ্ন ওঠে মানুষের চরিত্র অথবা অন্যের মঙ্গল বিধানের। নিঃসন্দেহে চরিত্র গঠনের বিষয়টি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সুনির্দিষ্ট নৈতিক বিধান ও নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া তা সম্ভব নয়।

অ্যারিস্টটল নৈতিক শিক্ষার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অস্পষ্ট ও অপর্যাপ্ত। কান্ট নিজেও চরিত্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেও কিছু বলেননি। চরিত্রকে বাদ দিয়ে ভালো কিছুই আশা করা যায় না। কেননা সামাজিক পরিস্থিতির সাথে সাথে নৈতিকতাও পাল্টাতে থাকে। পুণ্য হিসেবে ন্যায় বিচারের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে এবং সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও এই ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

প্লেটো তাঁর Republic গ্রন্থে বলেছেন, ন্যায়বিচার বলতে চারটি মূলনীতির একটিকে বুঝায়। অন্য তিনটি হচ্ছে প্রজ্ঞা, সাহসিকতা ও সংযম। ন্যায়বিচার হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক গুণ। একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হচ্ছেন আত্ম-শৃংখলাসম্পন্ন মানুষ। যার আবেগ-আনুভূতি যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পক্ষান্তরে Neitzsche মনে করেন, এটি হচ্ছে শক্তিশালীর অধিকার- Might is right। Hobbes -এর মত ন্যায় বিচারের ব্যাপারে আরো ভিন্ন যখন কোন চুক্তি হয়ে যায় তখন তা ভঙ্গ করাটাই অন্যায়। যদি তাই হয় তাহলে তার মতে ন্যায় হচ্ছে এক ধরনের কৃত্রিম গুণ। তার মতে Stoics যে ন্যায়ের কথা বলেন তার চোখে সবাই সমান যা প্লেটোর ন্যায় বিচারের বিপরীত[7]।

ন্যায় একটি অপরিবর্তনীয় গুণ। তবে ব্যক্তিবাদী প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার অনুমোদন রয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধন সম্পদ যদি সমাজের

[7] A Dictionary of Social Sciences, Justice

www.amarboi.org

কল্যাণে কিছুটা ব্যয় করা না হয় তাও কি ন্যায়বিচার? অনেক সমাজে এমনও দেখা গেছে যে পিতার সকল উত্তরাধিকারী হবে বড় ছেলে অন্য সবাই বাদ। Dewey বলেছেন এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যার আলোকে বলা যায় সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাদৃত গুণাবলীও পরিবর্তন ঘটতে পারে। কর ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত কেন? মুক্ত বাণিজ্য ও তার নিরাপত্তার নৈতিক বিধানগুলো কী কী? জাতীয় সম্পদের বিতরণে ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোনটি হতে পারে।

Dewey -এর মতে আবেগের তাড়নায় অনেক উদ্দেশ্যই আমাদের কাছে মহান মনে হতে পারে বাস্তবে যা মন্দ[৪]। এমতাবস্থায় নৈতিকতার কোনো মানদণ্ড কি নির্ধারণ করা সম্ভব? কান্ট নৈতিক বিধানের উপর জোর দিলেও তা যদি চরিত্র দ্বারা সমর্থিত না হয় তাহলে তার কোনো শুভ প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে না।

কান্ট হয়তোবা হাজারো বছর আগে এ বিষয়ে যা বলে গেছেন তারই প্রত্যায়ন করেছেন। তবে তিনি হয়তো লক্ষ্য করতে পারেননি যে চরিত্রই হচ্ছে নৈতিকতার মূল ভিত্তি। তার নৈতিকতা সম্বন্ধীয় মতবাদ হযতো ইসলামের শিক্ষা থেকেই নেওয়া। বিশেষ করে মহানবি সা.- এর বাণী থেকে যাতে বলা যায়, তোমার ভাইয়ের জন্য তাই চাইবে যা তুমি নিজের জন্য চাও; যে নিজের জন্য যা চাইবে অন্যের জন্য তা চাইবে না তার কোন ইমান নেই (বুখারী) ।

বুখারী তাঁর গ্রন্থ আল-আদাবুল মুফরাদে এই হাদিসের আরো কিছু শব্দের উদ্ধৃতি দিয়ে মহানবি সা.-এর হাদিসের মর্মার্থ আরো পরিষ্কার করেছেন। আল-আদাবুল মুফরাদে হাদিসটি নিম্নরূপে বিধৃত হয়েছে। তার ইমান নেই যে নিজের জন্য যে মঙ্গল আশা করে তার ভাইয়ের জন্য সে মঙ্গল আশা করে না। এই হাদিসটি নিঃসন্দেহে নৈতিকতার সর্বোচ্চ মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছে। কেননা এই হাদিসের ভাষ্যমতে কেউ অন্য কারো জন্য মঙ্গল ছাড়া কোনো কিছু আশা করতে পারে না। কান্ট প্রদর্শিত নৈতিকতা মতবাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির প্রশ্ন তো আসেই না। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি তো হচ্ছে কোনো মতে নিজের স্বার্থ হাসিলের একটি মাধ্যম এবং তার সমালোচনা মহানবি সা. কঠোরভাবে এরশাদ করেছেন, যে আমাদেরকে প্রতারিত করে সে আমাদের কেউ না (মুসলিম)। যদি তাই হয় তাহলে কান্টের মতবাদ একেবারেই অসার। মূলত নিজে নতুন কিছু দিতে পারেননি।

---

[৪] Dewey, op. cit:, P. 205

www.amarboi.org

আমরা আমাদের এই উদ্ধৃতির স্বপক্ষে কান্টের আরেকটি বক্তব্য উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেন, ইচ্ছাই নির্ধারণ করে কর্মকাণ্ড। এটাতো মহানবি সা.-এর ঐ বাণীর হুবহু নকল : নিশ্চয় ইচ্ছার উপর কর্মফল নির্ভরশীল (বুখারি)।

যদি তাই হয় তাহলে কান্টের মতবাদে আমরা নতুন কিছুই দেখছি না। সঠিক সিদ্ধান্ত পৌছার ক্ষেত্রে তিনি সেই ব্যর্থতা দেখিয়েছেন। তার কারণ হলো তিনি মূল শিক্ষা থেকে হয়তো এক পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন এবং সেগুলো হচ্ছে চরিত্র সম্পর্কিত মহানবি সা.- এর অন্যান্য শিক্ষা :

> তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র উত্তম সেই সর্বোত্তম। (মুসলিম) তাছাড়া কোরআনেও নৈতিকতার উপর ব্যাপক জোর দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে) বেশি ভয় করে (সুরা হুজুরাত ৪৯ : ১৩)।

নৈতিক চরিত্রের উপরই শুধু ইসলাম জোর দেয়নি। বরঞ্চ মহানবি সা. তার ব্যবহারিক জীবনে তা পালন করে দেখিয়ে গেছেন। কোরআন নিজেও একটি উত্তম নৈতিক বিধান যা মহানবি সা.- এর জীবনীকে একটি চারিত্রিক আদর্শ হিসেবে ঘোষণা দেয়। মানব জাতিকে তাঁর মধ্যেই উত্তম আদর্শ খোঁজে পেতে বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ (সুরা আহযাব ৩৩ : ২১)। এভাবেই ইসলাম সর্বাগ্রে চারিত্রিক প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয় এবং মানুষের অন্তরে অন্যের কল্যাণ বিধানের অনুপ্রেরণা দেয়। এই প্রক্রিয়া ছাড়া কখনো নৈতিক মতবাদ কার্যকর হতে পারে না।

এ পর্যন্ত আমরা কান্টের নৈতিক মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছি যাতে নৈতিক বিধান ও ইচ্ছার উপর জোর দেওয়া হয়। তাঁর মতে ইচ্ছাই কর্মকাণ্ডের শক্তি। পক্ষান্তরে Bentham (১৭৪৮-১৮৪২) পরিণতির উপর জোর দিয়েছেন। নৈতিকতার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন ফলাফল বয়ে আনা যা মানুষের সুখ বিধান করবে। কান্ট যেখানে কাজ নির্বাচনের ইচ্ছার উপর জোর দিয়েছেন সেখানে তিনি খোদ সম্পাদিত কাজ বা তার ফলাফলের উপর জোর দিয়েছেন।

আমরা আধুনিক সকল মতবাদের পর্যালোচনা করে দেখেছি যে নৈতিক বিধানের ক্ষেত্রে চিন্তাবিদদের মতপার্থক্য ব্যাপক। কেউ যেমন কর্মপদ্ধতির উপর জোর দেন। কেননা কর্মফল মানুষের সাধ্যের বাইরে তেমনি অন্য কেউ কল্যাণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আবার বিষয়টি প্রত্যায়ন ও প্রত্যায়মানের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাদের মতে নৈতিক বাস্তবতার মূল নিন্দা ও প্রশংসা।

www.amarboi.org

তবে মৌলিক বিধান হলো এটি যে আমরা উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কোনো বিভাজন সৃষ্টি করতে পারি না। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কোনটি ভালো ও কোনটি মন্দ তা নির্ধারণ করা কখনো কখনো কঠিন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এমন তো হতে পারে যা তোমাদের ভালো লাগে না, তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার এমন কোন জিনিস যা তোমাদের খুবই ভালো লাগবে, তা হবে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। তাহলে প্রকৃত কল্যাণের উপলব্ধি আমাদের সাধ্যের বাইরে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন প্রকৃত কল্যাণ কোথায় নিহিত। তাই তার বাণীর উপর নির্ভর করাই উত্তম। অন্যথায় আমাদের অসংখ্য মানুষের যুক্তি বুদ্ধির উত্তাল স্রোতে খাবি খেতে হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে চিন্তাশীল নৈতিকতা মানবিক চিন্তা ভাবনার উপর গুরুত্বারোপ করে এমন এক চরিত্রের কথা বলা যা হেঁয়ালি ও অস্থিতিশীল। প্রথাগত নৈতিকতা ও সমালোচনার শিকার হয় কারণ মাঝে মধ্যে প্রথা অনৈতিক কিছুকে সমর্থন করলেও তা নৈতিক বলে মেনে নিতে হয়। ফলে তা অযৌক্তিক ও মারাত্মক হতে পারে। যেমন, কন্যা সন্তানের হত্যা প্রাক-ইসলামি যুগে মন্দ চোখে দেখা হতো না।

মানুষ যতই পরিণত বয়স্ক হতে থাকে ততই দলীয় নিয়ন্ত্রণের উপর অসন্তুষ্ট হতে থাকে। তাই পুরাতন প্রথার অনেক কিছুই তারা প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। ব্যক্তিবাদের অধীনে থাকা মনস্তাত্ত্বিক শক্তিগুলো আত্ম-প্রত্যায়নমুখী বলে প্রমাণিত হয়। এর সাথে স্বাধীন চিন্তাধারার যুক্তিবাদ যুক্ত হয়ে তারা এক যোগে প্রথাগত নৈতিকতার পুরাতন শৃংখলাকে ভেঙে দেয়। বিকল্প হিসেবে তারা ধ্যানবাদী নৈতিকতার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তাও সামাজিক পরিবর্তনের মুখে অসহায় প্রমাণিত হয়।

এ পর্যায়ে আমাদের জানতে হবে সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন কিভাবে আসে এবং তা নৈতিকতার ভিত নাড়িয়ে দেয়। আমরা সাধারণ ধারায় সামাজিক পবিরবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা বিশেষ করে নৈতিকতার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করব। এই ক্ষেত্রে আমরা গ্রিক সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে অগ্রাধিকার দিব। কেননা প্রাচ্য ও পশ্চিমা সভ্যতায় এটাকেই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন সমাজ মনে করা হয়।

www.amarboi.org

দশম অধ্যায়

নৈতিকতার পরিবর্তন

ক. গ্রিক সমাজ

আমরা আধুনিক রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারায় ন্যায়বিচার, সাম্য, উদারতা, সাংবিধানিক সরকার ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এই ধরনের যে আর্দশগুলো দেখতে পাই। তার উৎপত্তি হয় গ্রিকরা যখন থেকে নগর রাষ্ট্র নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করে। আধুনিক রাষ্ট্রের তুলনায় গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলো ছিল খুবই ছোট। এথেন্স ছিল গ্রিক সভ্যতা-সাংস্কৃতির রাজধানী।

পঞ্চম শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশ পার হতে না হতেই এথেনীয় রাষ্ট্রীয় জীবনের সোনালি যুগের পতন শুরু হয়। স্পার্টারের সাথে হেরে গেলে দর্শনের সোনালি যুগের সূচণা হয়[১]। গ্রিক ইতিহাস অনেক ব্যাপ্তিসম্পন্ন। এটিকে দেখা যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধন হিসেবে। দুই অন্ধকার যুগের সেতুবন্ধনও এটি। তাম্র যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইউরোপীয় উন্নয়নের নেতৃত্ব দেয়। তাই এর জ্ঞানচর্চাও প্রকৃত বিশ্বজনীন, আঞ্চলিক নয়[২]।

কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর গ্রিক তার আশে পাশের দেশগুলোর প্রথার এক অদ্ভুত চিত্র উপস্থাপন করতে হয়। Herodotus বিদেশীদের কৃষ্টি ও প্রথার এক অদ্ভুত বর্ণনা দেন।

অনেক দেশের আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে চরম ধার্মিকতা ও কল্যাণের মধ্যে। আবার কোনো কোনো দেশে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নির্লিপ্ততা এমনকি ঘৃণার মাঝে। প্রতিটি ব্যক্তি স্বভাবজাতভাবে তার নিজের দেশের প্রথাকেই পছন্দ করে। যদিও কোনো দেশের প্রথা প্রকৃত অর্থে কখনো অন্য দেশের প্রথার চাইতে ভালো হতে পারে না। প্রতিটি মানুষকে জীবন যাত্রার নির্দিষ্ট একটি মানদণ্ড মেনে চলতে হবে[৩]।

প্রথম দিকে যে কোনো সমাজ তার প্রথার প্রতি বেশ শ্রদ্ধাশীল থাকে। কিন্তু তা যতই অগ্রসর হতে থাকে, মন মানসিকতা উন্নত হতে থাকে ততই পুরাতন প্রথার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। Sabine বলেন সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলো শক্তিশালী হতে থাকে এবং তাদের ধ্যান ধারণাও সমৃদ্ধ হতে থাকে। এথেন্স রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছায়। Pericles

---

[1] Sabine, A History of Political Theory, P. 21

[2] Greek Ency. Britannica, vol. 10

[3] Sabine, op. cit., P. 22

www.amarboi.org

গণতন্ত্রের একটি আদর্শ নমুনা পেশ করেন। তিনিই ছিলেন মূলত গণতন্ত্রের মানস পিতা। পরিণতিস্বরূপ, রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ধারণায় গ্রিকরা বিশ্বাস করতে থাকে যে এটি হচ্ছে জীবনের ভারসাম্য যা অভিন্নরূপে সকল সদস্যই উপভোগ করে।

Heraclitus মনে করেন ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যের এই ধারণা পাওয়া যায় সূর্য থেকে। যা কখনো তার ভারসাম্যপূর্ণ গতি প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হবে না। নতুন এই ধারণা পুরাতন সমঝোতাবাদী ধারণার জায়গা নিয়ে নেয়। ইতিপূর্বে ব্যবহার ও প্রথাসিদ্ধি ছিল সকলের উপাস্য। সমঝোতা বলতে বুঝানো হতো এমন সকল কর্মকাণ্ডকে যেগুলোকে অধিকাংশ সদস্য সমর্থন করত। পূর্ববর্তী পর্যায়ে ইতিহাসের পাতায় প্রকৃতি ও সমঝোতার মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক দেখতে পাই।

পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝা যায় প্রকৃতিকে নেওয়া হয়েছে ভারসাম্য থেকে। কিন্তু গ্রিক সভ্যতারই কোনো এক রাষ্ট্র থেকে সোফিবাদীরা এথেন্সে এসে প্রকৃতির মতবাদে নতুন মাত্রা যোগ করে। তাদের মতে প্রাকৃতিক বিধান হচ্ছে সত্যের শাসনই যথার্থ। তারা মনে করেন প্রথাগত ধর্মগুলোর উৎস হচ্ছে সমঝোতা এবং স্বার্থপরতা হচ্ছে মানব প্রকৃতি।

তাদের এই মতবাদ প্রাকৃতিক দর্শনকে মানবিক অধ্যয়নে পরিণত করে। তখন আগ্রহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ব্যক্তি। অতএব রাষ্ট্রীয় সংহতি ও অভিন্ন সমতার বিষয়গুলো দুর্বল হতে থাকে। এর বিপরীতে ব্যক্তি পক্ষের আন্দোলন ত্বরান্বিত হতে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে ভারসাম্যের প্রকৃতি থেকে যে ন্যায় বিচারের ধারণা পাওয়া যায় তা শক্তিই সত্য নীতিতে পরিণত হয়। শুধু তাই নয় প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে যে ভারসাম্যপূণ্য মতবাদের সৃষ্টি হয়। তাই স্বার্থপরতার মতবাদে নতুন আলোর মুখ দেখে। সমাজতন্ত্রমুখী ভারসাম্যপূর্ণ মতবাদে যেখানে জীবনের ভারসাম্যে সবার অধিকারের কথা বলা হয় সেই মতবাদই ব্যক্তিবাদে পরিণত হয়। ধারণাগত পরিবর্তনের কারণেই নৈতিকতার পরিবর্তন দেখা দেয়। ক্ষণে ক্ষণে সামাজিক জীবন সম্বন্ধীয় অর্থেরও রূপান্তর ঘটতে থাকে। এখন আমাদের দেখতে হবে ব্যক্তিবাদ কি?

খ. ব্যক্তিবাদ (Individualism)

সামাজিক এই মতবাদে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও উন্মুক্ত কর্মকাণ্ডের উপর ব্যাপক জোর দেওয়া হয়। তবে শুরু করার আগে আমাদের জেনে রাখতে হবে যে Peloponnesian যুদ্ধে হেরে যাওয়ার কারণে ইতিমধ্যেই এথেন্সের রাজনৈতিক প্রতিপত্তির অবসান ঘটে। সাথে সাথে তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার খায়েশও মিটে যায়। এর জন্য প্লেটো এথেন্সের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে দায়ী করেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের প্রতি নিজ দায়িত্ব পালন করা ছাড়া ব্যক্তির কোনো গুরুত্ব নেই। আর অ্যারিস্টটলের মতে

www.amarboi.org

ব্যক্তি হচ্ছে রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। এভাবেই ব্যক্তিবাদ শুধু খাটো করা হয়নি। বরঞ্চ প্রত্যাখ্যানও করা হয়েছে।

কিন্তু অ্যারিস্টেটলের শিষ্য আলেকজান্ডার তাঁর ব্যক্তিবাদ সম্বন্ধীয় মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি মেসিডোনীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নাগরিকদেরকে তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর পতনের পর পরই সাম্রাজ্যের পতন ও নৈরাজ্য দেখা দেয় এবং আবির্ভাব হয় সামন্তবাদের। সামন্তপতিরাই দখল করে রাখে সমাজের উঁচু স্তর।

সামন্তবাদ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে পদানত করে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেখা দেয় প্রবল প্রতিরোধ। এই সংগ্রাম চলতে থাকে এবং ইতিহাসের দীর্ঘ অধ্যায় জুড়ে বিস্তৃত হতে থাকে। অবশেষে ১৭৩৭ সালের ফরাসি বিপ্লবে ব্যক্তিবাদ বিজয় লাভ করে। তখন মানুষকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় একজন ব্যক্তি হিসেবে, স্বাধীনতা যার জন্মের অধিকার। উল্টো নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের উপর বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে Laissez-faire অর্থাৎ করতে দাও নীতি অবলম্বন করা হয়। এই নীতির কারণে সরকার ব্যক্তির কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বিশেষ করে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিন্তাধারার স্বাধীনতা আরো গতি পায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। যেখানে পণ্ডিতগণ উত্থাপিত সকল মতবাদ বিশ্লেষণ করার সুযোগ পান। তার সাথে যুক্ত হয় শিল্প বিপ্লব যা জীবন যাত্রা ও সামাজিক নৈতিকতায় আমূল পরিবর্তন আনে।

এরপর রাজনৈতিক গণতন্ত্র যতই বিকশিত হতে থাকে এবং শিক্ষার সুযোগ যতই বাড়তে থাকে পশ্চিমা সমাজের নৈতিক সচেতনতাও তত গভীরতা ও ব্যাপ্তি লাভ করতে থাকে। প্রাকৃতিক ও সমাজবিজ্ঞানের অগ্রগতি নৈতিকতার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। কেননা বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও অনুসন্ধানও ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। এরই জেরে নৈতিকতার মানদণ্ড ও মূল্যবোধে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। পর্যালোচনার সাথে যুক্তিচর্চা যুক্ত হলে সত্যের নতুন গবেষণা শুরু হয়। এতে করে কল্যাণ ও মঙ্গলের ধারণা অনেকটাই ইন্দ্রজাত হয়ে পড়ে। এখান থেকেই উৎপত্তি হয় Utilitarianism বা উপযোগিতাবাদের।

গ. উপযোগিতাবাদ (Utilitarianism)

যুক্তরাজ্যে Jeremy Bentham (১৭৪৮-১৮৩২) যে মতবাদের কথা বলেন সেই অনুযায়ী নৈতিকতা চিন্তাধারা ও মনোবিজ্ঞান নির্ভর করে একটি মূলনীতির উপর। আর তা হচ্ছে বেদনার তুলনায় আনন্দকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। তাঁর লিখনী The Principles of Morals and Legislation (১৭৮৯) নৈতিকতার ব্যক্তিবাদী

www.amarboi.org

মতবাদকে উপযোগিতাবাদে রূপান্তরিত করে। এই মতে অধিক পরিমাণের অধিক সুখই হবে আচরণবিধির মূল ভিত্তি।

তিনি তাঁর লেখনিতে প্রাকৃতিক আইনী মতবাদের উপর ভয়াবহ আক্রমন করেন। তাঁর দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল প্রকৃতিই মানুষকে আনন্দ বেদনার সাম্রাজ্যে রেখেছে। তাই আমাদের ধ্যান ধারণা সেই অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ন্যায়বিচার ও জীবনের দিকনির্দেশনার সকল ক্ষেত্রে এই দুই শক্তির দ্বারস্ত হতে হবে। যে নিজেকে এই আনুগত্য থেকে সরিয়ে নিবে সে নিজে কি বলে তা কখনো উপলব্ধি করতে পারবে না। মূলত তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সুখের সন্ধান করা আর বেদনাকে বর্জন করা। আইনবিদ ও নীতিবিদ উভয়েরই উচিত হবে এই চিরঞ্জীব ও অপ্রতিরোধ্য প্রবৃত্তিকে অধ্যয়নের মুখ্য বিষয় বানানো। উপযোগিতার মৌলনীতির আওতাধীন সবকিছু। সবকিছুই এই চালিকাশক্তির আওতাধীন[৪]।

এভাবেই খারাপ ভালোর বিচার করা হয় আনন্দ ও বেদনার আলোকে। আর তাই হচ্ছে উপযোগিতার নৈতিকতা। উপযোগিতাবাদ অনুযায়ী মানুষ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার বর্জন ও অনন্দময় অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তার আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই পরিচালিত।

উপযোগিতাবাদীরা যুক্তিকে সন্দেহের চোখে দেখে। তারা মানুষ কী চায় তা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে মানবিক পর্যালোচনা ও নিরীক্ষার আলোকে। তারা অনুভূতি ও চাহিদার আলোকে আচার আচরণের বিচার না করে তা করে পরিণতির আলোকে। বাস্তবে প্রতিটি ব্যক্তি সবার উপর নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দকেই প্রাধান্য দেয়। তাই শুধুমাত্র স্বর্গে এর সন্ধান না করে মানবিক সমৃদ্ধির মাঝেও তা আমরা খুঁজে দেখতে পারি[৫]।

স্ববিরোধী বলে বেন্থামের মতবাদও সমালোচিত হয়। তার প্রবৃত্তি ও চাহিদা মতবাদ অনুযায়ী সবার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য। কোনো কর্মকাণ্ডের নৈতিকতা বিচার করা তা অন্যের কতটুকু সুখ বিধান করে তার উপর। বেন্থান নিজে বলেন, কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে নিজস্ব সুখ শান্তি আর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মূলনীতি হচ্ছে বিশ্বজনীন পরোপকার। তাই এই দুইটির দ্বন্দ্ব অনিবার্য[৬]।

Romola গ্রন্থে George Eliot বলেন, এটি হচ্ছে চরম দৈন্যদশার সুখ শান্তি। এতে করে আমরা আমাদের সামান্য আনন্দের জন্য অতিমাত্রায় যত্নবান হবো। ব্যক্তিগত সুখ এক ধরনের হীন প্রকৃতির সুখ। তাই একজন অসন্তুষ্ট মানুষের চাইতে সন্তুটি চিত্তের একটি শুকর উত্তম। তাছাড়া আনন্দের কোনো সঠিক ভিত্তি নেই। কেননা তা নির্ভর করে ব্যক্তির অবস্থার উপর।

---

[4] Bentham, The Theory of Legislation, P. 2 Ibid., P. 203
[5] Dewey, Ethics, P. 167
[6] Ibid., P. 203

www.amarboi.org

একটি জিনিস এক সময় পছন্দের হলে অন্য জনের কাছে তা হয়ে ওঠে অপছন্দনীয়। স্বাস্থ্য ভালো থাকতে যা কাঙ্খিত মনে হয় অসুখ হলে তা হয়ে ওঠে অনাকাঙ্ক্ষিত। পেট ভরা থাকতে যা মোটেও আকর্ষণ করে না, ক্ষুধা লাগলে তা হয়ে ওঠে অতি স্বাদের। বৃহত্তর পরিধিতে চিন্তা করলে দেখা যাবে একজন উদারমনা ব্যক্তির কাছে যা পছন্দনীয় সংকীর্ণ মনের মানুষের কাছে তা ঘৃণার বস্তু। বাচ্চার কাছে যা মনে হয় খুবই মজাদার, বড়রা দেখা যায় সে বিষয়ে একেবারেই নির্লিপ্ত। বিদ্যানের কাছে যা চিত্তাকর্ষক মুর্খের সে ব্যাপারে কোনো আগ্রহ থাকে না[৭]।

বাস্তবে সুখ নির্ধাণন করতে পারে এমন সঠিক মাপকাঠি নেই। মনের চাহিদার আলোকে যা কিছু সুখকর তা কল্যাণকর নাও হতে পারে। কারণ একজন দুষ্ট ব্যক্তি তার অসদাচারণেই আনন্দ পায়। তাই বলা যায় উপযোগিতাবাদে যখন বলা হয় আনন্দই হচ্ছে কল্যাণের উৎস তখন বাস্তবে তা ভিত্তিহীন এমনকি অনৈতিকও মনে হয়েছে।

সবশেষে বলা যায় নৈতিকতার যথার্থ কোনো সংজ্ঞা আমরা এখনো পাইনি। তাই নীতিবিজ্ঞান বাস্তবে কোনো বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নে পরিণত হতে পারেনি। সমাজবিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের মাধ্যমে সমাজকে পুনর্গঠিত করা। কিন্তু আলোচনা করে দেখেছি বিজ্ঞান নিজেও বিষয় ও বস্তুর সূক্ষ্ম ও যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। পারেনি যুক্তি ও আভিজাত্যও। তাদের কারো সঠিক ফলাফল বয়ে আনার ক্ষমতা নেই। নীতিবিজ্ঞানের নৈতিক কোনো বৈশিষ্ট দেখা যায়নি। তাহলে সমাজের পুনর্গঠনে কিসের উপর নির্ভর করা যায়?

সমাজ হচ্ছে আমাদের জানামতে বৈচিত্রময় ধ্যান ধারণার জটিল সমাহার। তাই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে অসংখ্য সমাজবিজ্ঞানীদের দার্শনিক উপসংহারে আসার সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই অধ্যাপক Martindale বলেন, সমাজ বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের কোনো সহজ সমাধান নেই। মানব জাতির জন্য উপহার হিসেবে ইউরোপীয় আশার মোড়কেও সমাজবিজ্ঞানকে পেশ করা যাবে না[৮]।

পূর্ববর্তী আলোচনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের দিকে ফেরার পরামর্শ দেয়া যেতে পারে। আমরা ইসলামি সমাজের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা করতে পারি। কেননা একমাত্র ইসলামই মানবজাতিকে এমন একটি সামজিক ব্যবস্থা উপহার দিতে পেরেছে যা বিশুদ্ধ ও যথার্থ, সার্বজনীন ও সর্বকালেন জন্য প্রযোজ্য।

---

[7] Dewcy, op. cit., P 213 Martindale,

[8] Martindale, The Types of Sociological Theory, P. 7-9

www.amarboi.org

দ্বিতীয় ভাগ

একাদশ অধ্যায়

ইসলামের সামাজিক মতবাদ

ক. মানব জাতির ঐক্য

ইসলামে সমাজ হচ্ছে এমন একটি সংগঠন যা আল্লাহ তায়ালার আইন অনুযায়ী সংগঠিত। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এটি না পুঁজিবাদী ব্যবস্থা না সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বরঞ্চ এটি হচ্ছে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার সমৃদ্ধ সংশ্লেষণ। এই ব্যবস্থা মানব জাতির সার্বিক চাহিদা অনুযায়ী গঠিত। এখানে আমরা মানব জাতির ঐক্যে আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদের প্রতিফলন এবং তার আইনের প্রতি মানব জাতির আনুগত্যের তার সার্বভৌমত্ব প্রতিফলিত হতে দেখতে পাই।

ইসলামের যে সামাজিক ব্যবস্থা তা আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বাণীগুলো মহানবি মুহাম্মদ সা.-এর উপর নাযিল হয় এবং এগুলো কুরআনে সংরক্ষিত রয়েছে। এই কুরআনের মর্ম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদ অর্থাৎ তৌহিদের উপর ভিত্তি করে বিশ্ব ঐক্য গড়ে তোলা। যৌক্তিক মতবাদ এটাই হচ্ছে যে, ইসলামি সমাজ কোনো বর্ণবাদী কিংবা জাতীয়তাবাদী সমাজ নয় বরঞ্চ এই সামাজিক ব্যবস্থা মানব জাতির সার্বজনীনতায় বিশ্বাসী। কেননা এই সমাজব্যবস্থার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এক আল্লাহ তায়ালার আইনের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য। তাই এক আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস করার অর্থই হচ্ছে সমগ্র মানব জাতিকে একক ভ্রাতৃত্বের চোখে দেখা।

তাছাড়া, এই সামাজিক ব্যবস্থায় জীবনকে মনে করা হয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সদৃশ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই এখানে দেখা হয় শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হিসাবে। তাই মহানবি সা. বলেন, শরীরের কোনো অঙ্গ যদি আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহলে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সমাজব্যবস্থায় জীবনের ঐক্যের মূল্য অনেক বেশি। তবে আইনের যে নিয়ন্ত্রণ এই জীবনব্যবস্থায় দেখা যায় তা সমাজের ঐক্য ও সামঞ্জস্যের জন্য যথেষ্ট।

এই সামাজিক ব্যবস্থায় সমাজের উপর আইনের অবস্থান এবং আইন সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। অথচ অন্যান্য সমাজে আইনের উপর সমাজের অবস্থান এবং সমাজের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই আইন প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ইসলামি সমাজব্যবস্থায়

www.amarboi.org

পুরোপুরি আল্লাহ তায়ালার আইনের কর্তৃত্ব দেখা যায় আর সকল সদস্যকেই এই আইন বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হয়। মানবিক আইন যেখানে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে পরিবর্তিত হতে থাকে সেখানে আল্লাহ তায়ালার আইন হচ্ছে অপরিবর্তনীয় এবং সমাজকে কখনো সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সুযোগ দেয় না।

কমটের মতে, সমাজ হচ্ছে পরিবার থেকে উৎসারিত একটি ব্যবস্থা। সামাজিক এককের মূল হচ্ছে পরিবার যেখান থেকে উৎসারিত হয় গোষ্ঠীর ও জাতির। পক্ষান্তরে ইসলামি সমাজ কোন আত্মীয়তা কেন্দ্রীক দল কিংবা পরিবার থেকে গড়ে উঠে না বরঞ্চ অপরিবর্তনীয় আল্লাহ তায়ালার আইন থেকেই উৎসারিত যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে জীবনকে ন্যায়পরায়ণতাপূর্ণ করে তোলা এবং সমাজ থেকে মন্দের মূলোৎপাটন করা। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি হচ্ছে একটি সামাজিক একক। কেননা সেই হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিটি সম্পর্ক তার কিংবা তার গুণাবলীর, কর্মকাণ্ড ও মনমানসিকতার উপর নির্ভরশীল। এগুলো আবার তাকে প্রভাবিত করে এবং তার গুণাবলী ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে পরিবর্তন আনে।

এই সকল সম্পর্কের জটিল ভারসাম্য সামাজিক জীবন গড়ে তোলে। ইসলাম সর্বপ্রথম ব্যক্তির প্রতি মনোনিবেশ করে এবং ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে তাকে পূর্ণ সুযোগ দেয়। যাতে সমাজের সার্বিক কল্যাণে ব্যক্তি নিজে অবদান রাখতে পারে। সামান্য যে সীমাবদ্ধতা তার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে সামাজিক স্বার্থের সাথে তার কোনো দ্বন্দ্বও দেখা দিতে পারবে না। তাই ইসলামি সমাজব্যবস্থায় চারিত্রিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনেক বেশি। এটি অর্জিত হয় সমৃদ্ধ ইসলামি শিক্ষা ও দিক নির্দেশনার মাধ্যমে। এই ক্ষেত্রে আদর্শ হচ্ছে মহানবি সা.-এর আচরণ যিনি বিদ্যা অর্জন করাটাকে প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। এই বিদ্যা হচ্ছে অবশ্য আল্লাহ তায়ালা ও সমাজের প্রতি মানুষের দায় দায়িত্ব সম্পর্কিত বিদ্যা। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি তার দায় দায়িত্বের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভের মাধ্যমে। এগুলো চর্চা করতে গেলেই ব্যক্তিকে হতে হয় ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক। প্রথম স্তম্ভ ঈমানের পাশাপাশি অন্যান্য চারটি স্তম্ভ হচ্ছে যথাক্রমে নামাজ, যাকাত, রোজা ও হজ। এই বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির পাশাপাশি মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা এবং ব্যক্তিকে আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করা। এটাই হচ্ছে ইসলামি সমাজের মূল মন্ত্র ও প্রাণ। এই ভাবেই মানুষ অন্যের উপকারে আনন্দ উপভোগ করার যোগ্যতা অর্জন করে এবং নিজের স্বার্থের উর্ধ্বে অন্যান্যদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়।

কমটের মতে সমাজের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গ সংগঠনগুলোর কাঠামো ও কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভারসাম্য বিরাজ করে। যার কারণে কর্মকাণ্ড অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো একটি অভিন্ন লক্ষ্য

www.amarboi.org

অর্জনে কাজ করে যায়। উন্নয়নের এই ভারসাম্যপূর্ণ গতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে মানব জাতিকে নিয়ে সমাজের স্তরে পৌছে দেয়া হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মুলক বিবর্তনের শেষ ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ। কিন্তু সমাজ ও বিবর্তন সম্পর্কিত তার দুটো মতবাদই ভুল ভ্রান্তির শিকার। কেননা সমাজের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য নয় যেহেতু সেগুলো সদা পরিবর্তনশীল। তাছাড়া আমরা গ্রিক সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি যে, সমাজে সব সময় একটি সংঘাতপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করে। তাই জোর দিয়ে বলা যায় অঙ্গ সংগঠন সমূহের ভারসাম্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে সকল সমাজের কথা বাদ দিতে হলেও ইসলামই শুধু এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কমটের মতে সমাজ বলতে বিশ্বের সকল সমাজকে বুঝায় অথবা বার্নডস যেভাবে বলেছেন সেই হিসাবে অন্তত ইউরোপীয় সমাজকে বুঝায়। তাই কম্‌ট সমাজ সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন অন্যান্য সকল সমাজও সেই রকম। কিন্তু বাস্তবে অন্যান্য অনেক সমাজ এই ধরনের নাও হতে পারে। বরঞ্চ তাদেরও সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শ, চাহিদা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তাই বিশ্বব্যাপী সকল সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন অসম্ভব বিষয়। এই ক্ষেত্রে স্পেনসার একটু ভিন্ন মতবাদ পোষণ করে এবং তিনি মনে করেন সমাজ বিভিন্ন একক নিয়ে গঠিত, তবে একক গুলোও একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কেননা, সমাজের আইন সমূহের কোনো একক ধারা নেই, বরঞ্চ এগুলো বিভিন্ন মতাদর্শের আলোকে প্রবর্তিত। পক্ষান্তরে ইসলামি সমাজেই বিরাজ করে আইন কেন্দ্রীক ঐক্য। কেননা এই সামাজিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, যৌন ও অন্যান্য সকল বিষয় আল্লাহ তায়ালার এক আইনের আওতাধীন যা চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তৃণমূল পর্যায়ে সমাজ হচ্ছে ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান ব্যক্তি ও তার চরিত্রের বিবেচনা না করে তার সকল প্রচেষ্টাকে সমাজের উচ্চ পর্যায় থেকে পুনর্গঠিত করার উদ্দেশ্য নিয়োজিত করে। এর অর্থই হচ্ছে ঘোড়া কেনার আগে লাগামের ব্যবস্থা করা।

সমাজবিজ্ঞানের দুই প্রতিষ্ঠাতা কমট ও স্পেন্সারের মতে, সামাজিক প্রগতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কর্মকাণ্ডের ক্রমবর্ধমান বিশেষায়িত জ্ঞান। কম্‌ট আরো এক ধাপ আগে বেড়ে বলেন যে, সামাজিক স্থিতিশীলতা নির্ভর করে কর্মকাণ্ডের বিতরণের উপর তাই তিনি ভারতীয় বর্ণবাদী ব্যবস্থার ব্যাপক প্রশংসা করেন। কিন্তু এই বর্ণবাদী সামাজিক ব্যবস্থা স্পষ্টতই বৈষম্য ও বিদ্বেষপূর্ণ যা সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেখে কর্মকাণ্ড ও চিন্তাধারার স্বাধীনতায় কুঠারাঘাত করে। ইসলাম জাত পাত ও গোষ্ঠী কেন্দ্রীক ধারণাকে প্রত্যাখান করে। এই মতাদর্শ অনুযায়ী মানবিকতা হচ্ছে এক আল্লাহ তায়ালার পরিবার যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার কর্মকাণ্ড ও চিন্তাধারায় স্বাধীন। প্রতিটি মানুষকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তি হিসাবে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। এই ভাবেই ইসলামি সমাজ গঠিত হয় ব্যক্তি বর্গের উপর ভিত্তি করেই।

www.amarboi.org

ইসলামি আদর্শে মানব জাতি হচ্ছে একক পরিবার আদম ও হাওয়ার বংশধর। তাই মানুষে মানুষে কোনো ধরনের জাতিগত ভেদাভেদ থাকতে পারে না। তবে গোষ্ঠী, জাতি ও বর্ণের মাধ্যমে একে অপর থেকে চারিত্রিকভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হতে পারে। কিন্তু এক আল্লাহ তায়ালার সামনে শত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তারা সমান এবং এখানে সম্মানের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা : হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে) বেশি ভয় করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর (পুঙ্খানুপুঙ্খ) খবর রাখেন[১]।

মহানবি সা. ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে মানুষ একে অপর থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। সকল মানব জাতি আদম ও হাওয়া থেকে এসেছে এবং তারা ছিল মাটির তৈরি। একজন আরবের কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং একজন অনারবও কোনো আরব থেকে শ্রেষ্ঠ নয়; একজন শ্বেতাঙ্গ কখনো কৃষ্ণাঙ্গ থেকে উত্তম হতে পারে না, তেমনি কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না একমাত্র ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া। তাহলে দেখা যাচ্ছে ইসলাম ধর্মে মাহাত্বের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা, তাই কুরআনে মুমিনগণকে ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণ ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে অন্যায় ও পাপাচারের ক্ষেত্রে নয়[২]। এখানে দেখা যাচ্ছে ইসলামি সমাজব্যবস্থা পারস্পরিক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত।

খ. সত্য ও ভারসাম্য

ইসলামি সামাজিক ব্যবস্থা সকল অন্যায় ও অবিচার থেকে মুক্ত। মহৎ গুণাবলীর কারণে এখানে ভারসাম্য বজায় রয়েছে যাতে কেউ কোন বাড়াবাড়িতে লিপ্ত না হয়। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার বাণী হচ্ছে : এই ভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থি মানব দলে পরিণত করেছি, যেন তোমরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের উপর সাক্ষী হয়ে থাকতে পার এবং একইভাবে রসুলও তোমাদের উপর সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে (সুরা বাকারা ২ : ১৪৩); তোমরা হচ্ছ পৃথিবীর সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের বের করে আনা হয়েছে তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে দুনিয়ার মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে আর তোমরা নিজেরাও আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনবে (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১১০)।

---

[১] কুরআন ৪৯ : ১৩।

[২] কুরআন ৫ : ২।

www.amarboi.org

ইসলামি সমাজের গুরুত্ব সম্পর্কে বাড়িয়ে বলার কোনো অবকাশ নেই। এই ব্যবস্থায় সকল মন্দের মূলোৎপাটন করা হয়। অথচ ইসলামের আবির্ভাবের আগে অন্যায় ও অবিচার অতিমাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল। মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব ভুলে গিয়ে ন্যায়পরায়নতা ও শান্তির গুরুত্ব কমে গিয়ে ছিল। পুরো বিশ্ব দুর্নীতি ও গোলাযোগে ডুবে গিয়ে ছিল। সর্বত্র অন্যায় ও অত্যাচার ও স্বার্থপরতা বিরাজ করছিল; গ্রিকদের মর্যাদা পতনোন্মুখ হয় এবং রোমানদের আইন ব্যবস্থাও ব্যাপক অবক্ষয়ের শিকার হয়; পারস্যেও সবাই ভোগ বিলাসিতায় মত্ত ছিল, ভারতবর্ষও শ্রেণি ব্যবস্থায় বিদীর্ণ হয়েছিল, চীনা সভ্যতা ছিল ব্যাপক অরাজগতার শিকার এবং আরব বিশ্ব ছিল মূর্তি পুঁজা ও শিরকের কেন্দ্র।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদের ছায়াতলে একটি সার্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয় যাতে করে পথ বিচ্যুত মানব জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়া যায় এবং তারা পুনরায় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। মানব জাতির এই ঐক্য অর্জন করার জন্য অতীতেও বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও দার্শনিক অনেক চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তায়ালার রহমতে আলোকবর্তিকা পৌছাতে নবি রসুলগণও চেষ্টা করে গেছেন এবং তারা সময়ের চাহিদা অনুযায়ী যথাসাধ্য করে গেছেন। তবে তাদের এই প্রচেষ্টা ছিল নির্দিষ্ট জাতি ও সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ যা অপর কোনো জাতির জন্য প্রযোজ্য ছিল না। এমন কি অন্য কোনো যুগের মানুষের কাছেও তা বোধগম্য হত না।

গ. ইসলামের বিশ্বজনীনতা

মহানবি সা. যে বাণী আমাদের দিয়ে গেছেন তা ছিল সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন। তিনি সর্ব যুগের সকল জাতির ঐক্য ও সমৃদ্ধি রসুল হিসাবে স্বরণীয় হয়ে আছেন। শেষ নবি হিসেবে তিনি সহজ সরল ভাষায় তার ধর্ম ও আদর্শ প্রচার করেন। কোন যাজক শ্রেণির সহযোগিতা ছাড়াই তিনি এক আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদ, তার রহমত ও দয়া, মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক ভালোবাসার বাণী প্রচার করে যান।

এটি বলা যায় যে, আসমানী ধারার সকল ধর্ম একইভাবে বাণী প্রচার করে গেছে। তবে এটি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইসলাম ধর্মের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি ইহুদিবাদ থেকে ভিন্ন যেহেতু এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশ্বজনীনতা। পক্ষান্তরে ইহুদিবাদী মতবাদ নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ যারা নিজেদের আল্লাহ তায়ালার নির্বাচিত জাতি মনে করেন। এটি খ্রিষ্টবাদ থেকেও ভিন্ন যেহেতু এই মতবাদ অনুযায়ী যিশু খ্রিষ্ট চেষ্টা করেছিলেন ইসরাইলী জাতি হারানো ভিটাটিকে পুনরুদ্ধার করা। তাছাড়া, খ্রিষ্ট ধর্মের আসমানে আল্লাহ তায়ালার রাজ্য এবং দুনিয়াতে সিজারের রাজত্বের বৈষম্য ইসলাম ধর্ম সমর্থন করে না।

www.amarboi.org

এই প্রসঙ্গে কের বলেন :

> মানব জাতির জন্য রাজনৈতিক, আইনী ব্যবস্থা এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাস প্রবর্তন করার জন্য শুরুতেই ইসলাম আধ্যাত্মিকতা ও বৈষয়িকতার খ্রিষ্টবাদী বৈষম্যকে অস্বীকার করে[৩]।

হিট্টি বলেন :

> মুসা ছিলেন একজন নবি, তেমনি ইব্রাহিম, নূহ, যিশু খ্রিষ্ট ও অন্যান্যরা। তাদের প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট সময় ও স্থান অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বিধান ছিল। কিন্তু মুহাম্মদের বিধান সকল প্রাচীন বিধান গুলোকে ছাড়িয়ে যায়। এটি হচ্ছে চূড়ান্ত। এর পর আর কোন বিধান আসবার নয়[৪]।

ঘ. ইসলামের অর্থ

ইসলামের মূল অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার কাছে নিজেকে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করা।

কুরআনে ইসলাম শব্দের ব্যবহার হয়েছে আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। কুরআনে আরো বলা হয়েছে ইসলামই হচ্ছে সকল নবি ও রসুলের অভিন্ন ধর্ম :

> '(হে নবি) তুমি বলো, আমরা আল্লাহ তায়ালার ওপর ইমান এনেছি, ইমান এনেছি আমাদের ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তার ওপর, ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের অন্যান্য বংশধরদের প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও (আমরা ইমান এনেছি), আমরা আরো ইমান এনেছি, মুসা, ঈসা এবং অন্যান্য নবিদের তাঁদের মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তার ওপরও, (আল্লাহ তায়ালার) এসব নবিদের কারো মাঝেই আমরা কোনো ধরনের তারতম্য করি না, (মূলত) আমরা সবাই- হচ্ছি আল্লাহ তায়ালার কাছে আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান)। যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন বিধান অনুসন্ধান করে তবে তার কাছ থেকে সে (উদ্ভাবিত) ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না, পরকালে সে চরম ব্যর্থ হবে' (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৮৪-৮৫)।

এটি হচ্ছে একটি সার্বিক ও বিশ্বজনীন ধর্ম এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই এখানে বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে পার্থিব জীবন এবং পরকালের জীবন, শরীর ও

---

[৩] কের, ইসলামিক রিফর্ম, পৃ. ৩

[৪] পি. কে হিট্টি, দি নিয়ার ইস্ট ইন হিস্টোরি, পৃ. ১৯৭

www.amarboi.org

আত্মা, সমাজ ও ব্যক্তি, আল্লাহ তায়ালা ও তার সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং বিশ্বের সম্পর্কের মধ্যে চমৎকার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। মহানবি সা.-এর আদর্শে আমরা এর পূর্ণ প্রতিফলন দেখতে পাই। তিনি ছিলেন সকল বিশ্ববাসীর জন্য শান্তির বার্তা বাহক (সুরা আম্বিয়া ২১ : ১০৭)। তিনি হচ্ছেন শেষ নবি (সুরা আহযাব ৩৩ : ৪৮), যিনি মানুষকে শিখিয়েছেন আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদ যা প্রতিফলিত হবে মানব জাতির ঐক্যের। ইসলাম হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা পূর্ববর্তী নবি ও রসুলগণ প্রচার করেছিলেন। তারা আল্লাহ তায়ালার চিরায়ত একাত্মবাদ ও সামঞ্জস্যের আলোকে সবাই মানবতা প্রতিষ্ঠা করতে সংগ্রাম করে গেছে। কিন্তু তারা যাদের পুনঃসংস্কার চাচ্ছিলেন তাদের জন্য এই প্রচেষ্টা নির্দিষ্ট এলাকা কিংবা জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশেষে বিশ্বে একটি সার্বজনীন ধর্ম ও বিশ্ব ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল, আর তখনই মহানবি সা.-এর আবির্ভাব দেখা দিল ইতিহাসের পাতায় মক্কা নগরীতে। এই ভাবেই শেষ নবি মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে পূর্ণতা লাভ করে। ইসলাম ধর্মের নির্যাস হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ভীতি এবং তার পরিকল্পনা ও ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ এবং এখানে মানব জাতির সফলতা নিহিত (সুরা মু'মিনুন ২৩ : ১)।

নবি সা.-এর ভূমিকা

মহানবি সা.-এর মূল দায়িত্ব ছিল মানবতাকে সঠিক পথ দেখানো। এই পথ ছিল সাম্যের এবং তা পার্থিব জীবনে মানুষের শান্তি নিশ্চিত করে এবং আখিরাতে তার মুক্তি। মহানবি সা.-এর সংগ্রাম ও মিশনের গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারব যদি তাঁর বিরোধীদের কর্মকাণ্ডগুলো উপলব্ধি করি। তিনি সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নিজ গোষ্ঠীর লোকজন ও অন্যান্যদের হাতে ব্যাপক অবিচার ও অত্যচারের শিকার হন। নবুয়্যাতের তিন বছরের মাথায় আল্লাহ তায়ালার বাণীর মাধ্যমে তাকে শিরকের অসারতা প্রচার করতে বলা হয়। মূর্তি পূজা কিংবা বহু ঈশ্বরবাদের খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি দিবারাত্রি, জীবন ও মৃত্যু, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের আলোকে আল্লাহ তায়ালার মহিমা প্রচার করেন এবং সব কিছুর উপর তার সার্বভৌমত্ব প্রচার করার জন্য সংগ্রাম করে।

তিনি যখন আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদের প্রচার শুরু করেন, তখন তার গোত্রেরই লোকজন অকথ্য অত্যচার শুরু করে। তারা তাকে সমাজচ্যুত করে এমনকি তাকে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এর ফলে তিনি ইয়াসরীব হিযরত করেন যা পরবর্তীতে মদিনা হিসিবে বিখ্যাত হয়ে উঠে। এই মক্কা থেকে মদীনার হিযরত হচ্ছে মুসলিম যুগের শুরু। এখানে সূচিত হয় ইসলামের নতুন একটি অধ্যায়।

হিজরতের মাধ্যমেই নিজ জন্ম ভূমিতে ১৩ বছর ধরে চলতে থাকা অত্যাচার, মানসিক নির্যাতন ও ব্যাথা বেদনার অবসান ঘটে। হিজরতের পর সূচিত হয় মদীনা

www.amarboi.org

থেকে বিজয় ও সফলতার নতুন গাথা। এখানে তিনি একটি নবজাত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন এবং হিজরতের পর দশ বছরের মধ্যেই এই রাষ্ট্রটি আরব উপদ্বীপের একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়।

তিনি মানব জাতির ঐক্য ও সমৃদ্ধি এবং চারিত্রিক শক্তির জন্য যে, অভিযান গুলো নিজে চালান সেগুলোর সংখ্যা ছিল ২৭। এর বাইরে আরো ৩৮টি অভিযান ছিল যেগুলো তিনি পরিকল্পনার পর অন্যান্যদের নেতৃত্বে বাস্তবায়িত করেন। এর পাশাপাশি তিনি সমাজ থেকে সকল অন্যায়ের মূলোৎপাটন করেন, মূর্তির পূজার উৎখাত করেন, নরীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং মানুষের ব্যক্তিত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, মদ্যপান ও সকল ধরনের অনৈতিকতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সর্বোপরি তিনি বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে বাস্তবায়িত করেন।

ইতিপূর্বে কখনো মানব জাতি ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়নি। মদীনা বিপ্লবের কারণে এই সুযোগ পেলে তারা একক পরিবারে পরিণত হয়। সমাজের সবাই একে অপরের ভাইয়ে পরিণত হয় এবং এই সমাজের সার্বিক কল্যাণই হয়ে পড়ে সবার দায়িত্ব।

বিদায় হজের সময় আরাফাতের ময়দানে তিনি যে উপদেশমূলক ভাষণ দেন তা বিশ্বের সবচাইতে প্রসংশনীয় ভাষণগুলোর একটি। এই ভাষণে আমরা কল্যাণমূলক সমাজ গঠনের কিছু নৈতিকতামূলক নির্দেশনা দেখতে পাই। ভাষণটি ছিল নিম্নরূপঃ

হে মানব জাতি! আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনো, কেননা আমি জানি না তোমাদের মাঝে পরের বছর আর ফিরে আসব কিনা।

মনে রেখ আল্লাহ তায়ালার সামনে দাঁড়াবার আগে তোমাদের জান ও মাল একে অপরের জন্য মহাপবিত্র। আজকের এই দিন এই মাস তোমাদের সবার জন্য পবিত্র এবং মনে রেখ তোমাদের সবাইকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াতে হবে যিনি তোমাদের সকল কর্মকাণ্ডের হিসাব চাইবেন।

হে জনগণ! তোমাদের স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের উপর স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে- নারীদের সাথে দয়ার্ত আচরণ করবে- নিঃসন্দেহে তোমরা তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার নিরাপত্তার প্রতিজ্ঞা করেছো এবং আল্লাহ তায়ালার শব্দের মাধ্যমেই তাদেরকে নিজেদের জন্য বৈধ করেছো।

এবং তোমাদের দাস-দাসীদের কথা মনে রেখ! তোমরা যা খাবে তাদেরকে তাই খাওয়াবে এবং যা তোমরা পরিধান করবে তাই তাদেরকে পরাবে; এবং তারা যদি কোনো অন্যায় করে বসে এবং তোমাদের ক্ষমা করতে ইচ্ছে না করে তাহলে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাও, কেননা তারাও আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং কোনো মতেই তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না।

www.amarboi.org

হে জনগণ! আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং সেগুলো বুঝার চেষ্টা করো। তোমরা সবাই একক ভ্রাতৃত্ব। তোমার ভাইয়ের অধীনে যা কিছু আছে তা তোমার জন্য বৈধ নয়, তবে যদি স্বেচ্ছায় সে যদি তোমাকে কিছু দিতে চায়। অন্যায় থেকে নিজেদের বিরত রাখার চেষ্টা করবে;

আজকে যারা তোমরা উপস্থিত হয়েছো যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে আমার এই বাণী পৌঁছাবে। হয়তোবা যে আমার বাণীগুলো শুনল সে এমন কারো কাছে আমার বাণীটি পৌঁছাল যে তার চেয়েও বেশি এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারে তার চাইতেও উত্তম রূপে মনে রাখতে পারে[৫]।

মাদানী জীবনের ১০ বছর মহানবি সা. ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে অতিবাহিত করেন। তার শাসন আমলে আরবদের চরিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। সত্যি তারা মানব জাতির শ্রেষ্ঠ দলে পরিণত হয় যাদের কাজ ছিল ন্যায়ের আদেশ করা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করা ও আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা[৬]।

নিঃসন্দেহে ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নির্বাচিত পূর্ণাঙ্গ ও পবিত্র ধর্ম : তাই আল্লাহ তায়ালা বলেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর তোমাদের উপর প্রতিশ্রুত নিয়ামতও আমি পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের জন্য জীবন বিধান হিসেবে আমি ইসলামকেই পছন্দ করলাম (সুরা মায়েদা ৫ : ৩)। বিদায় হজ্জের সময় মহানবি সা.-এর উপর এই বাণীটিই নাযিল হয়েছিল।

ইসলামের মতোই এর সামাজিক ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ ও পবিত্র এবং সকল সময় ও জাতির জন্য প্রযোজ্য। সমাজ বৈজ্ঞানিক অন্য কোনো মতবাদ এই ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেনি। কেননা এর উৎস হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আইন ও নৈতিক দিক নির্দেশনায় যা মহানবি সা. শুধু বাস্তবায়িত করে দেখাননি বরঞ্চ নিজেও তার আচার আচরণও জীবনে চর্চা করে আমাদের জীবনে উত্তম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাই বলা যায় ইসলামি সমাজ নিরেট কোনো মতবাদ কিংবা সুদূর প্রসারী জটিল চিন্তাধারা নয় বরঞ্চ মানব জাতির জন্য তা হচ্ছে আদর্শের সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি জীবন্ত আদর্শ। যার উৎস হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আইনের অক্ষর ও অনুপ্রেরণা। আমরা বলতে পারি ইসলামি জীবনব্যবস্থার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে খোদ মহানবি সা.-এর জীবন। এখন আমরা কুরআনের দিকে ফিরে যেতে পারি।

---

[৫] ইবনে হিশাম, সিরাত আল-নাবায়িাহ, ২/৬০৩

[৬] আল-কোরআন ৩:১১০

www.amarboi.org

দ্বাদশ অধ্যায়

কুরআনের বাণী

কুরআন হচ্ছে সেই পবিত্র গ্রন্থ যাতে আল্লাহ তায়ালার বাণী লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং যেগুলো পর্যায়ক্রমে মহানবি সা.-এর উপর নাযিল হয়। এই নাযিলকৃত ঐশী বাণীর আলোকেই ইসলামি সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠে। তাই যথার্থই বলা হয় যখন এই মন্তব্য করা হয় যে কুরআনের ডাকে সাড়া দেওয়ার ফলেই ইসলামি সমাজব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়।

কুরআনের বাণী হচ্ছে ইমান আনো এবং উত্তম আমল করো। এটাই হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে ইসলামের নির্যাস এবং ইসলামি নৈতিকতার মৌলিক বিষয়।

প্রশ্ন হচ্ছে ইমান কী?

ইমান একটি আরবি শব্দ। এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস। আর বিশ্বাস হচ্ছে কোনো প্রস্তাব, বাণী অথবা সত্য গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতি। এর মূল ভিত্তি হতে পারে তথ্য প্রমাণ কিংবা কোনো ধরনের কর্তৃত্ব। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইমান হচ্ছে মহানবি সা.-এর নির্দেশনা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা ও তার বাণীকে সত্য বলে গ্রহণ করা। এবং আল্লাহ তায়ালার বাণীর মধ্যে ইমানের স্বপক্ষে অনেক প্রমাণও রয়েছে। যেহেতু কুরআন হচ্ছে নিঃসন্দেহে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য উৎস সেহেতু এখান থেকে যে জ্ঞান ও প্রমাণ আমরা পাব তার কোনো তুলনা হয় না। কুরআনে বিধৃত সত্যগুলো যাচাই করতে আমাদের কোনো প্রশ্ন, চিন্তাধারা ও যৌক্তির প্রয়োজন পড়ে না। এর সকল বক্তব্যই আমাদের সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে বিশ্বাস করতে হবে। তেমনি মহানবি সা.-এর বাণীকেও বিশ্বাস করতে হবে যিনি কিনা নবুয়্যাতের আগেও আল-আমিন বা বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

ইসলামি পরিভাষা অনুযায়ী ইমান হচ্ছে অন্তর দ্বারা প্রত্যায়ন এবং জিহ্বা দ্বারা শিকার করা এবং এই বিশ্বাস অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালিত করা। বিশ্বাসের প্রতিফলন যদি কর্মকাণ্ডে না ঘটে তাহলে এই ইমান অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

মূলত পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত; ১. এক আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনা এবং রসুল হিসেবে মহানবি সা. কে স্বীকার করে নেওয়া, ২. দৈনন্দিন পাঁচ

www.amarboi.org

ওয়াক্ত নামায, ৩. প্রতি হিজরি বছরের রমজান মাসে রোজা রাখা, ৪. যাকাত প্রদান করা, এবং ৫. জীবনে অন্তত একবার মক্কায় গিয়ে হজ আদায় করা। এটি তাদেরই জন্য বাধ্যতামূলক যারা যাত্রার খরচ ও হজ আদায় করে দেশে ফিরে আসার অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাখে।

উপরোল্লিখিত পাঁচটি বিষয় হচ্ছে ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ যেগুলোতে আমরা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ দেখতে পাই। এই ভিত্তিগুলোর কল্যাণে মানুষের চরিত্র এমন হয়ে উঠে যে, সে এক পর্যায়ে অন্যের মঙ্গল বিধানে আনন্দ পায়। তাই, এখন আমাদের উচিত হবে প্রতিটি স্তম্ভের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য পৃথকভাবে আলোচনা করা।

ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভ ও তাদের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ

তাওহীদ (আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদ) : ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের প্রথমটি হচ্ছে ইমান, আর ইমান হচ্ছে কালিমা আবৃত্তি :

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; মুহাম্মদ সা. হচ্ছে তার রসুল। আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনার অর্থই হচ্ছে নৈতিক বিধানের প্রতি আনুগত্য। একজন মুমিনকে সে যা বিশ্বাস করে তা চর্চাও করতে হয়। শুধুমাত্র ইমান এনে সেই অনুযায়ী আমল না করাটা অর্থহীন। ইমান ও আমলের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা থাকলে চলবে না : ওহে তোমরা যারা ইমান এনেছো! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা চর্চা করো না[১]।

ইমান ও আমল, মহানবি সা. বলেন, এক সাথেই থাকবে এবং একটি ছাড়া অন্যটি গ্রহণযোগ্য নয়[২]।

আমল হচ্ছে কর্মকাণ্ড প্রক্রিয়ার। তাই যা কিছু করা হয় তা ভালো হতে হবে এবং তা যদি ইমান অনুযায়ী হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। ইসলামের যে, নৈতিক বিধান রয়েছে তা ইমান ও আমলের মধ্যে সমন্বয় দাবি করে। এই বিধান অনুযায়ী চিন্তাধারার সাথে কর্মকাণ্ডের মিল থাকতে হবে। যদি প্রতিটি ব্যক্তি কিংবা সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই ধরনের বিধান মেনে চলে তাহলে সেই সমাজ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে একটি আদর্শ সমাজে পরিণত হবে। তাই ইসলাম ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় এবং তাকে সমাজের একজন ভালো সদস্য হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়। পক্ষান্তরে সমাজবিজ্ঞানে ব্যক্তির

---

[১] আল-কুরআন, ৬১ : ২-৩

[২] সুয়তী, আল কামে আল সগীর, খ. ২, পৃ. ১২৪।

www.amarboi.org

কোনো গুরুত্ব নেই বরঞ্চ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শুধুমাত্র সমাজের কথাই বলে যায়। এই কারণে তা নিরেট মতবাদমুখী এবং ফলাফল শুন্য। ইসলাম মূলনীতি অনুযায়ী কাজের উপর জোর দেয় বলে অনেকটাই বাস্তববাদী। যে ব্যক্তি সমাজ গঠন করে, তারই যত্ন নেয় এবং তা যদি হয় তাহলে সমাজ নিজেই নিজের যত্ন নিতে পারবে।

সামাজিক সঙ্গতি অর্জন করার ক্ষেত্রে এক আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান আনাটাও গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বলে বিবেচিত। আমরা যদি মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে ধর্ম ও বিশ্বাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের তারতম্যের কারণে মানব জাতি বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। পূর্ণরূপে ধর্ম বিকশিত হওয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে এখন আমাদের জানতে হয়।

ধর্মকে মনে করা হয় একটি বিশ্বাস সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা। এটি হচ্ছে অতি আদিম প্রবঞ্চ এবং বহু ঈশ্বরবাদী সমাজগুলোতে এখনও আমরা অতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি সদস্যদের অগাধ বিশ্বাস দেখতে পাই। তারা প্রকৃতির বাহ্যিক শক্তিগুলো থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য অতি প্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস করে। তাই নৃবিজ্ঞানীগণ মনে করেন ভীতি হচ্ছে সকল ধর্মের মূল উৎস।

বাংলা ধর্মের ইংরেজি হচ্ছে Religion। এটি হচ্ছে ল্যাটিন শব্দ Religio থেকে। আর অর্থ হচ্ছে দায়িত্বের সচেতন বাস্তবায়ন, উচ্চ ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য, গভীর চিন্তাধারা। বিশ্বাসজনিত ব্যবস্থা হওয়ার কারণে বিশ্বাসী ব্যক্তির আচার আচরণে এটি প্রতিফলিত হয়। একটি বিশেষ শক্তি কিংবা গুণের কাছে বিশ্বাসী মাথা নত করে এবং অতি প্রাকৃতিক এই শক্তিকে বিশ্বাসী ব্যক্তি পবিত্র বলে মনে করে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা অতি প্রাকৃতিক সত্তা সম্বন্ধীয় ধারণার অস্তিত্ব দেখতে পাই। যেমন প্রাচীন গ্রীক ও হিন্দুবাদের বহু ঈশ্বরবাদ, খ্রীষ্টবাদের কীর্তবাদ, প্রাচীন ইহুদি ধর্মের Jious Jaweh বিশ্বাস, ইসলাম ধর্মের এক আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব। ধর্মীয় নৈতিকতাও একটু ভিন্ন প্রকৃতির এবং সেগুলো সাধারণত পার্থিব জীবনকে প্রত্যায়ন করে। যেমন, কনফুসিয়াস বা অন্য কোনো ধারায় আবার পার্থিব জীবনকে অস্বীকার করতে দেখা যায় যেমন বৌদ্ধ ধর্ম। অনেকেই এই বিশ্বের একটি তড়িৎ রূপান্তর চায় আবার অনেকেই মনে করেন এই বিশ্ব হচ্ছে একটি ক্রান্তিকালীন প্রবঞ্চ, আবার অন্যান্যরা মনে করে এটাই হচ্ছে সম্ভাবনার সবচাইতে উত্তম ক্ষেত্র। এই দিকে খ্রিষ্টবাদ বিভিন্ন এলাকায় ও বিভিন্ন যুগে পরস্পর বিরোধী ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করতে থাকে[৩]।

---

[৩] A Dictionary of Social Science, Religion, p. 577

www.amarboi.org

ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে মানব জাতির অদৃশ্য ও উচ্চমানের কোনো কিছুর স্বীকৃতি, যার রয়েছে নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, সেই সত্তার প্রতি তার থাকতে হবে আনুগত্য, ভক্তি ও প্রার্থনা। এই বিশ্বাস থেকে উৎসারিত মানসিক ও নৈতিক আচার আচরণ, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি ও সামজের কাছে আধ্যাত্মিক ও প্রাত্যহিক জীবনে এটাই হচ্ছে গ্রহণযোগ্য অনুভূতি[৪]।

ডুরখেইমের মতে ধর্ম হচ্ছে পুরোপুরি একটি সামাজিক জিনিস এবং ধর্মীয় ধারণা ও আচার আচরণের মাধ্যমেই একটি সামাজিক দলের নির্দিষ্ট প্রতীক চিহ্নিত করা যায়। ধর্মের যে ব্যক্তি কেন্দ্রীক ও মনোজাগতিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তিনি তার সমালোচনা করেন। এই ক্ষেত্রে টেইলার ও স্পেন্সারের জন্তুবাদী মতবাদ এবং মুরাল এর প্রকৃতিবাদী মতবাদের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি মনে করেন তারা যে ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছে সেটি বাস্তব বিশ্বের সাথে অসংগতিপূর্ণ একটি ভ্রান্তি[৫]।

ডুরখেইম আদি সমাজগুলোর totemism প্রথা কিংবা প্রাণিবাদী প্রথা গুলো পর্যালোচনা করে দেখতে পান যে, ধর্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রাণিবাদ। প্রাণিবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে, নির্দিষ্ট কোনো গোত্র তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে বিদ্যমান কোনো বস্তুর প্রতি আচার আচরণের মাধ্যমে ভক্তি চর্চা করে। এই বস্তু সাধারণত কোনো জীবজন্তু কিংবা উদ্ভিদ হয়ে থাকে। টুটেমবাদের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এটাই যে, উপাস্য প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের মধ্যে রহস্য জনক কিংবা পবিত্র কোনো শক্তি রয়েছে। এই ধারণার কারণেই যদি টোটেমের কোনো পবিত্রতা লঙ্ঘন করা হয় তাহলে দৃশ্যমান শাস্তির আশংকা করা হয় এবং এটি হবে এক ধরনের নৈতিক পদস্খলন[৬]।

ডুরখেইমের মতে টুটেমকে অবশ্যই একটি প্রতীক হিসেবে মেনে নিতে হবে। এটি ঈশ্বর সম্পর্কিত টোটেমবাদী মূলনীতির পবিত্রতার প্রতীক। দ্বিতীয়ত, যে গোষ্ঠী টোটেমবাদ চর্চা করে সে গোষ্ঠী ঐ নির্দিষ্ট টোটেম দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে থাকে। তার এই মতবাদ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে, টোটেমবাদী ঐশ্বরিক সত্তা এবং গোষ্ঠী সত্তা একই জিনিস বৈকি।

যেহেতু একটি গোষ্ঠী তার প্রতিনিধিত্ব করে নির্দিষ্ট টোটেমের মাধ্যমে সেহেতু টোটেম হচ্ছে প্রতিটি দলের একটি ঈশ্বর এবং এই কারণেই বিভিন্ন বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরের উপাসনা করার কারণে মানব জাতি বিভিন্ন দলে বিভক্ত

---

[৪] Oxford English Dictionary

[৫] Barnes, An Introduction to the History of Sociology, p. 220

[৬] Barnes, on. cit., p. 221

www.amarboi.org

হয়ে পড়ে। একাত্মবাদী ধর্মগুলোও ঈশ্বরের একাত্মবাদকে প্রচার করে মানব জাতির ঐক্যের মাধ্যমেই। কিন্তু তার পরও তাদের এই প্রচারনা নির্দিষ্ট স্থান ও কালের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ সা. কে যখন আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদের প্রচারক হিসেবে পাঠানো হয় তখন তাকে পাঠানো হয় সমগ্র বিশ্বের ও মানব জাতির জন্য : হে নবি, আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না[৭]। .

মহানবি সা. যে আল্লাহ তায়ালার বাণী প্রচার করেছেন সেগুলো অধিকাংশই তার একাত্মবাদকে ঘিরে ছিল : বলুন, তিনি আল্লাহ, তিনি এক, একক। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তার থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, তিনিও কারো থেকে জন্ম গ্রহণ করেননি, আর তার সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ নেই[৮]। প্রথম দিকে অবতীর্ণমুখী সুরাগুলোতে আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতি এই ভাবেই বিধৃত হয়েছে। তিনি কোনো দার্শনিক মতবাদের চিন্তা ধারণা প্রসূত বস্তু নয়। বরঞ্চ তিনি হচ্ছেন এমন এক মহা বাস্তবতা আমাদের অস্তিত্বের জন্য যার কাছে আমরা ঋণী। তাই অন্য কোনো কিছু কিংবা কাউকে নয় শুধুমাত্র তারই ইবাদত করতে হবে।

মহানবি সা. যে একাত্মবাদের প্রতি ডাক দিয়েছেন তার প্রতি সাড়া দিতে হবে আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে। তিনি সমগ্র মানব জাতিকে বিশেষ করে আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা একাত্মবাদী ছিলেন কিন্তু ইসলামের বিরোধিতা করতেন তাদেরকেও বিশেষভাবে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। কুরআনের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব যে, আমাদের আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ মেনে চলতে বলা হয়েছে এবং সমগ্র মানব জাতিকে বিশেষ করে আহলে কিতাবগণকে সত্যের দিকে আহ্বান করতে বলা হয়েছে :

বলুন, হে কিতাবধারীরা, এসো এমন এক কথায় যা আমাদের কাছে এক, আমরা উভয়েই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবো না এবং তার সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবো না, সর্বপরি এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আমরা আমাদের মাঝেও একে অপরকে প্রভু বলে মেনে নিব না, অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা আল্লাহ তায়ালার সামনে আনুগত্যের মাথা নত করে দিয়েছি[৯]।

ইসলাম ধর্মের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদকে প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মধ্যে যাতে কোনো ধরনের বিভেদ দেখা না দেয়। এর মাধ্যমে মূলত

[৭] আল-কুরআন, ৩৪ : ২৮
[৮] আল-কুরআন, ১১২ : ১- ৪
[৯] আল-কুরআন, ৩ : ৬৪

www.amarboi.org

মুহাম্মদ সা.-এর পূর্বেও যে সকল নবি ও রসুল এসেছিলেন তাদের কর্মকাণ্ডকে প্রত্যায়িত হয়। এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনে মহানবি সা. কে বলা হয়েছে : হে মানুষ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য যে দ্বীনই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন, যা আমি তোমার কাছে ওহি করে পাঠিয়েছি, যার আদেশ আমি ইব্রাহিম, মুসা ও ইসাকে দিয়েছিলাম এদেরকে সবাইকে আমি বলেছিলাম, তোমরা এর জীবন বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠিত করো এবং কখনো এতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না[১০]।

যে নবির কাছেই আল্লাহ তায়ালার ধর্ম নাযিল হোক না কেন সকল ধর্মের নির্যাস এক। হতে পারে তা নূহ, ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসা আ.-এর ধর্ম। এই সকল ধর্মই পূর্ণতা লাভ করেছে মহানবি সা.-এর দ্বীন প্রচারের মাধ্যমে যেহেতু তিনি ছিলেন শেষ নবি (সুরা আহযাব ৩৩ : ৪০)। এখানেই আমরা আহলে কিতাবদের উপর ইসলামের শ্রেষ্টত্ব খুঁজে পাই। যার মধ্যে দ্বিমত পোষণ করার কোনো অবকাশ থাকে না। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

> নিঃসন্দেহে মানুষের জীবন বিধান হিসাবে আল্লাহ তায়ালার কাছে ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১৯)।
>
> যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন বিধান অনুসন্ধান করে তবে তার কাছ থেকে সে উদ্ভাবিত ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না, পরকালে সে চরম ব্যর্থ হবে (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৮৫)।

উপরিল্লিখিত আয়াত সমূহে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানব জাতির ঐক্য ও তাদের বিভক্তির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করা হয়েছে। মানব জাতির এই ঐক্য সাধন সম্ভব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

১. বিশ্বাসের উপকারিতা

আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদের উপর যদি বিশ্বাস আনা হয় তাহলে তার গুণাবলীও আমাদের মেনে নিতে হবে। ফলে আমরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হব। আল্লাহ তায়ালা দয়ার আধার। তবে তিনি হিসেবেও খুব সুক্ষ্ম ও দ্রুত। তিনি শুধু শক্তিশালী নন বরঞ্চ তিনি সব কিছুর নিয়ন্ত্রতা। তার ক্ষমতার বাইরে কোন কিছুই নেই এবং সব কিছুই তার জ্ঞান ভুক্ত। তিনি জানেন যা কিছু জমিনের ভিতরে প্রবেশ করে, আবার যা কিছু তা থেকে উৎগত হয় এবং যা কিছু আসমান থেকে বর্ষিত হয় এবং যা কিছু তাতে উৎক্ষিত হয়; তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমতাশীল (সুরা সাবা ৩৪ : ২); হে বৎস, যদি তোমার কোনো আমল সরিষার দানার পরিমাণ ছোটও হয় এবং তার

---

[১০] আল-কুরআন, ৪২ : ১৩

www.amarboi.org

যদি কোনো শিলাখণ্ডের ভিতর কিংবা আসমান সমূহের ভিতরও লুকিয়ে থাকে, অথবা যদি তা থাকে জমিনের ভিতরে, তাও আল্লাহ তায়ালা সে দিন সামনে এনে হাজির করবেন; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই সূক্ষ্মদর্শী এবং সকল বিষয়ে সম্যক অবগত (সুরা লোকমান ৩১ : ১৬); নিঃসন্দেহে আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি, তার মনে যে খারাপ ধারণার উদয় হয় সে সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত আছি। কারণ আমি তার ঘাড়ের রগ থেকে অনেক কাছে অবস্থান করি। (সুরা ক্বাফ ৫০ : ১৬); এবং আরো বলা হয়েছে তুমি কি কখনো এটা অনুধাবন করো না যে, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা সব কিছুই জানেন; কখনো এমন হয় না যে, তিন ব্যক্তির মধ্যে কোনো গোপন শলাপরামর্শ হয় এবং সেটা সেখানে চতুর্থ হিসাবে আল্লাহ তায়ালা উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ জনের মধ্যে কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যে ষষ্ঠ হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। এই শলাপরামর্শকারীদের সংখ্যা তার চাইতে কম হোক কিংবা বেশি তারা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তায়ালা সব সময়ই তাদের সাথে আছেন (সুরা মুজাদালা ৫৮ : ৭); আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তায়ালার জন্য, তোমাদের মনের ভিতর যা কিছু আছে তা যদি তোমরা প্রকাশ করো কিংবা তা গোপন কর, আল্লাহ তায়ালা একদিন তোমাদের কাছ থেকে পুরোপুরি হিসাব গ্রহণ করবেন (সুরা বাকারা ২ : ৩৮৪)।

একজন মুমিনের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভীতি সঞ্চার করার জন্য উপরিল্লিখিত আয়াতগুলো যথেষ্ট। সঠিকভাবে উপলব্ধি করলে একজন মুমিন কখনো খারাপ চিন্তা করতে পারে না, তা চর্চা করারতো প্রশ্নই আসে না। তার কর্মকাণ্ডের হিসাব যে আল্লাহ তায়ালা নিবেন এই বাস্তবতাই একজন মুমিনকে পাপাচার থেকে বিরত রাখে। এই কারণেই সে মিথ্যা বলতে পারে না, সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর হতে পারে না এবং কারো সাথে প্রতারণাও করতে পারে না। একজন মুমিন যখন বিশ্বাস করেন যে স্বার্থপরতার কারণেই তার অপর মুমিন ভাই আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে পারে তখন এই বিশ্বাস তাকে স্বার্থপর হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখে।

এই ধরনের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনই হচ্ছে হিসাবের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যার সফল বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পেয়েছি মহানবি সা.-এর যুগে এবং যা কুরআনে বিধৃত হয়েছে :

> (এ সম্পদে তাদেরও অংশ রয়েছে) যারা মোহাজেরদের আগমনের আগ থেকেই এ (জনপদ) কে (নিজেদের) নিবাস বানিয়ে ছিলো এবং যারা (এদের আসার) আগেই ইমান এনেছিলো, তারা ওদের অত্যন্ত ভালোবাসে যারা হিজরত করেছে, (রসুলের পক্ষ থেকে) তাদের

www.amarboi.org

(মোহাজের সাথীদের) যা কিছু দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তারা নিজেদের অন্তরে তার কোনো রকমের প্রয়োজন অনুভব করে না, (শুধু তাই নয়), তারা তাদের (মোহাজের সাথীদের) প্রয়োজনকে সর্বদাই নিজেদের (প্রয়োজনের) ওপর অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদের নিজেদেরও (অনেক) অভাবগ্রস্ততা রয়েছে, (আসলে) যাদের মনের কার্পণ্য (ও সংকীর্ণতা) থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তারাই হচ্ছে সফলকাম (সুরা হাশর ৫৯ : ৯)।

উপরিল্লিখিত আয়াতে আমরা কিভাবে আনসারগণ তাদের কাছে আগত মোহাজেরকে সাহায্য করলেন তার বর্ণনা পাওয়া যায়। আনসার হচ্ছেন মদীনাবাসীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং এক আল্লায় বিশ্বাস করেছেন তারা। মক্কা থেকে আগত মোহাজিরদের প্রতি তাদের সহানুভূতি এতই প্রবল ছিলো যে, তারা শুধু তাদেরকে আশ্রয় দেননি বরঞ্চ ত্যাগের আরো অনেক মহিমা তারা দেখিয়েছেন। যার কারণে মোহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনের সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, মোহাজিরগণ দারিদ্র সত্ত্বেও ধন সম্পদের ক্ষেত্রে আনসারদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পেতেন।

এই ঘটনাবলী থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, মানব জাতির ঐক্যের সৃষ্টি হয় আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদের বিশ্বাস থেকে। তখন মানুষের স্বার্থপর চরিত্র উচ্চাঙ্গের বদান্যতায় পরিণত হয়ে যায় এবং এই উদারতা তার একটি স্বভাবজাত চরিত্রে পরিণত হয়। ইসলাম ধর্ম মূলত তার অনুসারীদেরকে আত্মত্যাগের শিক্ষা দেয় এবং ইসলাম ধর্মই রিয়ারডনের মতে মানবতাকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়[১১]।

আমরা আমাদের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে এক আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাসের কারণে মানুষের মধ্যে অনেক গুণাবলী সঞ্চারিত হয় এবং সেখান থেকেই আত্ম ত্যাগের সৃষ্টি হয়।

তখন মানুষ শুধু নিজের জন্য বাঁচে না বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি হিসেবে সকল ভাইদের জন্যই বাঁচার চেষ্টা করে। একজন মুমিন কখনো লোভী ও অত্যাচারী হতে পারে না কেননা এটি এক আল্লাহ তায়ালার দয়া ও ন্যায়পরানতার মতো গুণাবলীর বিপরীত। এক আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাসী মানবতার জন্য বিশ্বকে একটি সুখী সমৃদ্ধ জায়গায় পরিণত করতে পারে।

ইমানের যে প্রতিদান ও সুবিধা আমরা উপভোগ করতে পারি তা উল্লেখ করা অসম্ভব। তবে আমাদের জন্য এখানে আল্লাহ তায়ালার ইমান থেকে যে ভ্রাতৃত্বের

---

[১১] Reardon, Religous Thought in the Nineteenth Century. p. 298

www.amarboi.org

সৃষ্টি হয় সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের শিক্ষাগুলো ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের সামাজিক বিবেকের সৃষ্টি করে যার কারণে সমাজের প্রয়োজনের প্রতি তার মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়। এই জন্যই সে কখনো স্বার্থপর প্রাণীতে পরিণত হতে পারে না। তাকে অবশ্যই নিজের সুখ সমৃদ্ধির জন্য সম্পদ অর্জনের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে তবে এই ক্ষেত্রে তাকে এমন সকল দিক নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের অন্যান্যদেরকেও সাহায্য করা। ইসলামি শিক্ষা মানব জাতির মনকে এমনভাবে গড়ে তোলে যে, তার মধ্যে লোভ লালসা ততটা বিরাজ করতে পারে না, যার কারণে কোনো ধরনের শক্তি ও সন্ত্রাসের প্রয়োগ ছাড়াই ইসলামি ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা অর্জন করা যায় :

> মূলত যাদের মন কাপর্ণ্য ও সংকীর্ণতা থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তারাই হয়েছে সফলকাম (সুরা হাশর ৫৯ : ৯)।

বেন্থাম এর আদর্শ অনুযায়ী যদি কেউ কল্যাণকে শুধুমাত্র দৈবিক ও বাহ্যিক পরিণতির জন্য ভালোবাসে তাহলে নৈতিক চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সে হারাবে। অবশ্যই তাকে নিজের কল্যাণেও কিছু করতে হবে। তাই ইসলাম কখনো মানুষের স্বার্থের বাইরে এমন কোনো কিছুর উপর জোর দেয় না। ইসলামের মূল কথা হচ্ছে যে কোনো মঙ্গল সাধণের আগেও তাকে তার উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে। মঙ্গল চর্চা কখনো বেন্থামের মতবাদ অনুযায়ী বাহিক্য ও উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। এখানেই আমরা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব খুঁজে পাই। আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদে বিশ্বাস ও তার সুবিধাগুলো বিস্তারিত আলোচনা করার পর এখন আমরা ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

নামাজ

ইসলামি ব্যবস্থার ব্যবহারিক ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মূল পাঁচটি স্তম্ভের একটি হচ্ছে নামাজ যার অবস্থান হচ্ছে ইমানের পর পর। প্রতিটি মুসলমানকে দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হয়। প্রত্যুষে তাকে ফজর, দ্বি-প্রহরে যোহর, বিকালের সময় আসর, সন্ধ্যায় মাগরিব এবং রাতে তাকে এশার নামাজ পড়তে হয়। প্রায় একশরও বেশি বার কুরআনে সালাত (নামাজের) উল্লেখ রয়েছে। আবার কখনো কখনো জিকির ও অথবা দোয়া শব্দের মাধ্যমেও বুঝানো হয়েছে। এবং তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো কেননা এটি তোমাদেরকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে[১২]। এই হচ্ছে নামাজ সম্পর্কিত কুরআনের বাণী। এই আয়াতে আমরা মানুষের আত্মশুদ্ধিতে নামাজের ভূমিকা সম্বন্ধেও ধারণা পেতে পারি। এখানে বলা হয়েছে নামাজ মানুষকে

---

[১২] আল-কুরআন, ২৯ : ৪৫

www.amarboi.org

ঐ সকল কাজ থেকে বিরত রাখে যা তাকে জীবনের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে।

যেহেতু নামাজ দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত পড়া বাধ্যতামূলক সেহেতু এই নামাজ চর্চার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত উপলব্ধি প্রবল হতে থাকে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তখন মুমিন নামাজির মনে আল্লাহ তায়ালার সচেতনতা বিরাজ করে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নামাজের জন্য নির্ধারিত সময়ও বেধে দেওয়া হয়েছে। উত্তম পন্থা হচ্ছে নামাজ একযোগে জামাতে আদায় করা। যেখানে বর্ণ ও সামাজিক অবস্থান ভেদে কোনো ধরনের বৈষম্য প্রদর্শিত হতে পারে না। তাই যদি হয়ে থাকে নামাজ মানব জাতিকে মনে করাতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার চোখে সবাই সমান এবং দ্বীন ইসলাম একটি শ্রেণিহীন সমাজে বিশ্বাসী।

রোজা

প্রতিটি চন্দ্র বর্ষের রমজান মাসে মুমিনগণকে রোজা রাখতে হয়। হে মানুষ, তোমরা যারা ইমান এনেছে, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করে দেওয়া হয়েছে, যেমনি করে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো (সুরা বাকারা ২ : ১৮৩)। এখানে যে, তাকওয়া শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে সেটির অর্থ হচ্ছে আত্ম সংযম।

তাকওয়া শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা মানুষের গুণাবলী ও তার কর্মকাণ্ডের মান নির্ধারণের জন্য ইসলাম ধর্মে এটি হচ্ছে সর্বোত্তম মাপকাঠি। তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে আল্লাহ তায়ালাকে বেশি ভয় করে (সুরা হুজুরাত ৪৯ : ১৩)।

আলোচনা শুরু করার আগে আমরা খলিফা উমরের একটি জ্ঞান চর্চামূলক ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি। একদিন তিনি প্রখ্যাত সাহাবী উবাই ইবনে কাবকে জিজ্ঞেস করেন তাকওয়ার অর্থ কী? হযরত উবাই কুরআন সম্পর্কিত জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। উত্তরে তিনি হযরত উমরকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি যদি কখনো কাটা ভরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যান তাহলে কিভাবে নিজেকে রক্ষা করেন? জবাবে হযরত ওমর বললেন, তিনি শক্ত করে তার চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখেন। হযরত উবাই বললেন, তাকওয়া হচ্ছে ঠিক এমনই একটি কাজ।

তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ক্ষতিকর কোনো কিছু থেকে নিজেকে বিরত রাখা। কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় তাকওয়ার মাধ্যমে ধার্মিকতা বুঝানো হয়। বিভিন্ন অর্থে তাকওয়া শব্দের ব্যবহার করা হয়। যেমন, তোমরা সঠিক দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করো এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো অথবা ইত্তাকু (সুরা বাকারা ২ : ১৮৯);

www.amarboi.org

এখানে আল্লাহ তায়ালা ভীতি অর্থে তাকওয়া শব্দের ব্যবহার হয়েছে। অন্য এক আয়াতে তাকওয়া শব্দের ব্যবহার হয়েছে ন্যায়পরায়ণতার অর্থে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পছন্দ করেন যারা ন্যায়পরায়ণ অথবা মুত্তাকি (সুরা নূর ২৪ : ২৫)। অন্য এক আয়াতে নিজেকে মন্দ কিছু থেকে রক্ষা করার অর্থে তাকওয়ার ব্যবহার হয়েছে। তারা যদি ইমান আনতো এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করত তাহলে তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা উত্তম প্রতিদান দিতেন, যদি তারা তা জানত (সুরা বাকারা ২ : ১০৩)। সঠিক আচরণের অর্থে ব্যবহার হয়েছে : এবং তোমরা তোমাদের যাত্রার জন্য পাথেয় অবলম্বন করো আর সবচাইতে উত্তম পাথেয় হচ্ছে উত্তম ব্যবহার অথবা তাকওয়া (সুরা বাকারা ২ : ১৯৭)। অন্য আয়াতে ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার অর্থে ব্যবহার হয়েছে : শপথ মানব প্রকৃতির এবং যিনি তার যথাযথ বিন্যাস করেছেন, তার, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তার পাপ পথে গমন ও পাপ থেকে বেঁচে থাকার জ্ঞান প্রদান করেছেন (সুরা শামস ৯১ : ৭-৮)।

অন্য এক আয়াতে তাকওয়া শব্দটির বাড়াবাড়ির বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে : তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে একে অপরের সহযোগিতা করো না (সুরা মায়েদা ৫ : ২)। মহানবি সা. তাকওয়া শব্দের প্রয়োগ করেছেন নিজেকে সন্দেহভাজন বিষয়বস্তু থেকে রক্ষা করার অর্থে। তিনি এক হাদিসে বলেন, হালাল ও হারাম স্পষ্ট, তবে এই দুইয়ের মাঝে সন্দেহজনক কিছু থাকতে পারে যা অনেকেই হয়তো জানে না। যে ব্যক্তি এই সকল জিনিস থেকে নিজেকে বিরত রাখল সে তার ইমান ও নিজেকে হারাম থেকে রক্ষা করল (বুখারি)। অন্য একটি হাদিসে তাকওয়া শব্দের প্রয়োগ করেছেন ন্যায়পরায়ণতার অর্থে। একজন মুমিন কখনো ন্যায়পরায়ণ ও মুত্তাকি হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত গর্হিত জিনিস পরিত্যাগ করে ন্যায়ের কোনো কিছুর জন্য (তিরমিযি)। তিনি আরো বলেন, যা কিছু সন্দেহ জনক হয় তা পরিত্যাগ কর (মুসনাদে আহমদ)।

তবে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, সবাইকে আল্লাহ তায়ালার আইন অনুযায়ী চলার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। হযরত আহমদ ইবনে হাম্বাল (মৃত্যু ৮৫৫ খ্রি.) এই প্রসঙ্গে বলেন, সন্দেহজনক কোনো কিছু পরিত্যাগ করাটাও মুমিনের দায়িত্ব। যেহেতু তরমুজ খাওয়ার ব্যাপারে তার কাছে কোনো সঠিক হাদিস ছিল না। এ ভাবেই একজন মুমিন তাকওয়া অবলম্বন করে চরম পরিশুদ্ধ জীবনযাপন করে। তার পক্ষে খারাপ কাজ দূরে থাক কোনো মন্দ চিন্তা ভাবনা করাও মানায় না।

মহানবি সা. বলেন, অন্তর হচ্ছে তাকওয়ার যথাযোগ্য স্থান। এর গুরুত্ব আমরা বুঝতে পারি যখন হযরত আবুজরকে তিনি গোপনে ও প্রকাশ্যে তাকওয়া অবলম্বন

www.amarboi.org

করতে বলেন। যেহেতু তাকওয়ার মূল স্থান হিসাবে অন্তরকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেহেতু আল্লাহ তায়ালা ভীতির মূল উৎস হচ্ছে মানুষের অন্তর। বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস থেকে এটাই বুঝা যায়।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলা হয় : এবং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর (ইত্তাকু) এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই জানেন (সুরা বাকারা ২ : ২৩১); এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো (ইত্তাকু) এবং জেনে রেখ তোমরা তার সম্মুখীন হবে (সুরা বাকারা ২ : ২২৩); এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর (ইত্তাকু) যাতে তোমরা সফলকাম হও (সুরা আলে ইমরান ৩ : ২০০)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সমৃদ্ধি ও সফলতার মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা। বাস্তবে আল্লাহ তায়ালা ভীতি মানুষের জ্ঞানকে ও প্রজ্ঞাকে জাগ্রত করে। তাই প্রাচীন প্রবাদে বলা হয়ে থাকে, আল্লাহ ভীতি হচ্ছে প্রজ্ঞার প্রথম ধাপ। প্রজ্ঞা হচ্ছে জ্ঞানী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য অথবা গুণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি সেই যে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবচাইতে কার্যকর মাধ্যম অবলম্বন করতে পারেন যা তার সফলতা ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে।

আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ভীতি অনেক প্রকারের; একটি হচ্ছে শিশু সুলভ ভীতি, আরেকটি হচ্ছে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির ভীতি যিনি নিজের ও অন্যান্যদের ক্ষতি এড়িয়ে চলতে চান। তৃতীয় আরেক ধরনের ভীতি হচ্ছে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থেকে উৎসারিত এবং এটি সাধারণত আল্লাহ তায়ালার জন্যই হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসে সে এমন কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে চায় না যা আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। তাই আমরা বলতে পারি আল্লাহ তায়ালার ভীতির মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা এবং এটাই হচ্ছে নৈতিকতার সর্বোচ্চ মানদণ্ড যা খোদ মানবাত্মা থেকে উৎসারিত এবং এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই আল্লাহ তায়ালার বিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যে। এই আনুগত্যের মধ্যেই মানব জাতির চূড়ান্ত কল্যাণ নিহীত।

রোজা তাকওয়া অথবা আত্মসংযমেরই শিক্ষা দেয়। এটি হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা এবং মহানবি সা.-এর বাণী অনুযায়ী এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন। এটি হচ্ছে মানব জাতির বাস্তব সুখ সমৃদ্ধি অর্জনের পথ। রোজার মাধ্যমেই গর্হিত সব কিছু পরিত্যাগ করার মানসিকতা তৈরি হয়। মহানবি সা. বলেন, রোজা হচ্ছে সকল গোনাহর বিরুদ্ধে ধারণকৃত বর্ম। একজন ব্যক্তি রোজার মাধ্যমেই তার আবেগ সংযম করে সবচাইতে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। রোজার যে আধ্যাত্মিক মূল্য আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করেছেন তা হচ্ছে তার সন্তুষ্টি। বিশুদ্ধ হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে : রোজা

www.amarboi.org

শুধুমাত্র আমার। এর মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি অনুভব করে এবং তাকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। নিঃসন্দেহে মানুষের এই ধরনের অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কারণ। মানুষ এই অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা তখনই অর্জন করতে পারে যখন রোজার মাধ্যমে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব করে। এতে করে দারিদ্রের কষাঘাত নিজেও কিছুটা অনুভব করে তাদের জন্য সহানুভূতিশীল হয়।

বিভিন্ন হাদিসে মহানবি সা. রোজার নির্দেশ দিয়েছেন নিম্নরূপে –

মানুষ ভালো যা কিছু করে তার জন্য ১০ থেকে ৭০০ গুণ বেশি ছওয়াব পাবে, কিন্তু রোজার ছওয়াবের কোনো হিসাব নেই। কেননা তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং আল্লাহ তায়ালা নিজেই তার প্রতিদান দিবেন। যে ব্যক্তি রোজা রাখে সে আল্লাহ তায়ালা তরে তার রিপুকে দমন করে।

রোজার মধ্যে দুইটি আনন্দ রয়েছে। একটি আনন্দ তখনই পায় যখন রোজাদার ইফতার করে, আরেকটি আনন্দ তখন পাবে যখন আখিরাতে রোজাদার আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ করবে। নিঃসন্দেহে রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তায়ালার কাছে মিশ্‌ক আতরের গন্ধের চাইতেও উত্তম।

রোজা হচ্ছে একটি বর্ম[১৩]।

এই সকল আধ্যাত্মিক প্রতিদান পর্যালোচনা করার পর এর বৈষয়িক উপকারগুলো ভুলে গেলে চলবে না। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রোজার ভূমিকা অসীম। এটি মানুষের মধ্যে প্রাণ চঞ্চলতার সৃষ্টি করে এবং জীবনের যে কোনো দুঃসময় মোকাবেলার জন্য রোজাদারের মধ্যে দৃঢ়তার সৃষ্টি করে।

যাকাত

যাকাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে শুদ্ধিকরণ। এর পারিপার্শ্বিক অর্থ হচ্ছে দান হিসাবে সম্পদের কিয়দংশ বিলি করা। এতে করে অবশিষ্ট সম্পদ পাক পবিত্র থাকে। এটি ইসলামের মূল স্তম্ভগুলোর একটি এবং কুরআনের স্পষ্ট বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত (সুরা বাকারা ২ : ৭৭)। দ্বীন ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি ব্যবহারিক স্তম্ভ হচ্ছে এটি।

যাকাত প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরজ যে স্বাধীন, পরিণত মনস্ক ও প্রাপ্ত বয়স্ক। তবে নির্দিষ্ট পরিমাণের সম্পদের মালিক হওয়া ও শর্ত যা নিছাব নামে

---

[১৩] মিশকাত, অধ্যায়-৭, অনুচ্ছেদ- ১।

www.amarboi.org

পরিচিত। এই সম্পদের মালিকানা পূর্ণ এক বছর হতে হবে। তুমি তাদের ধন সম্পদ থেকে ছদকা গ্রহণ করো, এটা তাদের পাক ছাফ করে দেবে, তা দিয়ে তুমি তাদের পরিশোধিত করে দেবে তুমি তাদের জন্য দোয়া করবে[১৪]। কুরআনের এই শব্দাবলীতে আমরা দরিদ্রদের অধিকার হিসেবে যাকাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। ইসলামের অন্যান্য স্তম্ভগুলো যেখানে আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য নিয়োজিত, সেখানে যাকাতের ভূমিকা হচ্ছে সম্পদের কিংবা মুমিনের রুটি রোজগারের পরিশুদ্ধি। এটা ইসলামি ব্যবস্থার এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর বলেন : আল্লাহ তায়ালার কসম আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাব যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। যেহেতু যাকাত শব্দের অর্থই হচ্ছে শুদ্ধিকরণ সেহেতু এটি প্রতিটি মুমিনের জন্য একটি দ্বীনি দায়িত্ব। এটি বাধ্যতামূলক এবং সরকার নিম্নোক্ত কুরআনের বিধান অনুযায়ী তা বিতরণ করবে :

(এসব) সাদাকা (যাকাত) হচ্ছে ফকির মিসকিনদের জন্য, এর (ব্যবস্থাপনার) ওপর নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্যে যাদের অন্তকরণ (দ্বীনের প্রতি) অনুরাগী (করা প্রয়োজন) তাদের জন্য, (এটা কোনো ব্যক্তিকে) গোলামীর (বন্ধন) থেকে আযাদ করার মধ্যে, ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিদের (ঋণমুক্তির) মধ্যে, আল্লাহ তায়ালার পথে (সংগ্রামী) ও মোসাফেরদের জন্য (এ সাদাকার অর্থ ব্যয় করা যাবে); এটা আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত ফরয; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) জানেন এবং তিনিই হচ্ছে বিজ্ঞ, কুশলী[১৫]।

যাকাত এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এটিকে ইসলামের মূল পাঁচটি ভিত্তির একটি হিসেবে দেখলেই হবে না, বরঞ্চ এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবও আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে। মহানবি সা. মুয়াজ ইবনে জাবালকে ইয়েমেনের প্রশাসক হিসেবে প্রেরণ করার আগে যে দিক নির্দেশনা দেন তা থেকে এটাই প্রতিভাত হয় যে, যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র দূরীকরণ। মহানবি সা. তাকে বলেন, তুমি জনগণের মধ্যে ঘোষণা দিবে যে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর যাকাত বাধ্যতামূলক করেছেন এবং তা ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে দরিদ্রের মাঝে বিতরণ করা হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যাকাত এর পরিবর্তে ছদাকা শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। এর বাইরেও অনেক স্বেচ্ছামূলক দান রয়েছে যেমন আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য দরিদ্রদেরকে আর্থিক সহায়তা করা। বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ শাহ ওলিউল্লাহর মতে যাকাত দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ফরজ হয়েছে : একটি হচ্ছে

---

[১৪] আল-কুরআন, ৯ : ১০৩

[১৫] আল-কুরআন, ৯:৬০

www.amarboi.org

আত্ম শৃঙ্খলা এবং অন্যটি হচ্ছে সমাজ থেকে অভাব দূর করা। সামাজিক দুর্দশা দূর করার জন্য এটি সবচাইতে কার্যকর বীমা পদ্ধতি। কেননা সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে সামাজিক কাঠামো কখনো সুষ্ঠু ও মজবুত হতে পারে না।

লক্ষ্য রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র যাকাত দিয়েই একজন মুসলমান তার সামাজিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয় না। তার সহায় সম্পদের উপর আরো দাবি থাকতে পারে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী এবং রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে। ইসলাম শুধুমাত্র সামাজিক বিবেককে জাগ্রত করে না বরঞ্চ রাষ্ট্রকে ধনীদের উপর প্রয়োজনে কর ধার্য্য করার ক্ষমতাও দিয়েছে যদি কখনো রাজস্বে ঘাটতি দেখা দেয়। এতে করে সমাজের সবার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ হবে।

বিখ্যাত ফিকাহ্ গ্রন্থ হিদায়ার রচিয়তা মার্গিনানির মতে যদি আয়ের উৎস যথেষ্ট না হয় তাহলে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান জনগণের উপর কর ধার্য করতে পারে[১৬]। ইমাম আবু ইউসুফ জনগণের সাধ্য অনুযায়ী কর বৃদ্ধি ও হ্রাসের ক্ষমতাকে সমর্থন করেন। তবে এই ক্ষেত্রে জনগণের করের বুঝা বইবার সক্ষমতাকেও বিচার করতে হবে[১৭]।

হজ

হজ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো দিকে যাওয়ার জন্য বের হওয়া। ইসলামি পরিভাষায় এটি হচ্ছে জিলহজ্জ মাসে মক্কায় হজ্ব পালন করা। এটি ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ এবং কুরআনের বিধান অনুযায়ী সামর্থবান সবার উপর জীবনে একবারের জন্য ফরজ :

কুরআনে হজ সম্বন্ধে বলা হয় : হজের মাসসমূহ (একান্ত) সুপরিচিতি, সে সময় গুলোর মধ্যে যে ব্যক্তি হজ (আদায়) করার মনস্থ করবে (সে যেন জেনে রাখে), হজের ভেতর (কোনো) যৌনসম্ভোগ নেই, নেই কোনো অশ্লীল গালিগালাজ ও ঝগড়াঝাটি, আর যতো ভালো কাজ তোমরা আদায় করো আল্লাহ তায়ালা (অবশ্যই) তা জানেন; হজের নিয়ত করলে) এর জন্য তোমরা পাথেয় যোগাড় করে নেবে, যদিও তাকওয়াটাই হচ্ছে (মানুষের) সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয়, অতএব হে বুদ্ধিমান মানুষেরা, তোমরা আমাকেই ভয় করো[১৮]।

এখানে লক্ষ্য রাখার বিষয় হচ্ছে যে, তাকওয়া শব্দটি এখানে পুনরায় এসেছে এবং মুফাস্সিরগণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভালো আচরণ ও ন্যায়পরায়ণতা হিসেবে। প্রতি বছর হজে বিশাল সংখ্যায় মুসলমানগণ একত্রিত হন এবং নিঃসন্দেহে এই

---

[১৬] মারগিনানী, হিদায়াহ, ২/১০৫

[১৭] আবু ইউসুফ, কিতাব আল-খিরাজ, পৃ. ৮৫

[১৮] আল-কুরআন, ২ : ১৯৭

www.amarboi.org

সময়টাতে তারা একে অপরের প্রতি কি আচরণ করেন তারও পরীক্ষা হয়।

হজের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করলে বলতে হয় যে, এটি পবিত্র মক্কায় বিশ্বের সকল মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এখানে তাদের মধ্যে সামাজিক কল্যাণের মনোভাব জাগ্রত হয়। হজের যে পোষাকের বিধান রয়েছে সেটিতে সামাজিক সাম্যের প্রতীক চোখে পড়ে। দুই চিলতে সিলাই বিহীন সাদা কাপড় পড়ার অর্থই হচ্ছে মুমিন িসেবে সবারই সামাজিক মর্যাদা এক।

বিশ্বায়নের পর্যায়ে হজের মধ্যে সামাজিক জীবনের যে, প্রতিফলন ঘটে তা বেশ প্রসংশনীয়। এই মহান উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত পন্থায় সকল মুসলমান বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে এসে সমাবেত হয় হজ করার জন্য। সকল আন্তরিকতার সাথে এই হজ পালন করার নির্দেশ রয়েছে এবং যথাসম্ভব সুশৃঙ্খলভাবে তা আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এখানে কোনো ধরনের অশালীন আচরণ ও ঝগড়াঝাটির অনুমোদন নেই। হাজিরা সবাই একে অপরের সাথে সদয় হবেন এবং উত্তম আচরণ করবেন। যাকাত যেখানে আত্মত্যাগের শিক্ষা দেয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করে হজ সেখানে মানুষকে সামাজিক জীবনের নৈতিকতা ও সামাজিক আচরণের শিক্ষা দেয়।

ইসলামি জীবনব্যবস্থা নিরেট কোনো বিশ্বাস নয় যার প্রতিফলন ভালো কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রতিফলিত হতে হবে। ইসলামি জীবনব্যবস্থার সকল কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক সংগঠন অর্জন করা এবং এটি হচ্ছে ইসলামের সর্বোচ্চ সামাজিক আদর্শ। ইসলামি মৌলিক স্তম্ভগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন সমাজ গঠন করা যার সদস্যরা সবাই উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হবে।

চরিত্র হচ্ছে এমন একটি চিহ্ন বা প্রতীক যা মানুষকে একে অপর থেকে ভিন্ন করে। ব্যক্তি কিংবা অহং সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে রেখেছে। তাই তাকে হতে হবে বিবেচক, শান্তিকামী এবং আল্লাহ ও সমাজের প্রতি নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন। কান্টের মতে, ব্যক্তি কিংবা অহং এর সাথে আচরণ করতে হবে মাধ্যম হিসেবে, উদ্দেশ্য হিসেবে নয়।

ডিউই মনে করেন ব্যক্তির সত্তার মধ্যেই চরিত্র প্রতিফলিত হয় এবং ব্যক্তি যা কিছু পছন্দ করে আর না করে তার মধ্যে অহং এর দেখা মিলে[১৯]। ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের উপরও তার চরিত্রের বিচার করা যায়, কেননা চরিত্রের সাথে কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক অন্তর্নিহিত। যে ব্যক্তির অহং উত্তম তার কর্মও উত্তম। তাই অ্যারিস্টটল বলেন

[১৯] Dewey, Ethics, p-318

www.amarboi.org

একজন উত্তম মানুষের উত্তম গুণাবলী উজ্জ্বল রূপে প্রতিফলিত হয় তারই গুণাবলীর মধ্যে।

তাই ইসলাম উত্তম কর্মকাণ্ডের উপর জোর দেয়। শুধুমাত্র ইমানই যথেষ্ট নয় বরঞ্চ এর সাথে কাজেরও মিল থাকতে হবে। ইসলামের স্তম্ভগুলো এমনভাবে সাজানো যে, তার প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে আবেগের কেন্দ্র বিন্দু আত্মার পরিশুদ্ধি কেননা এর মাধ্যমেই মানুষ তার চাহিদা পূরণ করে। চাহিদা হচ্ছে এমন একটি আবেগ যার চালিকা শক্তি হচ্ছে কোনো কিছু অর্জনের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করার প্রত্যাশা। প্রবৃত্তি কিংবা চাহিদা এতটাই ব্যক্তিগত বিষয় যে এর সন্তুষ্টি বিধান করতে গিয়ে মানুষ পথচ্যুত হয়ে পড়ে। তাই চাহিদার সন্তুষ্টির চাইতে প্রবৃত্তিকে দমন করার প্রয়োজন বেশি। এই জন্য হয়তো বলতে শোনা যায় একজন অসন্তুষ্ট চিত্রের মানুষের চাইতে সন্তুষ্ট শূকর অনেক ভালো।

এখন আবারও প্রশ্ন উঠে মানব প্রকৃতি আসলে কেমন। অধিকাংশ দার্শনিক মনে করেন মানব প্রকৃতি হচ্ছে মন্দ। পক্ষান্তরে ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে এটি ভালো কেননা আল্লাহ তায়ালা তাকে সর্বোত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন (সুরা আততীন ৯৫ : ৪)। তবে এটা অস্বীকার করা যায় না যে মানুষ স্বভাবতই কুপ্রবৃত্তির শিকার হতে পারে। কেননা আমাদের যে মন মানসিকতা ও প্রবৃত্তি রয়েছে তা মূলত বাহ্যিক বিষয় সমূহের প্রতি আকৃষ্ট বেশি হয় এবং পরিস্থিতি মাঝে মধ্যে আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। নিয়ন্ত্রণে থাকাটাই হচ্ছে এর সমাধান কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে : আমরা কি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারব? ইসলামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটাই যে মন্দের সকল উৎস বন্ধ করার সুন্দর দিক নির্দেশনা আমাদের দিয়েছে। এই লক্ষে এই ব্যবস্থায় দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় :

১. নৈতিক শিক্ষা ও

২. আত্মার পরিশুদ্ধি- এটি হচ্ছে মূলত এক ধরনের সাহসী অভিযান।

এরিস্টটলের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা হচ্ছে এক ধরনের চারিত্রিক প্রশিক্ষণ যা ব্যক্তি ভালো একটি পরিবার থেকে পায় এবং এই ক্ষেত্রে তার টাকার ভালো শহরটিও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার এই সংজ্ঞা ইসলামি নৈতিক শিক্ষার থেকে অনেক ব্যতিক্রম। ইসলাম চরিত্রের উন্নয়নে সকল মন্দ এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহণ করে এবং মানুষের মনকে এমনভাবে তৈরি করে যাতে ভালো কাজে সে উৎসাহ পায়। আল্লামা ইকবালের মতে ইসলামি নৈতিক শিক্ষা মানুষের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ও তার সৃষ্টির বহুমুখী সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এক ধরনের উচ্চ সচেতনতা

www.amarboi.org

সৃষ্টি করে। একজন মুমিন কুরআনের দিক নির্দেশনার আলোকে যে চারিত্রিক প্রশিক্ষণ পায় তা অবশ্যই মহানবি সা.-এর চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পবিত্র কুরআনে তার আদর্শটিকেই সর্বোচ্চ আদর্শ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে : নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসুলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ (সুরা আহযাব ৩৩ : ২১)।

মহানবি সা.-এর স্ত্রী আয়েশার মতে খোদ কুরআন ছিলো তার চরিত্র। তার কাছে যা কিছু নাযিল হতো তিনি সেই অনুযায়ী নিজের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতেন। তার আদর্শ সকল মানব জাতির জন্য। তিনি তাদের জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তম আদর্শ রেখে গেছেন এবং দাবি করেন যে, মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী পরিপূর্ণ করার জন্য তিনি পৃথিবীতে এসেছেন[২০]। তার মতে একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম[২১]।

কুরআন ও মহানবি সা.-এর বাণী ও জীবনী যেখানে মুসলমানদের জন্য সর্বোত্তম নৈতিক শিক্ষা দেয়, সেখানে ইসলামের স্তম্ভগুলো তার আত্মাকে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করে যে মানুষ তখন আল্লাহ তায়ালা ভীতি অবলম্বন করে এবং সব সময় আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতি অনুভব করে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ও কর্মকাণ্ডে একজন মুমিন আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতি অনুভব করে। আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তাই সে সতর্ক জীবনযাপন করে। এই ধরনের মন মানসিকতা নিঃসন্দেহে আত্ম নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি এবং এর উপরই মানুষের সমৃদ্ধি ও সফলতা নির্ভর করে। সেই সফল হয়েছে যে, তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, এবং সেই ব্যর্থ হয়েছে যে তাকে কলুষিত করে (সুরা শামস ৯১ : ৯-১০)। এই হচ্ছে কুরআনের শিক্ষা। এখন আমরা আত্মার পরিশুদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করতে পারি।

আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন অসীম দয়ার আধার। তিনি মানব জাতিকে তার নিদর্শন সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করার জন্য যুগে যুগে নবিগণকে পাঠিয়েছেন যাতে করে তারা ভ্রান্তির অন্ধকার থেকে নিজেদের বের করে এনে পরিশুদ্ধ করতে পারে। তাই সকল নবির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আত্মার পরিশুদ্ধি এবং মহানবি সা. শেষ নবি হিসাবে এই বিষয়ে আরো জোর দিয়েছেন। আত্মার পরিশুদ্ধির আরবি তরজমা হচ্ছে তাজকিয়া আল- নাফস্ যার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে নাফ্স অথবা আত্মাকে পাপাচার থেকে দূরে রেখে ন্যায়পরায়ণতার দিকে ধাবিত করা। কিন্তু এটা স্পষ্ট নয় আত্মা কী

---

[২০] মিশকাত, ২/৬৩২

[২১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩২

www.amarboi.org

এবং তা কিভাবে কাজ করে। সক্রেটিসের মতে খোদ মানুষই হচ্ছে আত্মা কেননা তিনি বলেছেন নিজেকে জানো। আমাদেরও একটি স্বতঃসিদ্ধ বাণী আছে : যে নিজেকে জানে সে আল্লাহ তায়ালাকে জানে, এর অর্থ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজেই হচ্ছে আত্মা।

পবিত্র কুরআনে যে নাফ্স এর উল্লেখ আছে তদ্বারা মনকে, অন্তর অথবা মানুষকে বুঝানো হয়। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত যেমন, (সুরা হূদ ১১ : ৩১) এবং (সুরা বাকারা ২ : ২৮৬) তে আমরা তা উপলব্ধি করতে পারব। এই আয়াত গুলোতে বলা হয়েছে যে, যদি আত্মার দমন করা না হয় তাহলে মানুষ এমন মন্দের শিকার হবে যা দুরাত্মাকে ডেকে নিয়ে আসে।

আত্মার পরিশুদ্ধির তিনটি ক্ষেত্র হচ্ছে : (১) আম্মারা (সুরা ইউসুফ ১২ : ৫৩) অথবা কলুষিত আত্মা যা মন্দ কাজের প্রতি ঝুঁকে এবং তাকে যদি লাগামহীন ভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠে : (২) লাওয়ামা (সুরা কিয়ামা ৭৫ : ২), অথবা সেই আত্মা যা পরিশুদ্ধি প্রক্রিয়াধীন, এবং মন্দের ব্যাপারে সচেতন হওয়া শুরু করেছে যার কারণে অনুতপ্ত হওয়ার পর পরিশুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে (৩) মোতমাইন্না (সুরা ফজর ৮৯ : ২৭), অথবা সেই আত্মা যা পরিশুদ্ধির সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে নিয়ামত হিসেবে যা দিয়েছে তাতেই সে সন্তুষ্ট। এই পরিশুদ্ধি আত্মা সম্বন্ধে কুরআনে বলা হয়েছে : হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার মালিকের কাছে সন্তুষ্টচিত্তে ও তার প্রিয় ভাজন হয়ে ফিরে যাও, অতঃপর তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাও, আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে (সুরা ফজর ৮৯ : ২৭-৩০)। মুসলিম ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী আত্মার চূড়ান্ত পূর্ণময় ধাপ।

সর্ব সুখ হচ্ছে জান্নাতের বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে আমাদের এখন জানা উচিত এই সর্ব সুখ লাভ করতে হলে কি করা উচিত? এর একটি জবাব হচ্ছে উত্তম আমল বা আমাল সালেহা। কুরআন আমাদেরকে এই উত্তম আমলের দিকেও আহ্বান করে। প্রায়শ কুরআনে বলা হয় ইমান আনো এবং উত্তম আমল করো। এখানে প্রথমে আমরা ঈমানের উপর জোর দিতে দেখতে পাই এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তম আমলের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই যাবত আমরা প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ ঈমানের উপর আলোচনা করেছি এখন আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ নেক আমলের উপর আলোচনা করব।

www.amarboi.org

২. উত্তম আমল (আ'মাল সালেহা)

আমরা উপরোক্ত আলোচনায় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করি তখনই আমাদের প্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করার পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করতে হয়। কেননা এটি হচ্ছে মানবিক কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি। কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থায় সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে প্রবৃত্তির তাড়নায় কোনো কাজে নামার আগে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা। নৈতিকতা পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। কেননা তা হবে এক ধরনের স্বার্থ কেন্দ্রীক ভোগবাদ কিংবা নীচ প্রকৃতির আনন্দ ও সন্তুষ্টি। তাই, প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে আমরা একটি উত্তম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে পারি? সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, পাপ ও পূণ্য ভালো ও মন্দের বিষয়গুলোর মূল উৎস জনগণের প্রত্যায়ন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় পাপ হচ্ছে সেই সকল আচরণ যা সমাজে নিন্দনীয় এবং পূণ্য ঐ সকল আচরণ যা সমাজে প্রসংশনীয়। এর অর্থ হচ্ছে মানুষ যা কিছু পছন্দ করে এবং ভালো বলে প্রসংশা করে তাই হচ্ছে ভালো এবং জনগণ যা কিছুর নিন্দা করে তাই হচ্ছে খারাপ।

কিন্তু শুধুমাত্র প্রসংশা ও নিন্দা বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। কেননা, এই মাপকাঠির আওতায় যে বিচার করা হবে তার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি দলের সামাজিক আচরণেরই প্রতিফলন ঘটে মাত্র। যেমন কোনো জঙ্গি গোষ্ঠীর কাছে সশস্ত্র অর্জনই প্রসংশনীয়। তাই জনগণের রায়ের ভিত্তিতে কোনো কিছুকে প্রসংশনীয় বলা যায় না। বরঞ্চ দেখা যায় সামাজিক প্রত্যায়ন দ্বারা সমর্থন পুষ্ট হলেই কোনো কিছু ভালো কিংবা মন্দ বলে বিবেচিত হয় প্রকৃত অর্থে তা ভাল কিংবা মন্দ কিনা তা বিবেচ্য বিষয় নয়।

কোনো একটি নির্দিষ্ট দলের সামাজিক প্রত্যায়নের কারণে জঘন্য ধরনের প্রথাও বৈধ হতে পারে। যেমন প্রাক ইসলামি যুগে আরব উপদ্বীপে কন্যা সন্তান হত্যা মন্দ কোনো প্রথা ছিল না। তাছাড়া, খোদ সামাজিক প্রত্যায়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তনশীল। এই প্রসঙ্গে শাতিবি তার বিখ্যাত গ্রন্থ মুয়াফাকাত এ প্রাচ্যের কিছু সমাজের প্রথা তুলে ধরেন। যেমন, ঐ সকল সমাজে বড়দেরকে দেখলেই টুপি মাথায় দিতে হয় অথবা মাথা ঢাকতে হয়, পক্ষান্তরে পশ্চিমা সমাজে সম্মান দেখাবার প্রথা হচ্ছে মাথার টুপি খুলে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রথার ভিত্তিতে নৈতিকতার যে বিচারিক মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয় তার কোনো ভিত্তি নেই। মূলত নৈতিক বিচারের আওতায় আমরা যে, চিন্তাশীল নৈতিকতার কথা বলি তা কিন্তু এক ধরনের মূল্যবোধের বিচার যার সাথে প্রকৃত পক্ষে নৈতিকতার কোনো সম্পর্ক নেই। এতে করে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিচার

www.amarboi.org

প্রক্রিয়ায় চিন্তাধারা ও মানসিক কর্মকাণ্ডেরও প্রভাব রয়েছে। যে বিচারের মূল ভিত্তি হচ্ছে মানবিক কর্মকাণ্ড তার সাথে আবেগ জনিত বিষয়গুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যে, বিচার করা হয় তা হবে আপেক্ষিক এবং তা কখনো বিশ্বজনিন হতে পারে না।

তাই, ইসলাম এই ধরনের বিচারিক মাপকাঠির উপর নির্ভরশীল নয়। কেননা, এগুলোকে মাপকাঠি বললেও ভুল হবে যেহেতু নড়বড়ে কিছু ধারণার উপরই এগুলো প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন প্রকৃত কল্যাণ কোনটি, তাই উত্তম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে আল্লাহ তায়ালার আইন অনুযায়ী। এই আইনের রয়েছে নিজস্ব মাপকাঠি ও কর্মকাণ্ডের দিক নির্দেশনা।

এন্ডারসনের মতে, একজন মুসলমানের জন্য প্রতিটি মানবিক কর্মকাণ্ডের নৈতিক গুণাবলী রয়েছে। এক দিকে রয়েছে কুবহুন যা কিনা গর্হিত ও নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং অন্য দিকে রয়েছে হুসনুন যার অর্থ প্রসংশনীয় ও ভালো। কিন্তু এই নৈতিক গুণাবলী মানবিক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। বরঞ্চ এই ক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণরূপে ঐশী বাণীর উপর নির্ভরশীল। তাই প্রতিটি মানবিক কর্মকাণ্ড কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত। এর মধ্যে পাঁচটি শ্রেণির উল্লেখ করা যেতে পারে : যার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে, যার আইনী বৈধতার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো জোর নেই, আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক যা নিন্দিত অথবা নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র যে সকল কর্মকাণ্ড মধ্যম শ্রেণি অবস্থান করছে অর্থাৎ যেগুলোর ব্যাপারে ঐশী বিধান স্পষ্ট নয় সে সকল বিষয়ে মানবিক আইন চর্চার বিষয়টি প্রযোজ্য হতে পারে[২২]।

মানুষের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে প্রত্যায়ন করে না। কেননা, এটি মানবিক কর্মকাণ্ড তথা সমাজের নৈতিক নিয়ন্ত্রণ নীতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

তাই দেখা যায়, আইন এখানে সমাজ থেকে উৎসারিত হয়নি কিংবা সমাজ তা গড়ে তোলেনি, যা কিনা পশ্চিমা ব্যবস্থার বিপরীত। মানবিক চিন্তাধারা যদি কোনো ধরনের দিক নির্দেশনা বা সহায়তা ছাড়া পরিচালিত হয় তাহলে আচার আচরণ ও প্রকৃত মূল্যবোধের মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হিমশিম খেয়ে যাবে; এই আচরণ ও মূল্যবোধ সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জন করা যায় একমাত্র ঐশী বাণীর মাধ্যমে। কোনো কাজ ভালো কিংবা মন্দ হয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে। ইসলামি ধর্ম মতে সমাজের আগে আইন এবং আইন-ই সমাজ গড়ে তোলে। চিরন্তণ আইন-ই রাষ্ট্র ও

---

[22] Anderson, Islamic Law in the Modern World. p-3

www.amarboi.org

সমাজের কাঠামো নির্ধারণ করে এবং আদর্শগতভাবে এই দুই সত্তাকে সেই অনুযায়ী গড়ে উঠতে হবে[২৩]।

সমাজে নিরাপত্তা বিধানের জন্য ইসলামি আইন মানব জাতিকে দুইটি দায়িত্ব অর্পন করেছে : একটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অন্যটি হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ককে ঘিরে। তাই এই আইন হচ্ছে এক ধরনের দায়িত্বের আইণ তা কোনো অধিকারের আইন নয়। যে কোনো ব্যক্তি এই আইনের নৈতিক বাধ্যবাধকতার সামনে নত হতে বাধ্য এবং দুনিয়াবী কোনো কর্তৃপক্ষ তাকে এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে না। সে যদি কখনো তা অমান্য করে তাহলে তার ভবিষ্যত হুমকির সম্মুখীন হবে[২৪]। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতে শাস্তির যে বিধান ইসলাম ধর্মে রয়েছে তা মানুষকে অন্যায় অনাচার থেকে দূরে রাখতে অনেক কার্যকরি ও সফল ভূমিকা পালন করেছে। এটি মানব রচিত শাস্তিমূলক কঠোর আইনের তুলনায়ও অনেক কার্যকর। কেননা ইমান হচ্ছে প্রকৃত বাস্তবতা এটা নিরেট কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়।

এই ভাবেই ইসলাম একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বন করে। ইসলামি আইন চায় এমন সমাজ গড়ে তুলতে যার ব্যক্তিবর্গ উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হবে এবং শরিয়াহ অথবা ইসলামি আইনের বিধি বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করবে। এই ধরনের আইনী ব্যবস্থার কল্যাণে মানবাত্মা পরিশুদ্ধ হবে এবং উত্তম সৃষ্টি হিসেবে মানুষ নিজের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকবে এবং অন্যান্য সবাইকেও সমীহের চোখে দেখবে। তার কাছে অন্যের কল্যাণ বিধান মুখ্য হয়ে উঠবে এবং আমাদের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য শারীরিক অবস্থার মতো তার মানসিকতাও এই ভাবেই তৈরি হবে। সব শেষে বলা যায় মানব রচিত আইনের মাধ্যমে সামাজিক অনুভূতি উৎকর্ষ লাভ করে না বরঞ্চ তার আত্মা থেকেই সামাজিক অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

মানব ইতিহাসের সবচাইতে সভ্য চালিকা শক্তি হচ্ছে ইসলাম। এটি ব্যক্তির মধ্যে আত্মত্যাগ ও সামাজিক সেবার স্পৃহা সৃষ্টি করে; মানব ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে সমুন্নত রাখে; মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তির মান সম্মানকে সংরক্ষিত রাখে; অন্যান্যদের বাস্তবিক কল্যাণের গুরুত্বের উপর জোর দেয় এবং সর্বোপরি মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো দূর করে। এখন আমরা আবার মহানবি সা.-এর জীবনীতে ফিরে যেতে পারি, যেহেতু তিনি ছিলেন উত্তম আমল ও দয়ার জীবন্ত দৃষ্টান্ত :

---

[23] Coulson, A History of Islamic Law, p-85

[24] Jackson, Foreword to Law in the Middle East. ed. Khadduri and Liebesny, p-7

www.amarboi.org

আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মোমেনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে রসুল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার কিতাবের আয়াতসমূহ পড়ে শোনায় এবং (সে অনুযায়ী) সে তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে, (সর্বোপরি) সে (নবি) তাদের আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও (তাঁর গ্রন্থলব্ধ) জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, অথচ এরা সবাই ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১৬৪)। মহানবি সা.-এর যে দয়াময় চরিত্র ছিলো তা তার রুক্ষ ও মরুভূমির শক্ত অন্তরের আরবদের মন জয় করে নেয় এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার অনুসরণ করে এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা বংশ ধারার ধর্মকে পরিত্যাগ করে। তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ :

> হে নবি আমি তো আপনাকে সৃষ্টি কুলের রহমত বানিয়েই পাঠিয়েছি (সুরা আম্বিয়া ২১ : ১০৭)। তিনি যে কথাগুলো বলতেন সেগুলোও ওহীর মাধ্যমে অনুপ্রেরণা পেত- তিনি কখনো নিজের থেকে কোনো কথা বলেন না, বরং তা হচ্ছে ওহী, যা তার কাছে পাঠানো হয়[২৫]। তাঁর বাণী গুলো কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় নয় বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে সম্পূরকের ভূমিকা পালন করে। এই জন্য কুরআনে বলা হয় : আল্লাহ তায়ালা ও রসুলের আনুগত্য কর (সুরা নিসা ৪ : ৫৯)।
>
> রসুল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো; এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো (সুরা হাশর ৫৯ : ৬৭)। যে রসুলের আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহ তায়ালারই আনুগত্য করল (সুরা নিসা ৪ : ৮০)।

তিনি যে নৈতিক শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেছেন তা বিশ্বের সকল সমাজে সমাদৃত। তাঁর বিখ্যাত বাণীগুলোর একটি হচ্ছে তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য তাই চাইবে যা তুমি নিজের জন্য চাইবে। এখানে আমরা ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক নৈতিকতা চর্চার উত্তম নিদর্শন দেখতে পাই। নৈতিক মতবাদ যাতে কার্যকর হয় সেই জন্য প্রয়োজন উত্তম চরিত্রের সমর্থন। তাই ইসলাম সর্ব প্রথম মুসলমানের চরিত্রের উপর জোর দেয় এবং খোদ মহানবি সা. নিজেও অনুকরণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জীবন্ত আদর্শ ছিলেন :

> হে নবি, আমি আপনাকে হেদায়াতের সাক্ষী বানিয়ে পাঠিয়েছি,

---

[২৫] আল-কুরআন, ৫৩ : ৩-৪

www.amarboi.org

আপনাকে বানিয়েছি জান্নাতের সুসংবাদদাতা ও জাহান্নাতের সর্তককারি (সুরা আহযাব ৩৩ : ৪৫)।

হিট্টি বলেন, মহানবি সা. অল্প কয়েক যুগে এমন একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন, যা এশিয়া ও আফ্রিকার বিশাল এলাকায় খ্রিষ্টবাদের ব্যাপকতাকেও ছাড়িয়ে যায়। তিনি এই বিশাল এলাকায় একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তাছাড়া এমন এক সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে তা অচিরেই সভ্য জগতের একটি বৃহত্তর অংশে পরিণত হয়। তিনি প্রাত্যহিক জীবনে এমন এক ব্যবহারিক আদর্শ দিয়ে গেছেন যাকে এখনও লক্ষ লক্ষ আচার আচরণের সঠিক মাপকাঠি মনে করে যা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবার অনুকরণ করা উচিত। তিনি নিজে উম্মি হলেও তার উপরই কুরআন নাযিল হয়েছিল। মুসলমানরা এই কুরআনকে সকল প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান, আইন ও ধর্ম তত্ত্বের উৎস মনে করেন[২৬]।

এই যাবত আমরা ইসলাম ধর্মের ভবিষ্যত সম্বন্ধীয় প্রজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং বাস্তবে ভালো কোনটি তা নিয়েও পর্যালোচনা করেছি, আরো দেখেছি কিভাবে এই কল্যাণ সামাজিক নৈতিকতা গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। মহানবি সা.-এর আদর্শ আচরণ বিধি ও কর্মকাণ্ডের শ্রেণি বিন্যাসের আলোকে আমরা বিচারের সঠিক মাপকাঠি নিয়েও পর্যালোচনা করেছি। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে উত্তম কর্মের শর্তাবলী কী কী।

ক. আল্লাহ তায়ালার আইনের প্রতি শ্রদ্ধা

'আল্লাহ তায়ালার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের প্রতি সদয় হও'[২৭]। এই হচ্ছে মহানবি সা.-এর বাণী। যদি আইন মানা হয় তাহলেই তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা হয়। আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তিতে থাকা এবং আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি বিশেষ করে মানব জাতির প্রতি সদয় হওয়া। মহানবি সা. আমাদের বলে গেছেন যে, উত্তম কর্মকাণ্ডের মূল হচ্ছে দয়া। ইসলামি আইন তার অনুসারীদের এমন এক জীবন বিধান দিয়ে গেছে যা আল্লাহ তায়ালার প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব ও সমাজের অন্যান্যদের প্রতি ব্যক্তির দায় দায়িত্ব সূচারুরূপে বিধৃত করা হয়েছে।

ন্যায়পরায়ণ কর্মকাণ্ডের সাথে দয়ার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা এটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য গুণাবলীর একটি। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে মহানবি

---

[২৬] Hitti, The Near East in History, p. 191

[২৭] বায়হাকী, সুনান আল-কুবরা, কিতাব আল ইমাম

www.amarboi.org

সা.-কে মানব জাতির জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। খোদ কুরআন শরিফও দয়ার একটি উৎস :

আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ইমানদের জন্য উপকারী ও রহমত (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ৮২)। তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে এক রসুল এসেছে, তোমাদের কোনো রকম ভোগ তার উপর দুঃসহ, সে তোমাদের একান্ত কল্যাণকামী, ইমানদারদের প্রতি সে হচ্ছে স্নেহপরায়ণ ও পরম দয়ালু (সুরা তাওবা ৯ : ১২৮)। এগুলো ছাড়া মহানবি সা.-এর অন্যান্য আরো বাণীতে আমরা দয়ার গুরুত্ব দেখতে পাই : 'আল্লাহ তায়ালার রহমত দয়াবানদের উপরই বর্ষিত হয়'। 'বিশ্ববাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করো তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দয়া বাস্তব অর্থে কী জিনিস?

খ. দয়া ও সাথী সঙ্গীদের জন্য ভালোবাসা

দয়া হচ্ছে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের জন্য মানুষের ভালোবাসা। অধীনস্থ ও আত্মীয়স্বজনের জন্য এই ভালোবাসা হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার দয়া তার চাইতেও ব্যাপক এবং প্রয়োজন দেখা দেওয়ার আগেই আল্লাহ তায়ালা তা প্রদর্শন করে। সমগ্র বিশ্ব আল্লাহ তায়ালার অনুকম্পায় পরিচালিত। মহানবি সা.-এর পবিত্র মিশন ছিল এই দয়ার উপর ভিত্তি করেই। তিনি এমনকি জীব জন্তুর সাথেও দয়ার্ত আচরণ করার নির্দেশ দেন। তিনি জীব জন্তুর উপর অতিরিক্ত বুঝা উঠাতে নিষেধ করেন এবং ইসলামি আইনে কোনো মালিক যদি জীব জন্তুকে কষ্ট দেয় তাহলে বিচারক চাইলে সেই জীব জন্তুগুলোকে নিয়ে নিতে পারেন। ইসলাম ধর্মের মৌলিক উপাদানগুলোর একটি হচ্ছে এই দয়া। উত্তম কাজ কর্মের মধ্যেই বাস্তব জগতে মানুষ দয়ার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে :

> তোমরা তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে ফেরাও বা পশ্চিম দিকে ফেরাও, এতেই কিন্তু সব নেকী নিহিত নেই, তবে আসল কল্যাণ হচ্ছে একজন মানুষ ইমান আনবে আল্লাহ তায়ালার ওপর, পরকালের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, (আল্লাহ তায়ালার) কিতাবের ওপর, (কিতাবের বাহক) নবি রসুলদের ওপর এবং আল্লাহ তায়ালার দেয়া মাল সম্পদের ওপর তার (নিজের প্রবল) ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও সে তা (তার) আত্মীয় স্বজন, এতিম মেসকিন ও পথিক মুসাফিরের জন্য ব্যয় করবে, সাহায্যপ্রার্থী (দুস্থ মানুষ, সর্বোপরি) মানুষদের (কয়েদ ও দাসত্বের) বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার কাজে অর্থ ব্যয় করবে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে, (দারিদ্র বিমোচনের জন্য) যাকাত আদায় করবে- (তাছাড়াও

www.amarboi.org

> রয়েছে যেসব পুণ্যবান মানুষ); যারা প্রতিশ্রুতি দিলে তা পালন করে, ক্ষুধা দারিদ্রের সময় ও (বিশেষ করে হক বাতিলের) যুদ্ধের সময় এরা ধৈর্য্য ধারণ করে, (মূলত) এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত আল্লাহভীরু মানুষ (সুরা বাকারা ২ : ১৭৭)।

এছাড়া কুরআনে আরেকটি আয়াত আছে যাতে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, ন্যায়পরায়নতার সাথে সঙ্গী সাথীদের ভালোবাসার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত খোলা মনে মুমিন তার ভাইয়ের প্রয়োজনে প্রিয় জিনিস পরিত্যাগ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়পরায়ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> তোমরা কখনো নেকী অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা এমন কিছু ব্যয় করতে যা তোমরা ভালোবাস; তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো আল্লাহ তায়ালা তা জানেন (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৯২)।

দরিদ্রদেও সাহায্যে এগিয়ে আসার উপর কুরআনে অনেক জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের ইমানকে হতে হবে সত্যিকারের আন্তরিক। আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার আইন যথা সম্ভব পালন করতে হবে এবং তার ভালোবাসায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে হবে। আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসার জন্যই আমাদের মালিকানায় যা কিছু আছে তার কিয়দংশ দরিদ্র ভাইদের জন্য ত্যাগ করতে হবে।

ন্যায়পরায়ণতার অর্থ হচ্ছে আমরা সুনাগরিক হবো এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বকে দয়ার মাধ্যমে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করব। সমকালীন যে কোনো আহ্বান থেকে মহানবি সা.-এর দয়া ও ভ্রাতৃত্বের ডাক অনেক বেশি সফলতা অর্জন করে। তার কল্যাণেই আরব উপদ্বীপে বিবাদমান গোত্রগুলো ইসলামের এক পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে খলিফাদের অধীনে মানব জাতির ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়।

এটা লক্ষ্যণীয় যে প্রতিটি ধর্মের উৎপত্তি নির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাবনা দিয়ে। ধরা যাক বৌদ্ধ ধর্মের কথা, এখানে মনে করা হয় বেদনা হচ্ছে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং মানুষ বেদনার শক্তির কাছে ব্যক্তি পর্যায়ে অসহায়। তাই আত্ম বিলুপ্তির আদর্শ অবলম্বন করেই মুক্তির সমাধান দেওয়া হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে নিস্কৃয়তা ও মর্মাঘাত। পক্ষান্তরে ইসলাম সক্রিয় জীবন, আত্মত্যাগ ও ন্যায়পরায়ণ কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী। এই দিকে ধর্ম হিসাবে খ্রিষ্টবাদ পাপ সম্বন্ধীয় মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই মতে এই বিশ্ব হচ্ছে সকল মন্দের আধার। মানুষকে পাপ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার বেলায় খুবই দুর্বল মনে করা হয়। তাই একজন রক্ষাকর্তার প্রয়োজন যে, স্রষ্টা ও মানুষের মাঝে মধ্যস্থতা করবে। ইসলাম ধর্মে এই ধরনের বিষয়ের কোন অস্তিত্ব নেই।

www.amarboi.org

ইসলামি শিক্ষা মতে পাপ ও মন্দের উপকরণগুলো নিশ্চিত করা সম্ভব এবং এই জগত পূর্ণ অর্থে মন্দের সমাহার নয় বরঞ্চ এর সংস্কার করা যেতে পারে। প্রকৃতির সব কিছুর মতোই মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর মধ্যে সমন্বয় করতে পারে কেননা আল্লাহ সব কিছুই মানুষের সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন (সুরা লোকমান ৩১ : ২০)। আসলে আল্লাহ তায়ালার উপর ইমান না আনার কারণেই মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির কাছে নিজেকে অসহায় মনে করে। আল্লাহ তায়ালার দিক নির্দেশনা অনুযায়ী মানুষ যদি তাকে ভয় করত তাহলে পৃথিবীর কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারতো না। মানুষ তার নৈতিকতার পরাকাষ্ঠায় তখনই পৌঁছায় যখনই সে আল্লাহ তায়ালা সচেতন হয় এবং তাকে সকল কর্মকাণ্ডে ভয় করে চলে। মানুষের এই উপলব্ধি মানুষকে সকল পাপাচার ও দুনিয়াবি অকল্যাণ থেকে মুক্ত করতে পারে।

ইসলাম কোনো ধরনের ভয়কে প্রত্যায়ন করে না একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ভীতি ছাড়া, যেহেতু এটিই হচ্ছে জীবনের সকল প্রজ্ঞার উৎস। এটি সমাজের প্রতি মানুষের দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করে। ইসলামের সবচাইতে উচ্চ পর্যায়ের পূর্ণ হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা এবং এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। দয়া থেকে যে নেক কর্মকাণ্ডের উৎপত্তি হয় সেটি হচ্ছে প্রকৃত ন্যায়পরায়ণতা যা সঙ্গী সাথীদের সুখ দুঃখের সাথে সম্পৃক্ত। প্রকৃত ন্যায়পরায়ন ব্যক্তি সেই যে আত্মত্যাগ ও অন্যের উপকারে আনন্দ খুঁজে পায়। এই ক্ষেত্রে মহানবি সা.-এর কয়েকটি বাণী উল্লেখ করাই যথেষ্ট :

> এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই, সে তার প্রতি কোনো অন্যায় করে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখে না, এমনকি তাকে কখনো অপদস্থ করে না (মুসলিম)।
>
> একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের জীবন, মান সম্মান ও সম্পদ হারান (মুসলিম ও বুখারি)।

দয়া, ভালোবাসা ও অনুকম্পার ক্ষেত্রে একজন মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য হচ্ছে এক শরীরের মতো। শরীরের কোনো অঙ্গ যদি ব্যাথা পায় তাহলে অন্যান্য সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্বলতা ও জ্বরের মাধ্যমে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে (মুসলিম ও বুখারি)।

www.amarboi.org

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইসলামি সমাজব্যবস্থা

সামাজিক শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক। তাই ইসলামি সামাজিক ব্যবস্থার উপর আলোচনা করার আগে আমাদের প্রথমেই ইসলামি সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উপলব্ধি করতে হবে। আর এই সমাজব্যবস্থা হচ্ছে ইসলামি আইনের ফসল যা ইসলামের সকল জীবনব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত- অর্থনীতি, রাজনীতি, বৈবাহিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহ। এই অর্থে বলা যায় ইসলামি সমাজ হচ্ছে ইসলামেরই প্রকৃত প্রতিফলন যা মানুষে মানুষের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে ধার্মিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে (সুরা মায়েদা ৫ : ২)। মহানবি সা.-এর মতে ধর্ম হচ্ছে ভালো মানবিক সম্পর্ক। এর অর্থ হচ্ছে উত্তম আচার আচরণের মাধ্যমে ভালো মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখা। প্রথম অধ্যায়ে আমরা সমাজের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে আলোচনা করেছি তাতে বুঝেছি যে, ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ব্যবস্থা। প্রাক ইসলামি ধর্মগুলো পার্থিব বিষয়সমূহের উপর খুব একটা বেশি জোর দিত না। পক্ষান্তরে ইসলাম শুধু ধর্মীয় বিষয়ে জোর দেয়নি বরঞ্চ পার্থিব বিষয়েও ব্যাপক দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছে। যারা মনে করে ইসলাম হচ্ছে এক ধরনের ইবাদত মাত্র তারা এর ব্যবহারিক মূল্যবোধের কথা ভুলে যায়। তারা বুঝতে পারে না যে, ভালো মানবিক সম্পর্ক চর্চার মাধ্যমে ইসলাম সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সামাজিক ব্যবস্থা বলতে পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থাকে বুঝায় যেগুলো এমন বিধিমালা কিংবা আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত যা পারস্পরিক আচরণ ও লেনদেনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামি আইন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ উপহার যার লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক সঙ্গতি এবং পারস্পরিক সদাচার ও স্বচ্ছ লেনদেন। Schacht এর মতে, ইসলামি আইন একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা অর্থাৎ এটি হচ্ছে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন মতবাদের সমাহার। এর অন্তর্ভুক্ত যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেগুলো একে অপরের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। উদাহরণ স্বরূপ চুক্তি ও লেনলেন সম্পর্কিত যে আইনগুলো রয়েছে সেগুলো ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তির উপর তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে

www.amarboi.org

প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া, পুরো আইনী ব্যবস্থার ধর্মীয় ও নৈতিক বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত, যার কারণে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান, দায় দায়িত্ব ও লেনদেনের মাপকাঠি হচ্ছে ধর্মীয় ও নৈতিক বিধি বিধান। যেমন, সুদের অবৈধতা, অনিশ্চয়তার নিষিদ্ধকরণ, দুই পক্ষের মধ্যে সমতা বিধান, এবং বৈধ মাধ্যম গ্রহণ করার পদ্ধতি[১]। ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য এই পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে।

এর পাশাপাশি, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যও বিশেষ দিক নির্দেশনা রয়েছে যা আমরা (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ২৩-৩৯) আয়াত সমূহে দেখতে পাব। এই আয়াতগুলো রাজনীতি সম্পর্কিত এবং এখানে নৈতিকতার ভিত্তিতে শাসন করার উপর জোর দিয়েছে। তাছাড়া পিতামাতার সাথে সদয় আচরণ, আত্মীয় স্বজনদের অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া, চুক্তিসমূহ সঠিকভাবে পালন করা, ওজনে সঠিক দেওয়া, উত্তম বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে সংলাপ পরিচালনা করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর বিপরীতে ব্যভিচার, প্রতারণা ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির মতো সকল গর্হিত কর্মকাণ্ডকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সর্বোপরি, আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে সকলেই সমান। এই প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে : হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্য জাতি ও গোত্র বানিয়েছি যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে) বেশি ভয় করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর (পুঙ্খানুপুঙ্খ) খবর রাখেন (সুরা হুজুরাত ৪৯ : ১৩)।

এই আয়াত মানব জাতিকে তার প্রকৃত উৎসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে আরো বলা হয় বর্ণ কিংবা জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রে কোনো ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবে না। ন্যায়পরায়ণতাই হচ্ছে মর্যাদা নির্ধারণের এক মাত্র মাপকাঠি। মহানবি সা.-এর বাণীও এই সত্যকে প্রত্যায়ন করে :

বিদায় ভাষণে তিনি বলেন, হে জনগণ! তোমাদের আল্লাহ তায়ালা এক এবং তোমাদের পিতা এক। তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদমের সৃষ্টি মাটি হতে। একজন অনারবের উপর কোনো আরবের শ্রেষ্টত্ব থাকতে পারে না, তেমনি একজন অনারব কখনো কোনো আরব থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না, শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমনি কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই একমাত্র তাকওয়া ছাড়া।

---

[১] Schacht, An Introduction to Islamic Law, p.145

www.amarboi.org

ইসলামি সমাজব্যবস্থা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক ব্যবস্থা যা সকল সামাজিক অকল্যাণ ও বৈষম্য থেকে মুক্ত। আমরা পররাষ্ট্র নীতি ও অমুসলিমদের মর্যাদা শিরোনামে ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকরা কী ধরনের ব্যবহার পাবে তা নিয়ে আলোচনা করেছি। নারী ও দাসদাসীদের বিষয়েও ইসলামে পূর্ণাঙ্গ বিধান রয়েছে যার কারণে ইসলামি সামাজিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্বজনীনতা একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয়।

১. ইসলাম : একটি বিশ্ব ব্যবস্থা

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম এবং যে কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে হয়ে যাবে মুসলমান ও ইসলামি সমাজেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই প্রসঙ্গে জামাল উদ্দিন আল-আফগানী (মৃত্যু ১৮৯৭ খ্রি.) বলেন, প্রতিটি বিবেচনায় ইসলাম ধর্ম হচ্ছে প্রতিটি যুগে পরিবর্তনীয় পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর মতো বিশ্ব শক্তি। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম পরিস্থিতির সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। বরঞ্চ এর অর্থ হচ্ছে ইসলাম ধর্মের বিধানগুলো যে ব্যাপক মূলনীতি ধারণ করে সেগুলো সমাজের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনগুলোর দাবি মেটাতে পারে। তাই ইসলাম ধর্মের রাজনীতি, অর্থ এবং জীবনের অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতগুলোকে এমন সকল বিধি বিধান নিয়ন্ত্রণ করে যা সমাজের বৈচিত্র্যময় চাহিদা মেটাবার সক্ষমতা রাখে এবং সমাজকে একটি বিশ্বজনীন রূপ দেয়। মহানবি সা. কে প্রেরণ করা হয়েছে বিশ্বের সকল মানব জাতির জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> 'হে নবি, আপনি বলুন, হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহ তায়ালার রসুল হিসেবে এসেছি' (সুরা আ'রাফ ৭ : ১৫৮)।

কুরআন তার বাণী সমস্ত মানব জাতিকে সম্বোধন করেই বিধৃত করেছে। এই মহাগ্রন্থে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সাম্য বিধান করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এতে আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিক নির্দেশনা যেমন রয়েছে তেমনি বৈশ্বয়িক, ব্যক্তি ও সামাজিক দিক নির্দেশনাও রয়েছে। এটি পৃথিবীর একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যা তার আদি রূপেই বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> 'আমি উপদেশ নাযিল করেছি এবং আমি তার সংরক্ষণকারী' (সুরা হিজর ১৫ : ৯)।

নিঃসন্দেহে কুরআনের প্রতিটি অক্ষর সব ধরনের বিকৃতি থেকে মুক্ত। তদুপরি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র, যেমন অর্থনীতি, রাজনীতি, বিবাহ জীবন এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

www.amarboi.org

ইসলামি মতে, মানব জাতি হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি এবং তার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এই প্রতিনিধিত্বের মান বজায় রাখা। তাহলে তাকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে আল্লাহ তায়ালার মহৎ গুণাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে। আল্লাহ তায়ালার একটি গুণ হচ্ছে তিনি দয়ার আধার তাই মানুষকে হতে হবে দয়াশীল এবং অন্যান্য সকল প্রাণীর প্রতি দয়াপরবশ। তাকে জ্ঞান অর্জন করে প্রাকৃতিক উৎস সমূহের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হবে। তবে এই সব কিছুর লক্ষ্যই হচ্ছে মিথ্যা থেকে সত্যকে আলাদা করা। কুরআনের শিক্ষায় এই সকল বিষয়ের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। কুরআনের মতে জীবন কোনো ক্রমেই বিচ্ছিন্ন প্রকৃতির হতে পারে না। এর সকল পরিপ্রেক্ষিত আল্লাহ তায়ালার আইন দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। তাই কুরআনের ভাষ্য হচ্ছে মানব জাতি এক আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি।

মানব জাতি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি এবং সৃষ্টি কুলের যে ভালো ও দয়ালু সেই আল্লাহ তায়ালার প্রিয় পাত্র (বায়হাকী, সোয়াব আল ইমান)।

তাই, ইসলামি সমাজের সকল সদস্যকে প্রকৃত ভালোবাসায় বিশ্বাসী হতে হবে। তাকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ তায়ালার চোখে সবাই সমান এবং তার স্রষ্টা শুধুমাত্র সার্বভৌম কোনো সত্তা নয় বরঞ্চ তার জীবিকা ও লালন পালনের উৎস।

আল্লাহ তায়ালা সকল প্রাণীর জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তিনি তা করেছেন পরিমাণ মতো, তাদের চাহিদা ও ক্ষমতা অনুযায়ী। এর অর্থ হলো মানুষের জন্ম একইভাবে হলেও আল্লাহ তায়ালার রিজিকের বিতরণে কিছুটা তারতম্য দেখা দিতে পারে।

এখানে আমরা আপাতত দৃষ্টিতে একটি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। আমরা জেনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা সবার জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু এই বিতরণ ব্যবস্থা সকল ক্ষেত্রেই সমান নয়। কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে সবাইকে যদি সমানভাবে রিজিক বিতরণ করা হতো তাহলে কেউ কাউকে মানত না এবং বিশ্ব কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা দিত। তাই আল্লাহ তায়ালা সূক্ষ্মভাবে তার কিছু প্রাণীকে তুলনামূলকভাবে অধিক রিজিক দিয়েছেন এবং বৈশ্বয়িক মান মর্যাদায় অন্য তুলনায় বেশি দিয়েছেন (সুরা আয যুখরুফ ৪৩ : ৩২)। এতে করে বিশ্বের সকল কর্মকাণ্ড চলমান থাকবে। কিন্তু যাদের তিনি অধিক রিজিক দিয়েছেন তাদের বাড়তি কিছু দায়িত্বও দিয়েছেন। যেমন একজন ধনী ব্যক্তিকে অবশ্যই বয়স্ক ও দুর্বলদের বৈশ্বয়িক সহযোগিতার খেয়াল রাখতে হবে।

একজন ধনীকে আদেশ দেওয়া হয়েছে সে যাতে দরিদ্রকে সাহায্য করে। এই দরিদ্ররাই সমাজে ধনীদেরকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করে থাকে। এই ভাবেই

www.amarboi.org

ইসলামি পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে তার সামাজিক মূলনীতির গোড়াপত্তন ঘটায়।

তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে একে অপরের সহযোগিতা করো না (সুরা মায়েদা ৫ : ২)। কুরআনের এই আয়াতে আমরা ন্যায়পরায়ণতার উপর জোর দিতে দেখছি। তাছাড়া এখানে আত্ম ত্যাগেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

জীবনের সকল সমস্যার সমাধান বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানগুলো আমরা খুঁজে পেতে পারি যদি সঠিকভাবে আত্মত্যাগের মূলনীতি উপলব্ধি করি। মানুষের সামাজিক জীবনকে দুইটি মৌলিকভাবে বিভক্ত করা যায়। একটি হচ্ছে অর্থনৈতিক জীবন আরেকটি হচ্ছে রাজনৈতিক জীবন। প্রথমেই আমরা ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারি।

২. ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলামের নিজস্ব একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে যার রয়েছে নিজস্ব দর্শন। এটি কোনো পুঁজিবাদ নয়, সমাজতন্ত্রও নয়, এমনকি ইউরোপীয় সমাজবাদও নয়। বরঞ্চ এটি হচ্ছে বৈশ্বয়িকতা ও আধ্যাত্মিকতার একটি চমৎকার ভারসাম্য। প্রাক ইসলামি ধর্মগুলোর বিপরীতে, ইসলাম সমাজের সকল চাহিদার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে এবং কিভাবে তা ব্যয় করতে হবে। এই সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থাই বিস্তারিত রূপে বিধৃত রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম যেখানে সম্পদে ঘৃণা করত সেখানে দেখা যায় ইহুদিবাদে সম্পদই হচ্ছে মূল লক্ষ্য তাও আবার জাতিগত ভিত্তিতে। ইহুদি ব্যবস্থায় ইহুদি ও অইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম বিভক্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। তার প্রমাণ হচ্ছে যে কোন ইহুদির পক্ষে অন্যান্য ধর্মের লোকজন থেকে সুদ খাওয়া বৈধ হলেও সে কখনো ইহুদির কাছ থেকে সুদ খেতে পারবে না। খ্রিষ্টান ধর্ম মতে একজন ধনী ব্যক্তির পক্ষে স্বর্গে প্রবেশ করা খুবই কঠিন তাই তার জন্য গুহার জীবনই শ্রেয়। পক্ষান্তরে ইসলাম সকল বৈরাগ্যবাদকে নিষিদ্ধ করেছে এবং প্রাণ চঞ্চল জীবনের উপর জোর দিয়েছে। ইসলাম সর্বাবস্থায় চরমপন্থা বর্জন করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে এবং তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তা প্রতিভাত হয়। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে নৈতিকতা। ইসলামি শিক্ষাগুলো এমনভাবে দেয়া হয়েছে যাতে প্রতিটি মানুষের অন্তরকে জাগ্রত করে এবং তাতে ভ্রাতৃত্বের অনুভূতির সৃষ্টি হয় এবং অন্যের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। একজন প্রকৃত মুমিন ন্যায়পরায়ণ কর্মকাণ্ডের মধ্যেই আনন্দ পায়। সমাজে যদি এই

www.amarboi.org

ধরনের ব্যক্তিগত মনমানসিকতা বিরাজ করে তাহলে সকল সদস্যের কল্যাণ নিশ্চিত হবে এবং সমাজ স্বার্থপরতার দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হবে। আল্লাহ তায়ালার আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য নিশ্চিত করা যাতে সবাই যার যার অধিকার যথাযথভাবে পায়। এখানে কাউকে উপেক্ষা করা হয়নি। ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা। এই ব্যবস্থার চিন্তা ভাবনা শুধুমাত্র নাগরিকদের জীবিকা নিশ্চিত করণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরঞ্চ তাদের জীবন যাত্রাকে সহজ করার ব্যাপারেও ব্যাপক কর্মকাণ্ডের নির্দেশ রয়েছে। তদুপরি প্রতিটি ব্যক্তি অন্যের কল্যাণের জন্য দায়ী বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। মহানবি সা.-এর বাণীতে আমরা এই মূলনীতির নির্যাস দেখতে পাই : প্রতিটি ব্যক্তি অন্যের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং সকলের কল্যাণের দায়িত্ব তার উপরই বর্তায়। এই ভাবেই একজন ধনী ব্যক্তি মুসলিম সমাজে তার ভাইয়ের দারিদ্র ও চাহিদার ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে। তাছাড়া, ধনীরাই শুধুমাত্র সমাজের সকল সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখতে পারে না (সুরা হাশর ৫৯ : ৬০)। ধনীর প্রাচুর্যকে মহৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে হবে এবং ইসলামে বাণিজ্য, আমদানী ও রপ্তানীর মাধ্যমে সম্পদের বৃদ্ধিকেও উৎসাহিত করা হয়েছে (সুরা নিসা ৪ : ২৯)।

অর্থনৈতিক দুরাবস্থার জন্য মানব জাতির স্বার্থপরতাকেই দায়ী করা যায়। ইসলাম কার্যকর বিভিন্ন বিধি বিধানের মাধ্যমে এই রূপকে সামাল দেওয়ার শিক্ষা দেয়। ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুদ ও মজুদদারী নিষিদ্ধ। মানুষকে বাণিজ্যিক লেনদেনে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে; তার আয় ও ব্যয় হতে হবে ইসলামি দিক নির্দেশনা অনুযায়ী। একজন মুসলমান আল্লাহ তায়ালার প্রতি ও সমাজের প্রতি বিভিন্ন দায়িত্বে বাধা যা সে কখনো উপেক্ষা করতে পারে না। ইসলামি বিধি বিধানকে কার্যকর করার জন্য আল্লাহ তায়ালা পার্থিব জীবনে ও আখিরাতে অনেক প্রতিদানের কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে তা যদি অমান্য করা হয় তাহলে কঠিন শাস্তির ব্যাপারেও সাবধান করে দিয়েছেন। এই প্রতিদান ও শাস্তির ভীতি ব্যক্তি মনে ন্যায়পরায়নতার সঞ্চার করে যা তাকে আত্মত্যাগে আরো উৎসাহিত করে।

আমরা যদি গভীরভাবে ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে এটাই প্রতিভাত হবে মহানবি সা. অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো আত্মত্যাগের মাধ্যমেই সমাধান করেছেন এবং এই ব্যাপারে পূর্বে বিশদ আলোচনা করেছি। এই ক্ষেত্রে মদিনার আনসার ও মক্কার মুহাজিরগণের ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধন আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারে।

www.amarboi.org

মানব রচিত অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটু আসমানী ধারার এবং সম্পূর্ণরূপে কুরআন ও মহানবি সা.-এর সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে মানুষকে উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআন শরীফে দরিদ্র ও চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে বৈশ্বয়িকভাবে সাহায্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সমাজে যারা অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত কুরআন তাদের ব্যাপারে এতটাই সংবেদনশীল যে, সমাজের স্বচ্ছল সকল ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার প্রাণীর প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের এই দয়ার প্রতিফলন কুরআন দান দক্ষিণার মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখতে চেয়েছে। দরিদ্রদের চাহিদা পূরণ অথবা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ :

তোমরা কখনো নেকী অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা এমন কিছু আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করবে যা তোমরা ভালোবাসা; মূলত তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, আল্লাহ তায়ালা তা জানেন। ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দাবি হচ্ছে সমাজের সকল সদস্যদের মধ্যে সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ বিতরণ। এই ব্যবস্থা মতে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সব কিছুর স্রষ্টা এবং সম্পদের মালিক তিনি। এমনকি উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য মানুষ যে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ করে তাও আল্লাহ তায়ালার অনুদান। তাই আল্লাহ তায়ালার মানুষ যা কিছু উৎপাদন করে তার একটি অংশ দাবি করে এবং ঘোষণা করেন তার এই অংশ বিতরণ হবে যারা চাহিদাগ্রস্ত। তাদের জন্যই এই অংশ বরাদ্দকৃত যারা সকল চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের জীবনের মৌলিক বৈশ্বয়িক চাহিদাগুলো মেটাতে পারছে না। এই ব্যবস্থা যাকাতের বাইরে ধনীদেরকে প্রয়োজনে আরো দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করতে বলে (সুরা বাকারা ২ : ১৯)। সম্পদের ব্যবহার হতে হবে উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং তা গুটি কয়েক জন ধনী কুক্ষিগত করে রাখতে পারে না (সুরা হাশর ৫৯ : ৭)। নিম্নোক্ত আয়াত থেকে আমরা কুরআনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারি :

> (এবং এই যে সম্পদ) যা আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দিয়েছেন, তা দিয়ে পরকালের কল্যাণ তালাশ করো এবং দুনিয়া থেকে সম্পদের যে (আসল) অংশ (পরকালে নিয়ে যেতে হবে) তা ভুলে যেয়ো না এবং আল্লাহ তায়ালা যেভাবে (ধন সম্পদ দিয়ে) তোমার ওপর মেহেরবাণী করেছেন, তুমিও তেমনি (তাঁর পথে তা ব্যয় কর তাঁর বান্দাদের ওপর) দয়া করো, (সম্পদের বাহাদুরী দিয়ে) যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে যেয়ো না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ফাসাদী লোকদের ভালোবাসেন না (সুরা কাসাস ২৮ : ৭৭)।

www.amarboi.org

এই আয়াত থেকে যে অর্থনৈতিক শিক্ষা গুলো আমরা পেতে পারি সেগুলো হচ্ছে :

১. আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সম্পদ দিয়েছেন বিধায় তিনিই প্রকৃত মালিক;

২. মানুষের সম্পদের মূল লক্ষ্য হবে আখিরাতের কল্যাণ। অর্থাৎ সে তার সম্পদ ব্যয় করবে ন্যায় কাজ ও দানের জন্য। তার এই সকল কর্মকাণ্ড আখিরাতে কল্যাণ বিধান করবে;

৩. মানুষ পার্থিব জীবনকে উপেক্ষা করতে পারবে না। অর্থাৎ বৈধ ও সৎ পন্থা অবলম্বন করে তাকে রুজি রোজগারে পরিশ্রমী হতে হবে;

৪. আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দিয়ে তার যেমন ভালো করেছেন তেমনি অন্যের কল্যাণেও তাকে নিয়োজিত হতে হবে। অর্থাৎ মানুষকে সমাজের প্রতি যে দায়িত্ব আছে তা পালন করতে হবে। তাই সম্পদ কুক্ষিগত না করে চাহিদাসম্পন্ন ভাইদের মাঝে তা বিতরণ করতে হবে;

৫. আল্লাহ তায়ালার জমিনে সে কোনো ধরনের অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। অর্থাৎ তাকে অন্যায় ও অসৎ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে। তেমনি সুদ, অবৈধ লেনদেন, প্রতারণা ও মিথ্যাচারের মতো গর্হিত কর্মকাণ্ড থেকেও বিরত থাকতে হবে।

ক. অর্থনৈতিক আমানতের মতবাদ

দরিদ্রদের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে ধনীদেরকে জবাবদিহিতা করতে হবে (সুরা হাদীদ ৫৭ : ৭), কেননা বঞ্চিত ও দরিদ্রদের তাদের সম্পদের উপর অধিকার রয়েছে (সুরা যারিয়াত ৫১ : ১৯)। তাই যারা সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখে এই অধিকারকে অবজ্ঞা করে তাদের জন্য রয়েছে চরম শাস্তি (সুরা তাওবা ৯ : ৩৪), পক্ষান্তরে তারা যদি উদার হয় এবং দানমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পদ বিতরণ করে তাদের জন্যও রয়েছে বিশাল প্রতিদান (সুরা বাকারা ২ : ২৭৪)। তাই বলা যায়, দানকে ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং যারা অনুদানমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের কোনোক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার ব্যাপারেও নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

ধনীরা যে তাদের সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কাছে শুধুমাত্র আমানতদারের দায়িত্ব পালন করবে সে হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে এই আমানতদারী সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা। তাই রাষ্ট্র প্রয়োজনে ধনীদের উপর যাকাতের বাইরেও কর বসাতে পারে। সামাজিক নিরাপত্তার যদি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কোনো

www.amarboi.org

ঘাটতি দেখা যায় তাহলে রাষ্ট্র এই ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে[২]। আমরা আগেও বলেছি ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদও নয় সমাজতন্ত্র নয়। কেননা ইসলাম এই দুই মতবাদের চরম মনোভাব পরিহার করে একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। মূলত কুরআনে মুসলমানদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে মধ্যপন্থি ভারসাম্যপূর্ণ জাতি হিসেবে :

> এই ভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থি মানব দলে পরিণত করেছি, যেন তোমরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের উপর সাক্ষী হয়ে থাকতে পার এবং রসুলও তোমাদের উপর সাক্ষী হয়ে থাকতে পারে (সুরা বাকারা ২ : ১৪৩)।

মানুষ যখন সম্পদ অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চর্চা করবে তখন তাকে উচ্চতর নৈতিক বিধি বিধান মেনে চলতে বলা হয়েছে। মহানবি সা. বলেন সম্পদ অর্জনে মানুষকে হতে হবে মধ্যপন্থি এবং তাকে সর্বদা হালাল অবলম্বন করতে হবে আর অবৈধ কর্মকাণ্ড বর্জন করতে হবে[৩]।

ইসলাম সৎ জীবনযাপনের উপর ব্যাপক জোর দিয়েছে তাই আয় ও ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম বেধে দিয়েছে যা মানুষকে পরিণত জীবন যাত্রার মান বজায় রাখতে সহায়তা করবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানব জাতিকে এই আইনগুলো কঠোরভাবে পালন করতে হবে। সে যেখানে চায় সেখানেই ইচ্ছামত খরচ করতে পারে না, কেননা তার মনে রাখতে হবে যে তার সব কিছুরই প্রকৃত মালিক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। যদি আল্লাহ তায়ালার সহায়তা না থাকে তাহলে উৎপাদন প্রক্রিয়া তার সকল কর্মকাণ্ডই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। মানুষ শুধুমাত্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারে কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে সে একেবারেই অসহায়। পক্ষান্তরে ধ্বংস যজ্ঞে পৃথিবীতে মানব জাতির জুড়ি মেলা ভার। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মানুষের এই বৈশিষ্ট্যগুলো মেনে নিয়েছে। মানুষ শুধু বিভিন্ন উপাদানকে একত্রিত করে তাকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দেয় যার কারণে ঐ বস্তুর মধ্যে এক ধরনের নতুন উপযোগিতার সৃষ্টি হয় মাত্র।

আল্লাহ তায়ালা হচ্ছে সব কিছুর স্রষ্টা এবং আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবই তার মালিকানা (সুরা নাহল ১৬ : ৫২)। তাই তার সৃষ্টির প্রতি মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে আমানতদারী। তাকে বলা হয়েছে দরিদ্র ও বঞ্চিতদেরকে আমানত দেওয়া সম্পদের কিছু অংশ ব্যয় করতে। দরিদ্রদেরকে যা কিছু দেওয়া হয় সেটি মূলত

---

[২] M. Muslehuddin, Economics and Islam, p.45

[৩] ইবনে মাজাহ, সুনান, ২/৭২৫

www.amarboi.org

মানুষের দান নয় বরঞ্চ ধনীদের সম্পদে এটি তাদের বৈধ অধিকার (সুরা যারিয়াত ৫১ : ১৯)। এটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার প্রবর্তিত অর্থনৈতিক আমানতদারীর অর্থ এবং এই ভাবেই আল্লাহ তায়ালা সবার জন্য রিজিক বিধানের প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ব্যবস্থা করেছেন।

খ. ন্যায়বিচার ও সততা

ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লেনদেনে মূল ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা ও সততা। ধোকাবাজী, অসৎ পন্থা ও অন্যান্য গর্হিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা এই ব্যবস্থায় খুবই অনৈতিক বিষয় ও পাপের কাজ। ইসলাম যে একক ভ্রাতৃত্বের কথা বলে তাও একে অপরকে শোষণ করতে বারণ করে। কেউ ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসিতার জন্য সম্পদ ব্যবহার করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে :

> হে মানুষ, তোমরা যারা ইমান এনেছো, কখনো তোমরা একে অপরের ধন সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, ব্যবসা বাণিজ্য যা করবে তা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতেই করবে (সুরা নিসা ৪ : ২৯)।

সম্পদের যেমন অপচয় করা নিষেধ তেমনি বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কল্যাণে সেগুলো বৃদ্ধি করতে বলা হয়েছে। উপরিল্লিখিত আয়াতে যে পারস্পরিক সমঝোতার কথা বলা হয়েছে তাতে আমরা যে সহযোগিতার নির্দেশ দেখতে পাই তার মাধ্যমে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের নেতিবাচক গুণগুলো আমরা পরিহার করতে পারি। এই আয়াতের শেষে আরো উল্লেখ রয়েছে এবং তোমরা একে অপরকে হত্যা করো না। শেষ অংশের অর্থ হচ্ছে তোমরা একে অপরকে শোষণ, নির্যাতন ও অসম প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষতি করো না। আল্লাহ তায়ালার বিধান মানব জাতিকে আয় ও ব্যয়ে নৈতিক বিধান মেনে চলার আদেশ দিয়ে পুঁজিবাদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মজুতদারী (সুরা হুমাযা ১০৪ : ২), সুদ (সুরা বাকারা ২ : ২৭৫) নিষিদ্ধ। ভোগ বিলাসিতা যেমন নিষিদ্ধ (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ২৬) তেমনি ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ২৯)[৪]। ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাতের মতো বিভিন্ন করমুখী খাতের মাধ্যমে সম্পদের সম বন্টনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যাকাতের অর্থ হচ্ছে বাড়তি সম্পদ থেকে দরিদ্রদের মাঝে অনুদান হিসাবে কিছু বিতরণ করা। তাছাড়াও ইসলামি উত্তরাধিকার আইনে যে, বিতরণ ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাই তাতেও সমতা লক্ষ্য করা যায়। কেউ যদি কোনো ধরনের উত্তরাধিকারী ছাড়া মৃত্যুবরণ করে

www.amarboi.org

তার সম্পদ রাষ্ট্র পাবে। এই ব্যবস্থাগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, একটি মুসলিম আত্মাকে আত্মত্যাগের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে মুসলিম সমাজে সাম্য বিরাজ করে।

গিভ বলেন, পশ্চিমা বিশ্বেও ইসলাম দুইটি ব্যবস্থার বাড়াবাড়ির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেছে। এটি যেমন ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে তেমনি রুশ সমাজতন্ত্রের সামরিকীকরণও প্রত্যাখান করে। বর্তমান ইউরোপে যেমন উন্নয়নের নামে জনগণ অর্থনৈতিকভাবে জরাগ্রস্ত তেমনি রাশিয়ার অবস্থাও তাই। প্রফেসর মেসিগনন ইসলামের সামাজিক নৈতিকতার ব্যাপক প্রসংশা করেন : ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই সাধারণ নাগরিকদের মাঝে সম্পদের সুষ্ঠু বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং এই সাম্যের উৎস হচ্ছে সমাজের সম্পদ। অবাধ বাণিজ্যের বিরোধী এই ব্যবস্থা এখানে রাষ্ট্রীয় সুদযুক্ত ঋণ, ব্যাংক কেন্দ্রিক পুঁজিবাদ, প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের উপর পরোক্ষ কর ইত্যাকার বিষয় প্রত্যাখাত। তবে এখানে পিতা ও স্বামীর যে ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকার রয়েছে এবং বাণিজ্যিক পুঁজি সঞ্চয়ের যে অধিকার রয়েছে তার স্বীকৃতি দিতে চেয়েছে। এই ব্যবস্থা হচ্ছে বুর্জোয়া পুঁজিবাদ ও বলসেভিক কমিউনিজম এর মাঝামাঝি একটি ব্যবস্থা[৫]।

৩. ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা

রাজনীতি হচ্ছে এমন একটি বিদ্যা যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রশাসন, সংগঠন ও আকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ইসলামি রাষ্ট্রকে ইসলামি আধ্যাত্মিকতার সাথে একাত্ম হতে হবে। তবে এটি অবশ্যই একটি বাস্তবমুখী জীবনব্যবস্থা। ইসলাম আল্লাহ তায়ালার নিয়ামক থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলে না। বরঞ্চ নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থেকে তা উপভোগ করতে হবে। পূণ্য বলতেই বাড়াবাড়ির মধ্যে সমতা ও ভারসাম্য বিধান করাকেই বুঝায়।

সৎ জীবনযাপনই হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য তাই এখানে সরকারি ব্যবস্থা বাহ্যিক আকৃতির উপর বেশি জোর দেওয়া হয় না। এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আইনকে কার্যকর করা। ইসলামি রাষ্ট্র প্রধানের উপর যে দায়িত্বগুলো বর্তায় সেগুলো শুধু আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি হিসেবে, তাই তিনি কখনো স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না। স্বয়ং তাকেও আল্লাহ তায়ালার আইন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। এই প্রসঙ্গে ফিশার যথাযথই বলেছেন : ইসলামি ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আগে আইনের অবস্থান এবং রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে আইন বলবৎ করা।

---

[5] Gibb, Whither Islam, p. 379

www.amarboi.org

রাষ্ট্র যদি কার্যকরভাবে আইন বলবৎ করতে ব্যর্থ হয়। তাহলে তার কোনো বৈধতা থাকে না। রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে খলিফার মূল দায়িত্ব আইনের প্রয়োগ। ইসলাম যেমন একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা তেমনি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও বটে। প্রাক ইসলামি ধর্মগুলো রাজনৈতিক সংগঠনের অধ্যয়নের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়নি। বরঞ্চ তারা শুধু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল বেশি। ইসলামের কৃতিত্ব ছিল এটাই যে, ধর্মীয় বিধানের পাশাপাশি বাস্তবিক জীবন বিধানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি শুধু স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কের দিক নির্দেশনা নির্ধারণ করে না বরঞ্চ মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কও নির্ণয় করে। এটি স্পষ্ট যে, সরকারি রূপরেখার কোনো বিস্তারিত বিবরণ আল-কুরআন দিয়ে যায়নি। তেমনি নির্বাচন ও প্রশাসন সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যাগুলোরও কোনো উল্লেখ নেই কেননা স্থান ও কাল ভেদে এগুলোর মধ্যে ব্যাপক তারতম্য ও বৈচিত্র থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কুরআনের পাশাপাশি এই সকল সমস্যা সমাধানে রসুল সা.-এর সুন্নাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একজন খলিফার দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার আইনকে কার্যকর করা এবং ইসলামি রাষ্ট্রের সার্বভৌম সত্তা হচ্ছেন এই আল্লাহ তায়ালা। আরবি খলিফা শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিনিধি যার কিছু প্রয়োগ করার মতো। তাকে আল্লাহ তায়ালার নীতি অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা চর্চা করতে হবে। এই প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে এক ধরনের দায়িত্ব যা মানুষ ছাড়া আল্লাহ তায়ালার অন্য কোনো সৃষ্টি পায়নি : অবশ্যই আমি (কুরআনের এ) আমানত (একসময়) আসমানসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম, তারা একে বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো, সবাই এতে ভীত হয়ে গেলো, অবশেষে মানুষই তা বহন করে নিলো; নিঃসন্দেহে সে (মানুষ) একান্ত যালেম ও (এ আমানত বহন করার পরিণাম সম্পর্কে) একান্তই অজ্ঞ (সুরা আহযাব ৩৩ : ৭২)। ইবনে আব্বাস রা.-এর মতে আমানত হচ্ছে মানুষের উপর অর্পিত দায় দায়িত্ব। কোনো ব্যক্তিকে যখন আমানত দেওয়া হয় তখন যে তাকে আমানত দেয় সে আশা করে আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করা হবে এবং এর প্রয়োগও হবে যথাযথ। এর অর্থ হলো এটি যে মানুষ আল্লাহ তায়ালার দেওয়া বিধান অনুযায়ী তার দায়িত্বগুলো পালন করবে।

ক. আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব

আল্লাহ তায়ালা হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রের সার্বভৌম সত্তা। আইন বিধান জারি করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার (সুরা ইউসুফ ১২ : ৪০); তিনি হচ্ছেন উত্তম ফায়সালাকারী (সুরা ইউসুফ ১২ : ৮০)। তিনি হচ্ছেন সেই মহান সত্তা যার হাতে রয়েছে আসমান ও জমিনের কর্তৃত্ব। সার্বভৌমত্বের ইংরেজি Sovereignty এসেছে ল্যাটিন শব্দ Supernuus থেকে যার অর্থ হচ্ছে সুপ্রিম। সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা

www.amarboi.org

বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে। যেমন এর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অবিবাদ্য ও সর্বময় কর্তৃত্ব। বার্জেস বলেন, এটি হচ্ছে ব্যক্তির উপর আসল, অসীম ও একক কর্তৃত্ব এবং এই কর্তৃত্ব প্রজাদের সকল সংগঠনের উপরও প্রযোজ্য। জন অস্টিন এই প্রসঙ্গে বলেন, এটি হচ্ছে মানব জাতির উপর এক ধরনের শ্রেষ্টত্ব যার উর্ধ্বতন কারো প্রতি আনুগত্যের চাইতেও অন্য কিছু এবং যে নির্দিষ্ট একটি সমাজের কাছ থেকে অভ্যাসগতভাবে কিছু আনুগত্য উপভোগ করে থাকেন। কিন্তু মানবিক সংজ্ঞার আলোকে আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব বুঝা যাবে না।

আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব উপরিল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে আরো ব্যাপক। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞাগুলো নিয়ে তা নির্ণয় করা সম্ভব। আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়েছে রব বা প্রতিপালক শব্দটি। তিনি একাধারে যেমন সার্বভৌম, তেমনি রিজিকদাতা, লালন কর্তা, পালন কর্তা, পরিচালক ও বিধান দাতা। দুনিয়ার সার্বভৌম ব্যক্তিদের সাথে তার তুলনা চলে না, তেমনি ইসলামি রাষ্ট্রও গণতন্ত্রের মতো কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয় যাতে জনগণকেই সার্বভৌমত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি এমন এক রাষ্ট্রে বিশ্বাসী যা আল্লাহ তায়ালার শাসন দ্বারা পরিচালিত এবং রাষ্ট্রের উপর এই আইনের প্রাধান্য রয়েছে। এই আইনের মূল ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা এবং স্বভাবতই আইন যেমন হবে রাষ্ট্রও তার মতোই হবে[৬]।

খলিফা কিংবা ইসলামি রাষ্ট্র প্রধানের মূল দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বিধানকে কার্যকর করা এবং ইসলামি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে তিনি নিজেও এই আইন মেনে চলবেন। সাধারণত খেলাফত শব্দটির দ্বারা শাসন করার অধিকারকে বুঝায়। কিন্তু এটি হচ্ছে সমাজের সদস্যদের সেবা করার দায়িত্ব মাত্র। একজন খলিফা আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহিতার জন্য দায়বদ্ধ এবং মানুষের কল্যাণ বিধান করাই তার উদ্দেশ্য হতে হবে। প্রজাদের অধিকার নিয়ে কোনো ধরনের প্রতারণা করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশত থেকে বঞ্চিত করবেন (বুখারি)। হাদিসে আছে যার কেউ নেই খলিফা তার অভিভাবক[৭]। সামাজিক নিরাপত্তাই হচ্ছে তার মূল দায়িত্ব। অর্থাৎ তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে রাষ্ট্রের কেউ যেন অবহেলার শিকার না হয় এবং জীবনের সকল প্রয়োজন যাতে সে মেটাতে পারে সে ব্যবস্থা করা। এই প্রসঙ্গে খলিফা ওমর বলেন, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের উপর প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির অধিকার রয়েছে, এই অধিকার সে চর্চা করুক আর না করুক[৮]।

---

[৬] M. Muslehuddin, Economics and Islam, p.-20

[৭] আবু দাউদ, সুনান, ২/৪৮১

[৮] আবু উবাইদ, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃ. ৩০৮

www.amarboi.org

রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে যে কোনো নাগরিকের অধিকার রয়েছে খলিফাকে প্রশ্ন করার। খলিফা ওমরকে অধীনস্থ একজন বিচারকের মুখোমুখি হতে হয়েছে একটি অভিযোগের জবাব দিতে। তেমনি হযরত আলী রা. একজন ইহুদির বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর রায় ইহুদির পক্ষে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে ইহুদি শিকার করে নেয় যে, মিথ্যা সাক্ষীর মাধ্যমে সে মামলা জিতেছে এবং সে জন্য সে লজ্জিত এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

মদিনায় খেলাফতের দপ্তর বুঝে পাওয়ার পর আবু বকর রা. যে বক্তব্য দিয়েছেন তাও লক্ষ্য করার মতো। তিনি প্রথম বারের মতো জনসম্মুখে এসে বলেন :

হে আমার সাথীগণ! আমি আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী রেখে বলছি এই দপ্তরের দায়িত্ব নেওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না; এটি পাওয়ার জন্য কখনো লালায়িত ছিলাম না। গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে কখনো আমি এই দায়িত্ব পাওয়ার জন্য দোয়া করিনি। তবে অরাজকতা যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে জন্য আমি এই বুঝা কাধে নিয়েছি। তাছাড়া নেতৃত্বে কোনো ধরনের আনন্দ নেই। আমার কাধে যে বুঝা এখন রয়েছে সেটি অনেক ভারী মনে হচ্ছে তাই আল্লাহ তায়ালার সাহায্য আমি এই দায়িত্ব পালন করতে পারব না।

আপনারা আমাকে আপনাদের নেতা বানিয়েছেন, যদিও কোনো মতেই আমি আপনাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নই। আমি যদি সঠিক পথে চলি আমাকে অবশ্যই সহযোগিতা করবেন, ভুল করলে আমাকে শোধরাবেন; যত দিন আল্লাহ তায়ালা ও তার রসুলের আদেশ পালন করে যাব তত দিন আমাকে মান্য করুন; কিন্তু পথচ্যুত হলে আমাকে আপনারা পরিত্যাগ করবেন[৯]।

মহানবি সা. শাসন কার্যে যেমন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন তেমনি তিনিও সবার সাথে পরামর্শ করতেন। এমনকি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাহাবা ছাড়াও বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদের সাথেও পরামর্শ করতেন। এবং বিষয়সমূহে আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১৫৯)। এই পরামর্শই হচ্ছে ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ মূলনীতি। এবং তারা তাদের বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে (সুরা আশ শুরা ৪২ : ৩৮)। যদি তাই হয় তাহলে ইসলামি রাষ্ট্রকে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। তবে নিরেট গণতন্ত্র বলা যাবে না। কেননা এই ব্যবস্থার মতো ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণকে সার্বভৌমত্ব দেয়া হয়নি। তাছাড়া এটি কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্র নয় যে

[৯] Tabari, Annals of 11th Century, p. 1948

www.amarboi.org

এখানে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে জনগণের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব ফলানো যাবে। ইসলাম কোনো মতেই এই ধরনের কর্তৃত্বমুখী ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস করে না। ইসলামি রাষ্ট্রকে বড় জোর আল্লাহ তায়ালার রাজ্য হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে, যেখানে আল্লাহ তায়ালার আইনের প্রয়োগ হওয়ার কারণে সামাজিক সাম্য নিশ্চিত হয়।

লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইসলামি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একক কোনো পরামর্শের ধরণ নেই। স্থান ও কাল অনুযায়ী নির্বাচনের ধরন, পরামর্শ সভার সদস্য সংখ্যা এবং তাদের প্রতিনিধিত্বের মেয়াদকাল নির্ধারিত হবে। পরামর্শ এমনভাবে করতে হবে যাতে জনগণের সুষ্ঠু প্রত্যায়ন পাওয়া যায় এবং সিদ্ধান্তে যাতে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটে।

খ. ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জাতিকে সৎ একটি জীবন উপহার দেওয়া। আল্লাহ তায়ালার বিধান যদি মেনে চলা হয় তাহলেই সবার পক্ষে সৎ জীবনযাপন করা সম্ভব। কুরআন হচ্ছে নৈতিক বিধানের একটি উৎস যা মানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত করে যা মানব জাতির জন্য চূড়ান্ত কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজ থেকে মন্দ দূরীভূত হবে এবং পূণ্য সেখানে বিরাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজে সৎ জীবনযাপন করার সুযোগ হবে না। পুণ্য বলতে বুঝায় নৈতিক উৎকর্ষতা এবং আল্লাহ তায়ালার বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনাকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই জানেন আসলে ভালো কোনটি। প্লেটো তার রিপাবলিক গ্রন্থে যে মতবাদগুলো দিয়ে গেছেন তাতে দেখা যায় প্রজাদের সবাইকে দার্শনিক রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। এর অর্থ হলো সেই একমাত্র কর্তৃপক্ষ যে রাষ্ট্র ও মানুষের কল্যাণ কোথায় তা সম্যক অবগত[১০]। কিন্তু একজন দার্শনিক রাজা কিভাবে সকল কল্যাণ সম্বন্ধে জানতে পারেন যখন কিনা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায় সমূহে আলোচনা করে দেখেছি দর্শন কখনো প্রকৃত জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। দর্শনের মূল ভিত্তি হচ্ছে যুক্তি। আর এটি ব্যক্তি ও স্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। প্লেটো যে ধারণা রাষ্ট্র সম্বন্ধে দিয়ে গেছেন সেখানে দেখা যায় তার আদর্শ রাষ্ট্র থেকে আইনকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে। এই আইনহীন মতবাদ অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রীয় মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি যে রাজনৈতিক দর্শন দিয়ে

[১০] Sabine, A History of Political Theory, p.68

www.amarboi.org

গেছেন তাতে আইনের নৈতিক মূল্য রয়েছে এবং এটি হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত সার্বভৌম সত্তা। তার মতে সবচাইতে জ্ঞানী শাসকও আইনকে বাদ দিতে পারে না। কেননা আইনের কিছু নৈর্ব্যক্তিক গুণ রয়েছে যা একজন মানুষ যত ভালোই হোক না কেন তা অর্জন করতে পারবে না। একটি রাষ্ট্র এক হয়ে টিকে থাকে শুধুমাত্র আইনের সোনালি সূতার বাধনে।

অ্যারিস্টটলের মতে আইন হচ্ছে, এমন যুক্তি যা স্বভাবজাত চাহিদা দ্বারা প্রভাম্বিত নয়[১১]। এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যুক্তির উপর জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু যুক্তি হচ্ছে এক ধরনের ধারণা মাত্র যা কখনো সত্যের জায়গা দখল করতে পারে না। সত্য মূলত আল্লাহ তায়ালা তার রসুলের উপর যা নাযিল করেছেন তার মধ্যেই নিহীত।

> তিনি দেখা অদেখা সব কিছুই জানেন, তিনি মহান, তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদাবান (সুরা আর রা'দ ১৩ : ৯);
>
> তিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু (সুরা আস সাজদাহ ৩২ : ২৬);
>
> আসমান জমিনে যা কিছু আছে তার সম্বন্ধে তিনি জানেন (সুরা আলে ইমরান ৩ : ২৯);
>
> তিনি অদৃশ্য জগতের জ্ঞানী, তার সেই অদৃশ্য জগতের কোনো কিছুই তিনি কারো কাছে প্রকাশ করেন না, অবশ্য তার রসুল ছাড়া- যাকে তিনি বাছাই করে নিয়েছেন কিন্তু তার আগে পিছেও তিনি প্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছেন (সুরা জিন ৭২ : ২৬- ২৭)।

এই ভাবেই মহানবি সা.-এর কাছে বিভিন্ন রহস্য উন্মোচিত হতে থাকে। তাই বলা যায়, আল্লাহ তায়ালার আইন হচ্ছে তার উপহার, এটি কোনো মানব যুক্তির আবিষ্কার নয়। অতএব এটি পারে মানব জাতিকে সঠিক পথ দেখাতে এবং সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে। তাহলে এই সমাজ হবে ন্যায়পরায়ণতার আধার এবং রাষ্ট্র তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এই যুগের জন্য কুরআন আমাদের যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়েছে তা রাষ্ট্রনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

---

[১১] Sabine, op. cit. p.94

www.amarboi.org

গ. রাষ্ট্র নীতির বিভিন্ন দিক নির্দেশনা

নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে কুরআনে রাষ্ট্র নীতির দিক নির্দেশনাগুলো বিধৃত করা হয়েছে : (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ২৩-৩৯)। এই আয়াতগুলো মহানবি সা.-এর মক্কী জীবনের শেষ দিকে নাযিল হয়। এর পরই মাদানী জীবনের সূচনা হতে থাকে। আয়াতগুলো হলো :

১. তোমার মালিক আদেশ করেছেন, তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কারো এবাদাত করো না এবং তোমরা (তোমাদের) পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো; তাদের একজন কিংবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাহলে তাদের (সাথে) বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং কখনো তাদের ধমক দিয়ো না, তাদের সাথে সম্মানজনক ভদ্রজনোচিত কথা বলো।

২. অনুকম্পায় তুমি ওদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, হে (আমার) মালিক, ওদের প্রতি (ঠিক সেভাবেই) তুমি দয়া করো, যেমনি করে শৈশবে ওরা আমাকে লালন পালন করেছিলো।

৩. (আসলে) তোমাদের মালিক তোমাদের অন্তরসমূহের ভেতরে যা আছে তা ভালো করেই জানেন; তোমরা (সত্যিই) যদি ভালো মানুষ হয়ে যাও তাহলে (আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করে দেবেন, কেননা) যারা তাওবা করে তিনি তাদের (গুনাহ) মাফ করে দেন।

৪. আত্মীয় স্বজনকে তাদের (যথার্থ) পাওনা আদায় করে দেবে, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরদেরও (তাদের হক আদায় করে দেবে), কখনো অপব্যয় করো না।

৫. অবশ্যই অপব্যয়কারীরা হচ্ছে শয়তানের ভাই; আর শয়তান হচ্ছে তার মালিকের বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৬. যদি তোমাকে কখনো (এ) হকদারদের বিমুখ করতেই হয় (এ কারণে যে), তাকে দেওয়ার মতো সম্পদ তোমার কাছে নেই এবং তুমি তোমার মালিকের কাছ থেকে অনুগ্রহ কামনা করছো, যা পাওয়ার তুমি আশাও রাখো- তাহলে একান্ত নম্রভাবে তাদের সাথে কথা বলো।

৭. কখনো নিজের (ব্যয়ের) হাত নিজের গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না (যাতে কার্পণ্য প্রকাশ পায়), আবার তা সম্পূর্ণ খুলেও রেখো না, অন্যথায় (বেশি খরচ করার কারণে) তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে যাবে।

৮. তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন আবার যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। তিনি নিজের বান্দাদের অবস্থা জানেন এবং তাদেরকে দেখছেন।

www.amarboi.org

৯. তোমরা তোমাদের সন্তানদের কখনো দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না; আমি (যেমন) তাদের রিযিক দান করি (তেমনি) তোমাদেরও কেবল আমিই রিযিক দান করি; (রিযিকের ভয়ে) তাদের হত্যা করা (হবে) অবশ্যই একটি মহাপাপ।

১০. তোমরা ব্যভিচারের ধারের কাছেও যেয়ো না, নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে একটি অশ্লীলকাজ এবং নিকৃষ্ট পথ।

১১. কোনো জীবনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, যা আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন; যে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় আমি তার উত্তরাধিকারীকে অধিকার দিয়েছি (সে চাইলে রক্তের বিনিময় দাবি করতে পারে), তবে সে যেন হত্যার (প্রতিশোধ নেওয়ার) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে; কেননা (হত্যার মামলায় যে মজলুম) তাকেই সাহায্য করা হবে।

১২. এতিমদের মাল সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে এমন কোনো পন্থা যা (এতিমের জন্যে) উত্তম (বলে প্রমাণিত) হয় তা বাদে- যতক্ষণ পর্যন্ত সে (এতিম) তার বয়োপ্রাপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয় এবং তোমরা (এদের দেওয়া যাবতীয়) প্রতিশ্রুতি মেনে চলো, কেননা (কেয়ামতের দিন এ) প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে (তোমাদের) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

১৩. কোনো কিছু পরিমাপ করার সময় মাপ কিন্তু পুরোপুরিই করবে, আর (ওজন করার জিনিস হলে) দাঁড়িপাল্লা সোজা করে ধরবে; (লেনদেনের ব্যাপারে) এই হচ্ছে উত্তম পন্থা এবং পরিণামের (দিক থেকে) এটাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট।

১৪. যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, (অযথা) তার পেছনে পড়ো না; কেননা (কেয়ামতের দিন) কান, চোখ ও অন্তর, এ সব কয়টির (ব্যবহার) সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে।

১৫. আল্লাহ তায়ালার যমীনে (কখনোই) দম্ভভরে চলো না, কেননা (যতোই অহংকার করো না কেন), তুমি কখনো এ জমিন বিদীর্ণ করতে পারবে না, আর উচ্চতায়ও তুমি কখনো পর্বত সমান হতে পারবে না।

১৬. (হে নবি), এগুলো সবই (খারাপ) এর মন্দ দিকগুলো তোমার মালিকের কাছেও একান্ত ঘৃণিত।

১৭. তোমার মালিক ওহির মাধ্যমে যে প্রজ্ঞা দান করেছেন এ (সব) হচ্ছে তার অন্তর্ভুক্ত, যা তোমার মালিক ওহির মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।

এই আয়াতগুলো থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দায়িত্বকে পাশাপাশি রাখা হয়েছে। এখানে যে, মধ্যপন্থা ও সংযমের কথা বলা হয়েছে তা

www.amarboi.org

থেকেই ইসলামি ব্যবস্থায় অর্থনীতির সাথে রাজনীতির সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। এই আদর্শের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠবে তা বর্তমান বিশ্বের কোনো সরকারি ব্যবস্থার সাথে মিলবে না। এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার নৈতিকতা অদ্বিতীয়।

উপরিল্লিখিত আয়াত সমূহে যে নৈতিক বিধানগুলো বিধৃত হয়েছে তা মুসা আ. এর বেকালফ বা দশটি আদেশ থেকে আরো উন্নত। এখানে মানুষের অন্তরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং দরিদ্রদের ও অসহায়দের বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে। চাহিদাসম্পন্ন দরিদ্র ব্যক্তিদেরও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই আয়াতগুলো শুরু হয় এক আল্লাহ তায়ালার ইবাদত দিয়ে যা ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সাম্যের পরিচয় বহন করে। এই একাত্মবাদের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা, যিনি সবচাইতে দয়ালু ও অনুকম্পা সম্পন্ন তার সার্বভৌমত্বের অধীনে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

বর্তমান যুগে আমরা সরকারগুলোর যে রূপরেখা দেখতে পাই তার আদি উৎস হচ্ছে প্লেটোর স্বৈরশাসন ও অ্যা রিস্টটলের সংবিধানবাদ। প্লেটোর মতে স্বৈরশাসন কিংবা একচ্ছত্র আধিপত্যই হচ্ছে সরকারের আদর্শ রূপ। তবে অ্যারিস্টটল তার এই ধারণাকে সরাসরি প্রত্যাখান করেন। কেননা তিনি ছিলেন আইন ও সাংবিধানিক নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ইসলাম সরকারি রূপরেখার এই সমস্যার সমাধান দেয় স্বৈরশাসন ও আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বের সাংবিধানিকতাবাদের মধ্যে সংশ্লেষণ করে। এর অর্থ হচ্ছে এখানে অবশ্যই মহান আল্লাহ তায়ালার কর্তৃত্ব ও মাহাত্ম মেনে নিতে হবে এবং পৃথিবীতে তার প্রতিনিধিরা নিরপেক্ষ আইনগুলো বলবৎ করবে। তবে তা করা হবে পরামর্শের মাধ্যমে যাতে তার মধ্যে জনগণের আত্মবিশ্বাস ও প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলিত হয়।

> মহানবি সা. এই নীতি তার রাষ্ট্রীয় জীবনে পুরোপুরিভাবে প্রয়োগ করেছেন, ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক জীবনে। খোলাফায়ে রাশেদাগণও একইভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। আল- কুরআন তাদের শাসনের মূলনীতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করে : যাদের কাজ কর্মগুলো সম্পাদনের সময় পারস্পরিক পরামর্শই হয় তাদের কর্মপন্থা (সুরা আশ শুরা ৪২ : ৩৮)।

ঘ. পররাষ্ট্রনীতি

বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সাথে মিথস্ক্রিয়া যে নীতি পরিচালনা করে তাকে বলা হয় আন্তর্জাতিক আইন। আমরা যদি এই আইনের উৎস খুঁজে দেখি তাহলে জানতে পারব যে, প্রথম দিকে এই বিষয়ে তেমন ধরাবাধা কোনো নিয়ম নীতি ছিল না।

www.amarboi.org

এমনকি রোমান আইনেও ব্যক্তিবাদের মূলনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের আইন শুধুমাত্র তার নাগরিকদের উপর প্রযোজ্য। এখানে বিদেশিদের কোনো অধিকার ছিলো না। তবে যদি তাদের সাথে রোমানদের কোনো চুক্তি সম্পাদিত হতো তাহলে ভিন্ন কথা। তবে সাধারণ অবস্থায় মালিক বিহীন সম্পদের মতো যে কোনো রোমান বিদেশিদের বন্দি করতে পারত[১২]।

রোমান আইন থেকে যে পশ্চিমা আইনগুলো প্রবর্তন করা হয় সেগুলোতেও আন্তর্জাতিক আইনের তেমন কোনো উল্লেখ ছিল না। সর্বপ্রথম ইসলাম একটি সুশৃঙ্খল আন্তর্জাতিক আইনের প্রবর্তন করে যা মহানবি সা.-এর জীবনীতে আমরা দেখতে পাই। মুসলিম চিন্তাবিদগণ পৃথিবীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন ১. দারুল ইসলাম (মুসলিম দেশ), ২. দারুলসুলহ (চুক্তিবদ্ধ দেশ), এবং ৩. দারুল হারব (যুদ্ধ দেশ)।

মুসলমানরা বিশ্বব্যাপী একই ভ্রাতৃত্ব বলে পরিচিতি। অমুসলিমদের মধ্যে যাদের সাথে চুক্তি হয়েছে তাদের চুক্তি অনুযায়ী আচরণ করা হবে। চুক্তি যদি না হয়ে থাকে তাহলে তাদের সাথে দুই ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখার বিধান রয়েছে : এমন জনপথ যেখানে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হয় এবং তাদেরকে ধর্ম কর্ম করতে দেওয়া হয় না এবং ইসলাম প্রচার করতেও দেওয়া হয় না। এমন দেশের সাথে মুসলিম দেশগুলো যোদ্ধ দেশের মতোই আচরণ করবে। কিন্তু সেই দেশে যদি মুসলমানদের ধর্ম কর্মে কোনো বাধা দেওয়া না হয় তাহলে তাদের সাথে কোনো যুদ্ধ নয়। কেননা কোনো কারণ ছাড়া ইসলাম যুদ্ধের অনুমোদন দেয় না।

অবিশ্বাসীরাও যদি আমাদের উপর আক্রমণ না করে তাহলে তাদের সাথেও সদয় ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতে হবে :

> যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং কখনো তোমাদের নিজেদের বাড়িঘর থেকেও বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি দয়া দেখাতে ও তাদের সাথে ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ তায়ালা কখনো নিষেধ করেন না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন (৬০ : ৮)।

ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম এবং তা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। এই ব্যবস্থায় সন্ধি, চুক্তি ও সমাবেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে। এই ধরনের চুক্তি থেকে যে

---

[১২] Ency. Briticannica, "Roman Law", vol. 19. p.545

www.amarboi.org

দায়িত্বগুলো মুসলিম রাষ্ট্রের উপর বর্তায় সেগুলোও যথাযথভাবে পালন করতে বলা হয়েছে।

হে মুমিনগণ তোমরা তোমাদের চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত হও... (সুরা মায়েদা ৫ : ১); ... এবং তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করো। সাবধান! তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ৩৪)।

এই হচ্ছে চুক্তি ও সন্ধি সম্বন্ধীয় কুরআনের আয়াত। মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন মূলত বিশ্বজনীন মানবিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এই মতবাদ সমগ্র মানবতার জন্য প্রযোজ্য। এখানে ধর্ম ও জাতি কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। ইসলাম যে বিশ্ব ব্যবস্থার কথা বলে সেই অনুযায়ী ইসলামি রাষ্ট্র যে ওয়াদা করবে এমনকি একজন মুসলিম ব্যক্তি যে ওয়াদা করবে তার জন্য পুরো মুসলিম সমাজ দায়বদ্ধ থাকবে। ইসলাম ব্যক্তি পর্যায়ে কেউ দাস দাসী হলেও শত্রুকে নিরাপত্তা দেওয়ার অধিকার দিয়েছে এবং তার দেওয়া নিরাপত্তা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজ শ্রদ্ধাবনত থাকে। মুসলমানরা সবাই এক এবং তাদের মধ্যে যে সবচাইতে দুর্বল তার অঙ্গীকারের সাথেও সবাইকে একতাবদ্ধ হতে হবে। এই হচ্ছে মহানবি সা.-এর শিক্ষা। আবু ওবায়দা এক সময় খলিফা ওমরকে লিখেন যে, একজন কৃতদাস ইরাকের কোনো শহরের নাগরিকদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি এই বিষয়ে হযরত ওমরের রায় চান। উত্তরে তিনি বলেন :

আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি পূরণের আদেশ দিয়েছেন এবং তা যদি না কর তাহলে তোমরা মুমিন নও, তাই তাদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তোমরা পূরণ করো এবং তাদেরকে ছেড়ে দাও।

প্রতিশ্রুতি কিংবা নিরাপত্তা প্রদান বিষয়ে ইসলামি ফকিহগণ বেশ গুরুত্বারোপ করেছেন। তাদের মতে যদি এই ধরনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কাউকে দেওয়া হয় তাহলে শত্রু রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ লেগে গেলেও এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যাবে না। বিদেশি রাষ্ট্র দূতদের স্থানীয় আইনে বিচার করা হবে না এবং তারা যথাযথভাবে নিজেদের ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত স্বাধীনতা উপভোগ করবে। তাদের দেশে না যাওয়া পর্যন্ত সার্বিক নিরাপত্তার বিধান করবে ইসলামি রাষ্ট্র।

ইসলামি ব্যবস্থা তার দেশে ভিন্ন আইনেরও অনুমোদন দেয়। বিধর্মীদেরকে তাদের নিজস্ব আইন মানার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তাই কোনো বিদেশিকে বিচার করা হবে তার সামাজিক আইন অনুযায়ী। এমনকি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এমন প্রথা পালনের স্বাধীনতাও তাকে দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইসলামি

www.amarboi.org

ব্যবস্থায় মদ্যপান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু ইসলামি রাষ্ট্রে একজন অমুসলিম শুধু মদ পানের স্বাধীনতাই উপভোগ করতে পারে না বরঞ্চ তা উৎপাদন ও বিক্রির অনুমতিও রয়েছে। ইসলাম এতটাই উদার যে তার প্রবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এখন আমরা যুদ্ধের কারণ ও উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করে দেখতে পারি।

ঙ. যুদ্ধ

যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ইসলাম নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে রেখেছে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য এখানে হচ্ছে অন্যায়ের দমন, নির্যাতন প্রতিরোধ এবং সবার ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা। কুরআনের (সুরা হাজ্জ ২২ : ৩৯) আয়াতে যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে তা আত্মরক্ষামূলক। যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদের যারা শুধুমাত্র এক আল্লাহ তায়ালার ইবাদত থেকে বঞ্চিত করার জন্য ঘর ছাড়া হয়েছে।

> যাদের বিরুদ্ধে (কাফেরদের পক্ষ থেকে) যুদ্ধ চালানো হচ্ছিলো, তাদেরকেও (এখন যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া গেলো, কেননা তাদের ওপর সত্যিই জুলুম করা হচ্ছিলো; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এ (মাযলুম) দের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। (এরা হচ্ছে কতিপয় মাযলুম মানুষ,) যাদের অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে-শুধু এ কারণে যে, তারা বলেছিলো, আমাদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা; যদি আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির একদলকে আরেক দল দিয়ে শায়েস্ত না করতেন তাহলে দুনিয়ার বুক থেকে (খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীদের) উপাসনালয় ও গির্জাসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেতো, (ধ্বংস হয়ে যেতো ইহুদিদের) এবাদাতের স্থান ও (মুসলমানদের) মাসজিদসমূহও, যেখানে বেশি বেশি পরিমাণ আল্লাহ তায়ালার নাম নেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে আল্লাহ তায়ালার (দ্বীনের) সাহায্য করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী (সুরা হাজ্জ ২২ : ৩৯-৪০)।

আমরা যদি এই আয়াত দুইটির শেষ দিকে মনোযোগ দেই তাহলে যুদ্ধের উদ্দেশ্য এখানে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে আসবে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য শুধু মুসলমানদের ইবাদত রক্ষাই নয় বরঞ্চ অন্যান্য সম্প্রদায়ের গীর্জা ও মন্দিরগুলো রক্ষা করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। ইসলামি যুদ্ধের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য এবং আগ্রাসীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

www.amarboi.org

তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকো, যতক্ষণ না (জমিনে) ফেতনা অবশিষ্ট থাকে এবং (আল্লাহ তায়ালার যমীনে আল্লাহ তায়ালার দেওয়া) জীবনব্যবস্থা (পূর্ণাঙ্গভাবে) আল্লাহ তায়ালার জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়; যদি তারা (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসে তবে তাদের সাথে আর কোনো বাড়াবাড়ি নয়, (তবে) যালেমদের ওপর (এটা প্রযোজ্য নয়) (সুরা বাকারা ২ : ১৯৩)।

ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ইসলামের বাণী অন্যান্য যে কোনো আদর্শের ঊর্ধ্বে অবস্থান করছে। এই ব্যবস্থায় যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সীমিত এবং তা হচ্ছে জুলুম ও অন্যায় প্রতিহত করা। যখনই তা বন্ধ হবে তখনই যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, জোরপূর্বক ধর্মান্তর এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রাণ হত্যার চাইতেও জঘণ্য :

সম্মানিত মাস ও তাতে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি তাদের বলে দাও, এই মাসে যুদ্ধবিগ্রহ করা অনেক বড়ো গুনাহর কথা; (কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কাছে এর চাইতেও বড়ো গুনাহ হচ্ছে), আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে মানুষদের ফিরিয়ে রাখা, আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করা, খানায়ে কাবার দিকে যাওয়ার পথ রোধ করা ও সেখানকার অধিবাসীদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া, আর (আল্লাহদ্রোহিতা) ফেতনা ফাসাদ হত্যাকাণ্ডের চাইতেও অনেক বড়ো (অন্যায়) (সুরা বাকারা ২ : ২১৭)।

মহানবি সা. মক্কার মুশরিকদের হাতে ইসলাম প্রচারের শুরু থেকেই বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। তবুও তিনি আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ছাড়া অস্ত্র হাতে নেননি। তাকে শুধু আত্মরক্ষার জন্য এবং নির্দিষ্ট কিছু নীতিমালার অনুসরণ করে যুদ্ধ পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয় :

তোমরা আল্লাহ তায়ালার পথে সে সব লোকের সাথে লড়াই করো যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, (কিন্তু কোনো অবস্থায়ই) সীমালঙ্ঘন করো না; কারণ আল্লাহ তায়ালা কখনো সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না (সুরা বাকারা ২ : ১৯০)।

মূলত যুদ্ধ মহানবি সা. ও তার সঙ্গী সাথীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তারা অরাজকতা বন্ধের জন্য এবং আল্লাহ তায়ালার বাণী সমুন্নত করার জন্যই যুদ্ধে নেমেছিলেন।

www.amarboi.org

তাছাড়া কোনো আনুষ্ঠানিক সতর্কবাণী ছাড়া যুদ্ধ পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়নি যাতে রক্তপাত বন্ধের শেষ সুযোগটিও কাজে লাগানো যায়। মোদ্দাকথা ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে অরাজকতা ও নৈরাজ্য দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা। যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও অন্য পক্ষ থেকে যদি শান্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার জন্যও মুমিনদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

(হে মুহাম্মদ) তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ দেখায়, তাহলে তুমিও সন্ধির জন্য ঝুঁকে যাবে এবং (সর্বদা) আল্লাহ তায়ালার ওপরই ভরসা করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছু) দেখেন (সুরা আন'ফাল ৮ : ৬১)।

এই হচ্ছে ইসলামের যুদ্ধনীতি। ইসলাম সন্ধি চুক্তি হওয়ার পর আকস্মাৎ আক্রমণের অনুমতি দেয় না। বিদেশি নাগরিকদেরকেও যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সার্বিক নিরাপত্তা দিতে হবে এই চুক্তির বলে। যারা ইসলামের বিরুদ্ধে সক্রিয় যুদ্ধ করেছে তারা যদি আশ্রয় চায় তাদেরকেও আশ্রয় দিতে হবে। তাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার পর নিরাপদ স্থানে পৌছানো পর্যন্ত সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করতে হবে (সুরা তাওবা ৯ : ৬)।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে নির্দিষ্ট আরো কিছু নিয়মনীতি মুসলিম সেনানীদের মানতে হয়। যেমন, বৃদ্ধদের হত্যা করা যাবে না, তাছাড়া অল্প বয়স্ক শিশু, নারী ও প্রার্থনারত ভিক্ষুদের হত্যা করা নিষেধ। খলিফা আবু বকর রা. তার এক দিক নির্দেশনা এই নীতিগুলো উত্তম রূপে বিধৃত করেছেন :

> তোমরা ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করবে; তোমরা কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না; কারো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কর্তন করবে না; বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের হত্যা কিংবা আহত করবে না। খেজুর বৃক্ষে আগুন ধরাবে না, ফসল উৎপাদনকারী গাছ গাছালী উপড়ে ফেলবে না। ভেড়া ছাগল কিংবা উটের পাল হত্যা করবে না, হ্যাঁ তোমাদের খাদ্য হিসেবে যতটুকু দরকার ততটুকু ব্যতিরেকে। হয়তো বা তোমরা এমন কিছু লোকের সম্মুখীন হতে পারো, যারা মন্দিরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে তাদেরকে শান্তিমতো তাদের কাজ করতে দাও[১৩]।

এই হচ্ছে খলিফা আবু বকরের যুদ্ধ সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা যা তিনি সিরিয়া অভিযানের আগে তার সেনানীদের দিয়েছিলেন। যুদ্ধ জয়ের পরও খোলাফায়ে রাশেদাগণ কুরআনে বিধৃত মানবিক বিবেচ্য বিষয়গুলো ভুলে যেতেন না। জেরুযালেম যখন জয় করা হয় তখন এমন কিছু শর্ত বিজিত জাতির উপর দেওয়া

[১৩] Arnold, The Preaching of Islam, pp. 49, 50.

www.amarboi.org

হয় যা মুসলিম বিজয়ীদের মানবতা ও আত্মসংযমকেই প্রতিষ্ঠিত করে। খলিফা ওমর মহান আল্লাহ তায়ালার নামে যে শর্তগুলো বের করেন সেগুলো ছিল নিম্নরূপ :

> আমি তাদের সবাইকে জান ও মালের নিরাপত্তা দিলাম। তাদের সন্তান সন্ততি, গীর্জা, ক্রস ও অনান্য সকল সহায় সম্পদ তাদের কাছেই থাকবে। তাদের জমিজমাও তাদের থাকবে। তাদের কোনো গীর্জা ধ্বংস করা হবে না এবং সেখানে অবস্থানরত কাউকে আহত করা হবে না; তাদের মান সম্মানেরও কোনো ক্ষতি করা হবে না; তাদের সম্পদ তাদের কাছেই থাকবে। ধর্মের কারণে জেরুযালেমের কোনো অধিবাসীর উপর নির্যাতন করা হবে না এমনকি তাদের কাউকে আহত করতে দেওয়া হবে না[১৪]।

আর্নল্ড বলেন :

> খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় নেতার সাথে ওমর রা. তাদের পবিত্র জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন। এই ভাবেই যখন তাদের Resurrection গির্জায় পৌছেন তখন নামাজের সময় হয়ে যায়। এতে ধর্মগুরু খলিফাকে সেই গির্জায় নামাজ পড়তে বললে তিনি চিন্তা ভাবনা করে তার অনুরোধ ফিরিয়ে দেন। তিনি বলেন, আজকে যদি তিনি গির্জায় নামাজ পড়েন তাহলে পরবর্তীতে হয়তো মুসলমানরা এটিকে তাদের ইবাদত গৃহ হিসেবে দাবি করে বসতে পারে[১৫]।

পৃথিবী যখন অন্ধকার যুগে নিমজ্জিত তখন ইসলামি রাষ্ট্র একটি আদর্শ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করে যা অনেক গুণে গুণান্বিত ছিল। এটা হয়তো এই কারণে যে, ইসলাম সর্বোচ্চ পর্যায়ে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে এবং অন্যান্য ধর্ম কিংবা তার অনুসারীদের উপর কোনো ধরনের জোর জবরদস্তি করে না। কুরআনে উল্লেখ আছে ধর্মে কোনো ধরনের জোর জবরদস্তি নেই (সুরা বাকারা ২ : ২৫৬)। তাছাড়া ইসলামে যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কারো শোষণ করা নয় কিংবা কাউকে পরাজিত করে লাঞ্ছিত করা নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে ইসলাম কেন দাসত্বের অনুমতি দেয়?

চ. দাসত্ব

ইসলামে দাসত্বের অবস্থান রয়েছে নামে মাত্র। মহানবি সা. এই ব্যবস্থা থেকে দাসত্বের উচ্ছেদের জন্য সম্ভাব্য সকল পথ অবলম্বন করেছেন। এটি দাস দাসীদের

---

[১৪] Ibid.

www.amarboi.org

প্রতি তার কোমল ন্যায়পরায়ণ আচরণ থেকেই প্রতিভাত হয়। ইসলামি ব্যবস্থা তাদের এতটাই সমান সুযোগ দিয়েছে যে, তারা পরবর্তীতে রাজা বাদশা, যোদ্ধা, আইনবিদ ও পণ্ডিত হতে পেরেছিলেন।

নিম্নে আমরা এই প্রসঙ্গে বিদায় ভাষণে মহানবি সা.-এর বক্তব্য তুলে ধরব :

> এবং তোমাদের দাস দাসীদের ব্যাপারে! তোমরা যা খাও তাদেরকে তাই খাওয়াবে, এবং তোমরা যা পর তাদেরকে তাই পরাবে। তারা যদি এমন কোনো দোষ করে যা তোমরা ক্ষমা করতে পার না, তাহলে তাদেরকে তোমরা ছেড়ে দিবে, কেননা তারা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার দাস এবং কখনো তাদের সাথে রুক্ষ আচরণ করা যাবে না[১৬]।

কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় দাস দাসীদের মুক্তি দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআনে যখন জিজ্ঞেস করা হয় আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা কী? তখন উত্তরে বলা হয় এটি হচ্ছে কোনো দাস দাসীকে মুক্তি দেওয়া (সুরা বালাদ ৯০ : ১৩)। এর সমর্থনে মহানবি সা.-এরও অনেক বাণী রয়েছে :

> একজন দাসকে মুক্ত করার চাইতে অন্য কোনো কিছু আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না (বুখারি, কিতাবুল ইত্ক)।

ইসলামি ব্যবস্থায় দাস দাসীদের কখনো পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি যা ছিল রোমান সভ্যতার বিপরীত। দাস দাসীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। ইসলাম তাদেরকে মানবিক মর্যাদা ফিরিয়ে দেয় এবং ঘোষণা করে যে কোনো দাস দাসীকে হত্যা করল, আমরাও তাকে হত্যা করব এবং যে তার নাক কর্তন করল আমরাও তার নাক কর্তন করব এবং যে তাদেরকে খুজা বানাবে আমরাও তাকে খুজা বানাব (বুখারি ও মুসলিম)। কুরআনের (সুরা নিসা ৪ : ৩ ৬) আয়াতটি দাস দাসীদের সাথে উত্তম আচরণ করতে বলে। অন্য একটি আয়াতে (সুরা নিসা ৪ : ২৫) মুসলমানদের মুমিন দাসীদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়। তবে এর জন্য মালিকের অনুমতি প্রয়োজন।

মালিকদের মতোই দাসদাসীরা যে মর্যাদা উপভোগ করত তাই নয়, বরঞ্চ দুইটি উপায়ে তাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয় :

১. মালিকদের স্বেচ্ছাসেবকমূলক মুক্তি দান এবং

২. তাদের মুক্তি লিখিত আকারে দেয়।

---

[১৬] ইবনে হিশাম সিরাত আল-নাবায়্যিাহ, ২/৬০৩

www.amarboi.org

মহানবি সা. দাসদাসীদের মুক্তির ক্ষেত্রে নিজেও আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তিনি তার সকল দাসদাসীকে মুক্ত করেন এবং মুক্ত একজন দাসের সাথে স্বাধীন কোরাইশ বংশের মহিলার বিয়ের ব্যবস্থা করেন তিনি ছিলেন তারই আত্মীয়।

দ্বিতীয় পন্থাটি ছিল লিখিত আকারে মালিক তার দাসদাসীকে মুক্তি দিবে। তারা যদি চায় নির্দিষ্ট অংকের বিনিময়ে মালিকের কাছ থেকে লিখিত আকারে মুক্তি পেতে পারে। এই ক্ষেত্রে মালিক তার মুক্তিকে অস্বীকার করতে পারে না কিংবা বিলম্বিত করতে পারে না। চুক্তি অনুযায়ী যদি সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহলে মুক্তির জন্য মালিকের বিরুদ্ধে দাসদাসীরা মামলা করতে পারে।

এগুলো ছাড়াও কুরআনে দাসদাসীদের মুক্তির আরো অনেক পন্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। গুণাহর কাফ্ফারার জন্য ওয়াদা ভঙ্গের কাফ্ফারা এবং মুসলমান হত্যার ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাসদাসীদের মুক্তি দেওয়া যায় :

> এটা কোনো ইমানদার ব্যক্তির কাজ নয় যে, সে আরেকজন ইমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, অবশ্য ভুলবশত করে ফেললে (তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা) যদি কোনো (ইমানদার) ব্যক্তি আরেকজন ইমানদার ব্যক্তিকে ভুল করে হত্যা করে, তাহলে (তার বিনিময় হচ্ছে) সে একজন দাস মুক্ত করে দেবে এবং (তার সাথে) নিহত ব্যক্তি পরিবার- পরিজনকে (তার;) রক্তের (ন্যায় সঙ্গত) মূল্য পরিশোধ করে দেবে (সুরা নিসা ৪ : ৯২)।

যদি কোনো যুদ্ধে তারা বন্দি হয় তাহলে তাদেরকে হয়তো অনুকম্পা হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হবে কিংবা মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে স্বাধীন করে দেওয়া হবে :

অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সম্মুখীন হবে তখন তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করো, অতঃপর বন্দিদের মুক্ত করে দিবে কিংবা তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দিবে (সুরা মুহাম্মদ ৪৭ : ৪)। এই আয়াতে যুদ্ধ বন্দিদের গোলাম বানানোর কথা বলা হয়নি, বরঞ্চ তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে কিংবা এমনিতেই ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। ইসলাম কখনো যুদ্ধ বন্দিদের দাস হিসেবে আচরণ করতে বলেনি।

নারীদের ক্ষেত্রে বলা যায় যুদ্ধ বন্দি হিসেবেও তাদের ক্ষেত্রে সম্মানজনক আচরণ করার নির্দেশ রয়েছে। তাদের কখনো সাধারণ সম্পদ হিসেবে দেখতে বলা হয়নি। তারা সব সময় তাদের মনিবের অধীনে থাকবে এবং পূর্বোল্লিখিত মুকাতাবা ব্যবস্থার মাধ্যমে মুক্তির অধিকারও তাদের রয়েছে। যদি মালিকের ঔরস থেকে দাসীর কোনো সন্তান হয় তাহলে সেই দাসীর মুক্ত নারীতে পরিণত হবে এবং তার সন্তান

www.amarboi.org

সন্ততিও স্বাধীন হবে। ইসলাম কখনো নারীদের মর্যাদা লঙ্ঘন করে না এবং তাদের সাথে সদা সর্বদা সম্মানজনক আচরণ করে।

ছ. নারীর মর্যাদা

সম্পদের মালিকানা, তার বিতরণ, ব্যবসা বাণিজ্য ও চুক্তির ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদেরকে পুরুষদের সমান ক্ষমতা ও মর্যাদা দিয়েছে। তাদেরকে সব ধরনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং সমাজে পুরুষদের সমান মর্যাদা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। পুরুষদের মতো তাদেরকেও নৈতিকতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে যাতে দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ না পায়। নারীদের ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে তাদেরকে সমীহের চোখে দেখতে হবে এবং মাতৃ কুল হিসেবে তাদের সম্মান হবে একেবারেই ভিন্ন। তারা পুরুষদের সম্পূরক সাথী হিসেবে ভালো আচরণের দাবিদার। আদি উৎসের বিবেচনায় ইসলামি ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষ সমান :

> হে মানুষ, তোমরা তোমাদের মালিককে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি (মাত্র) ব্যক্তিসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তা থেকে (তার) জুড়ি পয়দা করেছেন, (এরপর) তিনি তাদের (এই আদি জুড়ি) থেকে বহু সংখ্যক নর-নারী (দুনিয়ায় চারদিকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন (সুরা নিসা ৪ : ১)।

কুরআনের ৪ নম্বর সুরা হচ্ছে সুরা নিসা অর্থাৎ নারী। এখানে নারীদের নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শুরুতেই মানব জাতির একাত্মতার উপর জোর দেওয়া হয়। অতঃপর নারী ও এতিমদের অধিকার ও পারিবারিক সম্পর্কের দায় দায়িত্বগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়। এখানে বিবাহ, উত্তরাধিকার ও সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। পুরুষদের মতো তাদেরও রয়েছে সমান মৌলিক অধিকার, মর্যাদা ও সম্পদের মালিকানা অর্জনের অধিকার। তবে যে লিঙ্গ বৈষম্যের কথা বলা হয় তা প্রাকৃতিক ও জৈবিক। তা সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক বিষয়ে নারী পুরুষে কোনো বৈষম্য নেই। একজন পুরুষ ভালো কাজ করলে যতটুকু সোয়াব পাবে নারীও ঠিক ততটুকুই পাবে। নারী ও পুরুষ উভয়কেই পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> অতঃপর তাদের মালিক তাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন যে, আমি নর-নারী নির্বিশেষে তোমাদের যে যেই কাজ করে তাদের কোনো কাজ কখনো বিনষ্ট করব না, আমি সবার কাজের বিনিময়ই দেব এবং তোমরা তো একে অপরেরই অংশ (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১৯৫)।

www.amarboi.org

এই ভাবেই আধ্যাত্মিক ও দ্বীনী কর্মকাণ্ডে ইসলামি ব্যবস্থায় নারী পুরুষে কোনো বৈষম্য রাখা হয়নি। সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকারের ক্ষেত্রে তারা সবাই সমান। তবে মাতৃ কুল হিসেবে নারীর মর্যাদা ইসলামে অনেক বেশি। মহানবি সা.-এর বাণী হচ্ছে মায়ের পায়ের তলে বেহেশ্‌ত। কুরআনে পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণ করতে বলা হয়। বিশেষ করে মায়েদের প্রতি যারা তাকে কষ্ট করে গর্ভে বহন করেছে এবং কষ্টের মাধ্যমে জন্ম দিয়েছে (সুরা আহকাফ ৪৬ : ১৫)।

বুখারি ও মুসলিমে এই মর্মে হাদিস আছে যে, এক ব্যক্তি মহানবি সা. কে জিজ্ঞেস করলেন কার প্রতি ভালো আচরণ করা উচিত সবার আগে। মহানবি সা. বললেন, তোমার মায়ের প্রতি। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কাকে? মহানবি সা. তিন বারের প্রশ্নের উত্তর একই জবাব দিলেন এবং চতুর্থ বারে বললেন তারপর তোমার বাবাকে।

স্ত্রীদের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে : তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো (সুরা নিসা ৪ : ১৯)। তিরমিযির এক হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী মহানবি সা. বলেন : তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে স্ত্রীর কাছে উত্তম। বিদায় হজের ভাষণে মহানবি সা. পুরুষদেরকে নারীদের প্রতি সদয় হতে বলেছেন এবং তাদের অধিকারের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন :

হে জনগণ! স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের উপর স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় আচরণ করো। কেননা, তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের নিরাপত্তার প্রতিজ্ঞা করেছো এবং আল্লাহ তায়ালার কালিমার মাধ্যমে তাদেরকে তোমাদের জন্য হালাল বানিয়েছ।

ইসলাম একটি ব্যবহারিক জীবনব্যবস্থা। নারীদেরকে তাদের অধিকার দেওয়া হলেও নারী ও পুরুষের মধ্যে যে জৈবিক ও প্রাকৃতিক তারতম্য রয়েছে তারও অবহেলা করা হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্বের বণ্টনে তারতম্য দেখা যায়। পুরুষরা হচ্ছে নারীদের কাজ কর্মের উপর প্রহরী, কারণ আল্লাহ তায়ালা এদের একজনে আরেকজনের উপর বিশেষ কিছু মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং পুরুষরা এই মর্যাদা একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে প্রধানত তারাই দাম্পত্ত জীবনের জন্য নিজেদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করে (সুরা নিসা ৪ : ৩৪)। এখানে স্ত্রীদের দায়-দায়িত্বের কথাও বলা হয়েছে। তাদেরকে তাদের মান সম্মান রক্ষা করতে বলা হয়েছে এবং স্বামীদের সাথে সৎভাব দেখাতে বলা হয়েছে। তাছাড়া স্বামীর অনুপস্থিতিতে পরিবারের স্বার্থ দেখভাল করতে বলা হয়েছে।

www.amarboi.org

পারিবারিক বিবাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা তিনটি পর্যায়ের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন :

আর যখন কোনো নারীর অবাধ্যতার (ঔদ্ধত্যের) ব্যাপারে তোমরা আশঙ্কা করো, তখন তোমরা তাদের (ভালো কথার) উপদেশ দাও, (তা কার্যকর না হলে) তাদের সাথে একই বিছানায় থাকা ছেড়ে দাও, (তাতেও যদি তারা সংশোধিত না হয় তাহলে চূড়ান্ত ব্যবস্থা হিসেবে) তাদের (মৃদু) প্রহার করো, তবে যদি তারা (এমনিই) অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের (খামাখা কষ্ট দেওয়ার) ওপর অজুহাত খুঁজে বেড়িয়ো না; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবার চাইতে মহান।

ইমাম শাফীর মতে, যদি স্ত্রীকে শোধরানোর ক্ষেত্রে যৌন সংসর্গ থেকে বিরত থাকাও কাজ না দেয় তাহলে হাল্কা মারধোর করা যায়। তবে ইমামরা সবাই একমত যে, কোনো ধরনের নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। বোখারীর এক হাদিস অনুযায়ী মহানবি সা. বলেন : উটকে যেমন বেত্রাঘাত করা হয় তেমন তোমরা স্ত্রীকে বেত্রাঘাত করো না। কারণ পরে দেখা যাবে দিন শেষে তোমরা তাদের সাথে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছো। ইসলামি ব্যবস্থায় মানব জাতিকে জীবনযাপন করতে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতি উপলব্ধি করে। তাই স্ত্রীরা যদি সৎভাব বজায় রাখে তাহলে তাদের কখনো বিরক্ত করা যাবে না। তবুও পারিবারিক বিবাদ দেখা দিয়ে তা মেটাবার জন্য নিম্নোক্ত আয়াতে চমৎকার পদ্ধতি বাতলে দেওয়া হয় :

> আর যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রী এ) দুজনের মাঝে বিচ্ছেদের আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে তার পক্ষ থেকে একজন সালিস এবং তার (স্ত্রী) পক্ষ থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করো, এরা উভয়ে যদি নিজেদের নিষ্পত্তি চায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের (পুনরায় মীমাংসায় পৌঁছার) তাওফিক দেবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সম্যক জ্ঞানী, সর্ব বিষয়ে ওয়াকেফহাল (সুরা নিসা ৪ : ৩৫)।

ইতিপূর্বে স্ত্রীদের যে দায় দায়িত্বের কথা বলা হয় সেগুলো বিধৃত করা হয় পুরুষদের দায় দায়িত্বের বিপরীতে। স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে তার অন্ন, বাসস্থান ও বস্ত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করা। আলোচনা থেকে হয়তো মনে হবে যে, স্ত্রীর উপর স্বামীর কিছু কর্তৃত্ব রয়েছে, কিন্তু ইসলামি বিধান মতে স্বামী যদি রুক্ষ আচরণ করে তাহলে স্ত্রী তালাক চাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে বিবাহের সময় নির্ধারিত যৌতুক স্বামীকে ফেরত দিতে হবে। তাছাড়া যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে স্ত্রী তাকে যা দিয়েছে তাও তাকে ফেরত দিতে হবে। আদালতে যদি স্ত্রী স্বামীর মারধোর কিংবা দুরাচারের কথা প্রমাণ করতে পারে কিংবা দেখাতে পারে যে, তার ভরণ-পোষণ

www.amarboi.org

ঠিকঠাক মতো করছে না তাহলে আদালত স্ত্রীর অনুরোধে সে বিয়ে ভেঙে দিতে পারে। স্ত্রী যদি তার তালাক দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করতে চায় তাহলে বিয়ের সময় সেই ভাবে চুক্তি করে নেওয়াই উত্তম।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা নারীদের সৃষ্টি করেছেন মূলত পুরুষের সঙ্গী হিসেবে :

> তাঁর (কুদরতের) নিদর্শন সমূহের (মধ্যে) তোমাদের মধ্য থেকে (তোমাদের) সঙ্গীনীদের বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে সুখ শান্তি লাভ করতে পারো। (উপরন্তু) তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও (পারস্পরিক) সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন, অবশ্যই এর মাঝে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে (সুরা রূম ৩০ : ২১)।

কুরআনে নারী ও পুরুষকে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে, তাদেরকে একে অপরের পোষাক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (সুরা বাকারা ২ : ১৮৭)। এর অর্থ হলো তাদের কাজ হচ্ছে পরস্পরকে সমর্থন দেওয়া, আরাম পৌছানো এবং নিরাপত্তা দেওয়া। পরিধেয় কাপড় যেমন শরীরের সাথে লেগে থাকে তেমনি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংস্কার তারা চালাবে। নারীদের পছন্দ মতো স্বামী বেছে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সম্মতি ছাড়া অভিভাবকগণ কারো কাছে বিয়ে দিতে পারবে না। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। মহানবি সা. বলেছেন :

কোন বিধবাকে তার সাথে পরামর্শ করা ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না; এবং কোন কুমারীকেও তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না এবং তার সম্মতি হচ্ছে নিরবতা। কুমারি মেয়ে যদি মুখে ঘোষণা দেয় যে, বিয়ে তার অসম্মতিতে হয়েছিল তাহলে আদালত এই বিয়ে ভেঙে দিতে পারে।

প্রাক ইসলামি যুগে যেখানে স্ত্রীর কোনো সংখ্যা নির্ধারিত ছিলো না। ইসলাম সেটিকে চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। তারপরও অনেক শর্ত পুরণ করার পর। জরুরি অবস্থার জন্যই বহু বিবাহের দরজা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ যুদ্ধের কথাই বলা যাক, তখন অসংখ্য পুরুষের প্রাণহানী হয় যার কারণে সমাজে ব্যাপক লিঙ্গ ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়। অথবা স্ত্রী অনির্দিষ্ট কালের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা এতটাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় যে, তার পক্ষে যৌনতা চর্চা করা সম্ভব নয়, এই সকল পরিস্থিতিতে বহু বিবাহ সামাজিক প্রয়োজন হিসেবেই দেখা দেয়।

www.amarboi.org

ইসলামি ব্যবস্থায় নারীদের কর্ম ও যাতায়াতের ব্যাপারে বলা যায়, ইসলাম তা কখনো নিষিদ্ধ করে না। তবে তারা যাতে শালিনতা বর্জন করে উন্মুক্ত চলাফেরা না করে সেই বিষয়েও সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। চলাফেরায় নারী ও পুরুষ উভয়কেই শালিনতা অবলম্বন করতে বলা হয়। কিন্তু সামাজিক পরিস্থিতি ও স্বভাবতজাত প্রকৃতির কারণে দেখা যায় পুরুষদের তুলনায় নারীদেরই গোপনীয়তার প্রয়োজন বেশি :

> (হে নবি), আপনি মোমেন পুরুষদের বলেন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে (নিম্নগামী ও) সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহকে হেফাযত করে; এটাই (হচ্ছে) তাদের জন্য উত্তম পন্থা; (কেননা) তারা (নিজেদের চোখ ও লজ্জাস্থান দিয়ে) যা করে, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবহিত রয়েছেন (সুরা নূর ২৪ : ৩০)।
>
> (হে নবি, একইভাবে) আপনি মুমিন নারীদেরও বলেন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাজত করে, তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে না বেড়ায়, তবে তার (শরীরের) যে অংশ (এমনিই) খোলা থাকে তারা যেন তাদের বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে (সুরা নূর ২৪ : ৩১)।

পর্দার মাধ্যমে কুরআনে নারীদেরকে শালীনতা বজায় রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে :

তোমরা যদি নবি পত্নীদের কাছ থেকে কোনো জিনিসপত্র চাইতে তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নিও, এটা তোমাদের ও তাদের অন্তর পাক ছাপ রাখার জন্য অধিকতর উপযোগী (সুরা আহযাব ৩৩ : ৫৩)।

মহানবি সা.-এর হাদিসে পর্দার পাশাপাশি লজ্জার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে :

> লজ্জা হচ্ছে ইমানের একটি অঙ্গ; নিঃসন্দেহে, লজ্জা ও ইমান একে অপরের সাথে জড়িত (মিসকাত, অধ্যায় ২২, অনুচ্ছেদ ১৯)।

মহানবি সা.-এর শিক্ষায় ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করারও নির্দেশ রয়েছে। তাই অনুমতি ছাড়া অন্য কারো বাড়িতে প্রবেশ করা নিষেধ। আল-কুরআনে এই বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে :

হে ইমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে- সে ঘরের লোকদের অনুমতি না নিয়ে ও তার বাসিন্দাদের প্রতি সালাম না করে কখনো প্রবেশ করো না; (নৈতিকতা ও শালীনতার দিকে থেকে) এটা তোমাদের জন্য উত্তম (পন্থা,

www.amarboi.org

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এসব বলে দিচ্ছেন), যাতে করে তোমরা (কথা গুলো) মনে রাখতে পারো।

(ঘরের দরজায় গিয়ে) যদি তোমরা কাউকে সেখানে না পাও, তাহলে সেখানে প্রবেশ করো না, যতোক্ষণ না তোমাদের (ঘরে ঢোকার) অনুমতি না দেওয়া হবে, যদি (কোনো অসুবিধার কথা জানিয়ে) তোমাদের বলা হয় তাহলে তোমরা অবশ্যই (বিনা দ্বিধায়) ফিরে যাবে, এটা তোমাদের জন্য উত্তম; তোমরা (যখন) যা কিছু করো, আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত থাকেন।

তবে যে সব ঘরে কেউ বসবাস করে না, সেখানে তোমাদের কোনো মাল সামানা রয়েছে, তেমন কোনো ঘরে প্রবেশে তোমাদের কোনো পাপ নেই; (কেননা) আল্লাহ তায়ালা জানেন যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো আবার যা কিছু তোমরা গোপন করো (সুরা নূর ২৪ : ২৭-২৯)।

আতা ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি মহানবি সা. কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি আমার মায়ের কামরায় ঢোকার আগেও অনুমতি চাইব? মহানবি সা. বললেন, হ্যাঁ। তখন লোকটি বলল, আমি যদি একই বাসায় থাকি? মহানবি সা. বললেন, হ্যাঁ একই বাসায় থাকলেও। তখন লোকটি বললেন, আমি যদি তার জন্য অপেক্ষা করি! মহানবি সা. বললেন, না তবুও তোমাকে অনুমতি নিতে হবে; কেন? তুমি কি তোমার মাকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে চাও!

মহানবি সা. আরো যে শিক্ষা দিয়েছেন তা হলো তিনি পর্দা ছাড়া কোনো দরজার সামনে এলে প্রথমে ডান দিক থেকে বাম দিকে যেতেন, তার পর কয়েকবার সালাম দিয়েই প্রবেশ করতেন (মিসকাত, অধ্যায়-১২, অনুচ্ছেদ- ২)।

আমাদের জন্য এটা লক্ষ্যণীয় যে ইসলাম সকল বিষয়ে সোনালি পন্থা অবলম্বন করে। তাই সামান্য কিছু সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে নারীদের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য নির্লজ্জতা ও অশালীনতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটি অবশ্য তাদেরই স্বার্থে কেননা নারীদের অশালীনতা থেকেই সামাজিক অনেক অন্যায়ের উৎপত্তি হয় যার কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। ইসলামি শরিয়ার একটি সৌন্দর্য হচ্ছে এটাই যে, মন্দের উৎস মূলোৎপাটন করার জন্য এখানে সাদ আল-দারায়ে বা মাধ্যম প্রতিহত করার নীতি অবলম্বন করা হয় যাতে গোড়াতেই মন্দের মূলোৎপাটন করা যায়। অন্যথায় হয়তো বা তা যদি শুরুতেই প্রতিহত করা না হয় তাহলে অন্যায় ও অনাচার হয়তো কোনো পর্যায়ে অপ্রতিরোধ হয়ে উঠবে।

www.amarboi.org

সব ধর্মে প্রতিতাবৃত্তিকে জঘণ্য অপরাধ হিসেবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম এর মূলোৎপাটন করার জন্য যৌন প্ররোচনার উৎস হিসেবে অশালীনতা নিষিদ্ধ করেছে। দুর্বল মানুষের জন্য এই ধরনের পরিস্থিতি অপরাধের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। মূলত সমাজের অধিকাংশই এই ধরনের প্ররোচনার শিকার হয়ে অন্যায়ে উদ্বুদ্ধ হয়। তাই বলা হয়ে থাকে চিকিৎসার চাইতে প্রতিরোধ উত্তম। এর অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমাজ থেকে গুটিয়ে নিবে এবং সন্যাস জীবনযাপন করবে। এই নীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে দুর্বল লিঙ্গকে পুরুষের হিংস্র থাবা ও ক্ষোভ প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করা।

ইতিহাস সাক্ষী যে মহানবি সা.-এর যুগে এবং তাঁর পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদার যুগে নারীরা সামাজিক কর্মকাণ্ডে স্বক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা সেবিকা, শিক্ষিকা এবং নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী আরো অনেক পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। একই সময়ে তারা নৈতিকতার বিধানগুলো কঠোরভাবে মেনে চলতেন এবং কখনো উন্মুক্তভাবে পুরুষদের সাথে মেলামেশা করতেন না।

নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা পুরুষদের চরিত্রকে পরীক্ষা করতে পারে এবং বিয়ের জন্য পুরুষ নির্বাচনে তা সহায়তা করে। তাছাড়া দেখা যায় বিবাহের ক্ষেত্রে মানুষ পছন্দের লোকটিকেই প্রাধান্য দেয়। তবে বাস্তবে দেখা যায় এই ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। তাই এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থানই উত্তম। ভালোবাসার বিষয়টি যত না বাস্তবসম্মত তার চাইতেও বেশি আবেগের শিকার। কেননা ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ করে দেয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ক্ষণস্থায়ী। ভালোবাসার নাটক শুরু হয় প্রবল আবেগ তাড়িত হওয়ার মাধ্যমে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার দুঃখজনক পরিসমাপ্তি ঘটে। ভালোবাসার উদ্রেক করার জন্য সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর কিংবা মন ভুলানো হাসি যথেষ্ট, যা কিনা প্রকৃত দাম্পত্ত জীবনের জন্য মুখ্য কিছু নয়।

মহানবি সা. এই ধরনের ভ্রুণ থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য এগুলোকে এড়িয়ে যেতে বলেছেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য বিয়ে করো না, কারণ তা নৈতিকতার অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে। সম্পদের জন্যও বিয়ে করো না কারণ তা লোভের সৃষ্টি করতে পারে। বরঞ্চ বিয়ে করো তাদের ধর্ম কর্ম দেখে (ইবনে মাযাহ)।

অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন : পার্থিব বিষয়ের মধ্যে সবচাইতে উত্তম নিয়ামত হচ্ছে একজন ভালো স্ত্রী (ইবনে মাযাহ)। আমরা ঘরের ভেতর শান্তিপূর্ণ জীবন

www.amarboi.org

নিশ্চিত করতে পারি যদি আমাদের স্ত্রীগণ হন স্বামী ভক্ত ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

তাই ইসলামের নারীদের পবিত্রতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আরেকটি কারণ হচ্ছে, নারীরাই হচ্ছে সন্তান সন্ততির একমাত্র গর্ভধারিনি মা। শিশুদের উপর নারীদের তাই প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। ইসলামে নারীদেরকে যে সম্মান দেখানো হয়েছে তাতেই আমরা অশালীনতা ও অনৈতিকতা বর্জনের ইঙ্গিত পাই। অশালীন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে ৮০টি বেত্রাঘাতের বিধান রয়েছে এবং আদালতে তার কাছ থেকে কখনো সাক্ষী গ্রহণ করা হবে না। তাছাড়া আখিরাতে শাস্তির বিধানতো আছেই।

এখন একটি প্রশ্ন হচ্ছে : নারীদেরকে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কিংবা সাক্ষীর ক্ষেত্রে পুরুষেদের চাইতে নীচু মনে করা হয় কেন। উত্তরাধিকার আইনের কথায় আসলে আমাদের বলতে হয় যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উত্তরাধিকারীদের অধিকার বিভিন্ন রূপের হয়ে থাকে। তবুও এটা অনস্বীকার্য যে এই আইন অনুযায়ী একজন মহিলা পুরুষের অর্ধেক পেয়ে থাকে।

'এক ছেলের অংশ হবে দুই কন্যা সন্তানের মতো' (সুরা নিসা ৪ : ১১)।

নারী পুরুষে আপাত দৃষ্টিতে এটা বৈষম্য মনে হলেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে একজন নারী যা পায় এর পাশাপাশি তারা এমন কিছু পায় যা পুরুষরা পায় না। স্বামীরা তাদেরকে দেন মোহর দিতে বাধ্য এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব মূলত স্বামীদের উপর বর্তায়। তাছাড়া সমাজে পুরুষদের তুলনায় নারীদের দায় দায়িত্ব অনেক কম। পুরুষরা জীবিকা নির্বাহের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত থাকে এবং পরিবারের অর্থনৈতিক বিষয়গুলো তাকেই প্রধানত দেখতে হয়। নারী ও পুরুষের পার্থক্য এখানে নিহিত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা উভয়েই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু দায় দায়িত্বের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের খাতিরেই তারা একে অপর থেকে ভিন্ন। নারীদের যে শারীরিক গঠন রয়েছে তার কারণেই তারা গর্ভধারণ ও শিশুদের লালন পালনের কাজটি উত্তমরূপে করতে পারে যা পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। পুরুষরা যেমন শক্তি সামর্থ্য তেমনি নারীরা দুর্বল ও আবেগ প্রবণ। আবেগের কারণে সাধারণত তারা মন মানসিকতার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না। মানসিক এই দুর্বলতার কারণেই সাক্ষীর ক্ষেত্রে তাদের দুইজনকে একজন পুরুষের সমান করা হয়েছে। কেননা এতে করে দুই মহিলার কোনো একজন যদি কিছু ভুলে যায়, অন্য জন তাকে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে (সুরা বাকারা ২ : ২৮২)।

www.amarboi.org

সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, ইসলাম একজন মুসলমানের অমুসলিম স্ত্রীর অধিকারের কথাও বিবেচনা করেছে। যারা আহলে কিতাব অর্থাৎ খ্রিষ্টান ও ইহুদি তাদের নারীদেরকে ইসলাম বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। তবে তারা যে আজীবন নিজেদের ধর্ম পালন করবে এটি কাঙ্ক্ষিত নয় : ধর্মে কোনো জোরাজুরি নেই (সুরা বাকারা ২ : ২৫৬)।

ছ. অমুসলিমদের অধিকার

এই বিষয়ে আলোচনার শুরুতে আমরা মদিনা রাষ্ট্রের সংবিধান তুলে ধরতে পারি যা সম্পূর্ণরূপে আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। এটি হচ্ছে পৃথিবীর সর্ব প্রথম লিখিত রাষ্ট্রীয় সংবিধান। এর কল্যাণে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। এই সংবিধান অনুযায়ী অমুসলিমরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম চর্চা ও প্রচার করতে পারে। এই সংবিধানটি ছিল মূলত মুসলিম ও ইহুদি এমনকি তাদের সাথে আরব মূর্তি পূজারীদের মধ্যে যারা সংযুক্ত হবে তাদের মধ্যে সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি ছিল প্রতিরক্ষামূলক যা একটি বিশ্ব ব্যবস্থার সূচনা করে। এরই মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় যা শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার আগে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হয়। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আগ্রাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে অনুমতি দেয়। এর পর বিভিন্ন যুদ্ধ দেখা দেয় এবং নবজাত রাষ্ট্রের জন্য সামরিক ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। প্রয়োজন দেখা দেয় সামরিক সেবা ও লোকবলের। তার পরও অমুসলিমদের কখনো সেনাবাহিনীতে জোরপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করা হতো না। বরঞ্চ তাদের কাছ থেকে সামান্য পরিমাণে কর হিসেবে জিজিয়া নেওয়া হত। এই জিজিয়ার বিপরীতে তাদের দেয়া হতো জান ও মালের নিরাপত্তা। যদি অমুসলিমদের কেউ সেনাবাহিনীতে যোগ দিত তখন তার এই জিজিয়া রহিত করা।

জিজিয়া হচ্ছে ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের উপর আরোপিত একটি কর। এই অমুসলিমরা জিজিয়ার বিনিময়ে নিরাপত্তা দাবি করে। কুরআনে এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

যাদের ইতিপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তায়ালার ওপর ইমান আনে না, পরকালের ওপর ইমান আনে না, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল যা কিছু হারাম করেছেন তা হারাম (বলে স্বীকার) করে না, (সর্বোপরি) যারা সত্য দ্বীনকে (নিজেদের) জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা

www.amarboi.org

লড়াই চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত না তারা পদানত হয়ে স্বেচ্ছায় জিজিয়া (কর) দিতে শুরু করে (সুরা তাওবা ৯ : ২৯)।

জিজিয়ার কোনো সঠিক অংশ নির্ধারণ করা হয়নি। তবে শাফিই (রহঃ) বলেন, প্রত্যক স্বাধীন ব্যক্তির কাছ থেকে বছরে এক দিনার নিতে। এর মাধ্যমে তারা মুসলিম সমাজের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। এই জিজিয়ার বলে তাকে শুধু মুসলিম সমাজে অবস্থান করতেই দেওয়া হবে না বরঞ্চ সে নিরাপত্তার দাবিরও করতে পারে। তাদের মধ্যে যারা পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ এবং যাদের যথার্থ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা রয়েছে তাদেরকেই এই কর দিতে হবে। নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের অব্যহতি দেওয়া হলো। তাদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ করা যাবে না। অন্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীরা যদি সম্পদশালী না হয় তাহলে তারাও এই কর দিবে না; দরিদ্র ও ভিখারিরাও এই কর দিবে না। সন্যাসীরা যদি দরিদ্র হয় তাহলে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। যদি প্রার্থনাগারগুলো ধনাঢ্য প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে তাদের ঊর্ধ্বতনদেরকে কর দিতে হবে। দাস দাসীরা এই কর থেকে মুক্ত[১৭]।

এই ভাবেই অমুসলিম সংখ্যালঘু- যাদেরকে আমরা জিম্মি বলে জানি তাদের জান ও মালের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ইসলাম নিশ্চিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে মহানবি সা. ঘোষণা দেন সাবধান! কেউ যদি কোনো জিম্মির সাথে অন্যায় করে কিংবা তার স্বার্থের বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় অথবা তার মালিকানায় থাকা কোনো জিনিস থেকে তাকে বঞ্চিত করে তাহলে কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব[১৮]। মহানবি সা. তাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার ব্যাপারে এতটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাদের নিয়ে ভাবতেন। তিনি বলেন : যে মুসলিম একজন জিম্মিকে হত্যা করল সে বেহেশতের সামান্যতম সুঘ্রাণও পাবে না। তাদেরকে তোমরা নিরাপত্তা দাও তারা হচ্ছে আমার জিম্মি (বুখারি, কিতাব আল-দিয়াত)। হযরত ওমর রা. কে যখন গুপ্ত ঘাতক চুরিকাঘাত করল তখন তার শেষ ওছিয়ত হিসেবে একই উদ্বেগ প্রকাশ করে : আমার পরে যে খলিফা হবে তার জন্য আমার ওছিয়ত আমি বলে গেলাম! জিম্মিরা আল্লাহ তায়ালা ও তার রসুলের নিরাপত্তা উপভোগ করে আসছে। তোমরা তাদের সাথে যে চুক্তি করেছো তার প্রতি শ্রদ্ধাশালী হও এবং প্রয়োজন পড়লে তাদের স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করে যেও। তাদের উপর এমন কোনো বুঝা চাপিয়ে দিও না যা তারা বহন করতে পারবে না (বুখারি, কিতাব আল- দিয়াত)। যে কোনো ইসলামি রাষ্ট্রে

---

[১৭] Shorter Ency. of Islam, Djizya, p. 91

[১৮] Al Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyah, p. 137

www.amarboi.org

অমুসলিমদেরকে নিরাপত্তার দাবিদার সংখ্যালঘু হিসেবে দেখা হয়। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের ব্যক্তিগত জীবন, সামষ্টিক স্বার্থ, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা বিধান করা। তাদের কখনো অপদস্ত করা যাবে না এবং ইসলামি আইনবিদগণ এই বিষয়ে একমত যে, কেউ যদি কোনো অমুসলিম নারীকে লাঞ্ছিত করে তাহলে মুসলিম নারীকে লাঞ্ছিত করার যে, শাস্তি তাকেও সেই শাস্তি দেওয়া হবে। তাছাড়া হক্ককে সোফার ক্ষেত্রে প্রতিবেশী যখন স্থাবর সম্পদ ক্রয় করার অধিকার রাখে সেই ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিম প্রতিবেশী সমান অধিকার। মোদ্দাকথা, ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমরা ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা উপভোগ করে। তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়ার বিধান রয়েছে এবং ইসলামের বিশ্বজনীন আইন মোতাবেক তারা ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে থেকে সামাজিক ও বিচারিক স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করতে পারে। নিঃসন্দেহে এটি ইসলামের সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতীক।

আমরা এই যাবত যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি সেগুলো থেকে বুঝা যায় যে সব ধরনের চরমপন্থা থেকে ইসলামি ব্যবস্থাগুলো মুক্ত এবং নৈতিক সমাজ গঠনের জন্য যে গুণাবলীগুলো দরকার সেগুলো সবই ইসলামি রাষ্ট্রে বিদ্যমান। এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মন্দের কোনো স্থান নেই বরঞ্চ নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সোনালি পন্থা অবলম্বন করা হয়। যা কিছু ভালো তাই ইসলামি সমাজে সমাদৃত। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশ্বজনীন এবং তাকে আমরা এমন একটি বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে তুলনা করতে পারি যা সার্বিকভাবে মানব জাতিকে নিরাপত্তা দিবে। এখন আমরা ইসলামি আইন ও বিচারের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব, কেননা ইসলামি সমাজের সুশৃঙ্খল জীবনের মূল হচ্ছে এটি।

www.amarboi.org

চর্তুদশ অধ্যায়

আইন ও বিচার

১. ইসলামি শরিয়ত

ইসলামি আইন হচ্ছে ঐশী আইন। প্লেটোর মতে এটি হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে এক ধরনের চুক্তি যার উৎস হচ্ছে ব্যবহার ও প্রথা। পক্ষান্তরে ইসলামি আইন আল্লাহ তায়ালার বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু ইসলামি আইন হচ্ছে ঐশী প্রকৃতি সেহেতু তা মানব রচিত আইন থেকে ভিন্ন। কেননা মানব রচিত আইনের উৎস হচ্ছে প্রথাসিদ্ধ নিয়মনীতি। মানব রচিত হওয়ার কারণে এটি ব্যবহারিক জীবনে কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণবিধি প্রবর্তন করতে পারে না। পক্ষান্তরে ঐশী বাণীর আইনগুলোর রয়েছে ভালো ও মন্দ, পাপ ও পুণ্যের নির্দিষ্ট বিশ্বজনীন মানদণ্ড।

ঐশ্বরিক আইন হচ্ছে সঠিক আচরণের মানদণ্ড এবং সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের সকল দিক নির্দেশনা এর মধ্যে নিহিত। তাছাড়া এখানে বস্তুনিষ্ঠভাবে ভালো ও মন্দের পার্থক্য করা হয়েছে। এখানে রয়েছে সুশৃঙ্খল দায় দায়িত্বের বিধান, অন্যের অধিকারের নিরাপত্তা। যেহেতু এটি আল্লাহ তায়ালার প্রজ্ঞা থেকে উৎসারিত সেহেতু এটি হচ্ছে সকল কল্যাণের মূল যা সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। আল্লাহ তায়ালার আইনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য কিছু মূলনীতিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এর বিপরীতে, মানব রচিত আইন মানবিক চিন্তাধারা ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে রচিত হওয়ার কারণে তা ভুল ভ্রান্তির শিকার হতে পারে। এটি রচিত হয় মূলত সমাজের চাহিদা অনুযায়ী এবং তার স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য। তাই সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে এটারও পরিবর্তন হতে থাকে। মানব রচিত আইন টিকতে হলে সাধারণ জনগণের মতামতের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয় কিংবা মাঝে মধ্যে তা নির্ভর করে রাজাধিরাজদের হেয়ালিপনার উপর। তাই আল্লাহ তায়ালার আইন যে, সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধানের মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে মানব রচিত আইন তা কখনো পারবে না।

www.amarboi.org

আইন হচ্ছে মানবিক বিবেচনায় কিছু বিধি বিধানের সমষ্টি। তার উৎস যাই-ই হোক না কেন- প্রাতিষ্ঠানিক আইনের বিধান সামাজিক প্রথা। এ লোকে কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ যখন স্বীকৃতি দেয় তখন প্রজা কিংবা সদস্যদের সবাইকে এগুলো মেনে চলতে হয়। কিন্তু এর সংজ্ঞায় আইনবিদদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। তারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর সংজ্ঞায়ন করেছে।

টেলিওলজিক্যাল স্কুল এর মতে আইন হচ্ছে মানবিক যুক্তির ফলাফল এবং তা উদ্দেশ্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত[১]। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে : আইনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কী? দার্শনিকদের অনেকেই মনে করেন যে, ন্যায়বিচার হচ্ছে আইনের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং তারা মানবিক ও প্রাকৃতিক বিচারের মধ্যে ব্যাপক প্রার্থক্য করেছেন যা আমাদের দীর্ঘায়িত দার্শনিক আলোচনা ও বিতর্কের দিকে নিয়ে যায়। *কেলসেন* আইনকে দার্শনিক জটিলতার কুয়াশা থেকে মুক্ত করার জন্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে আইনকে আলাদা করতে বলেন। কেননা প্রথমটি কারণ ও প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। তার মধ্যে আইন হচ্ছে বিধি বিধান দ্বারা নির্ধারিত অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্যসমূহের অধ্যয়ন। তাই তার মতে আইন থেকে নীতি বিজ্ঞান ও সামাজিক দর্শন অনেক ভিন্ন। পক্ষান্তরে পাউন্ড আইনের পরিপ্রেক্ষিতের উপর জোর দেন যেহেতু তা মানুষের চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত। ঐতিহাসিক ধারার সেভিগনি মনে করেন যে, আইনের মূল উৎস হচ্ছে কৃষ্টি ও প্রথা যা মানুষের মনে গভীরভাবে প্রোথিত। অস্টিনিয়ানের স্কুল এর মতে, আইন হচ্ছে সার্বভৌমের আদেশ এবং এর কল্যাণ ও মন্দের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। বিধান থেকে একে আলাদা করতে হবে যেহেতু আইন উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত আর তা হচ্ছে বৃহত্তর জনসংখ্যার সুখ ও সমৃদ্ধি।

বর্তমান বিশ্বে অনেকেই বেন্থাম এর উপযোগিতাবাদ মতবাদে বিশ্বাসী। এই মতবাদ অনুযায়ী কর্মকাণ্ডের নৈতিকতা যাচাই করা হবে উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে। তাই বৃহত্তর জনসংখ্যার সমৃদ্ধি হবে বিধানের একমাত্র লক্ষ্য, তবে ঐশ্বরিক আইনের উদ্দেশ্য সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ নিশ্চিত করা।

হেডোনিস্টিক মূলনীতি অনুযায়ী সুখের মধ্যেই সকল কল্যাণ নিহিত এবং এর উপরই মানবিক আইন প্রতিষ্ঠিত। তবে এটি ইসলামি মর্ম ও শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সকল কল্যাণ ঐ জীবনেই অন্তর্নিহিত যা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত। আর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে তার আইনে। কেননা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন সমগ্র মানবতার জন্য প্রকৃত কল্যাণ কোনটি।

---

[১] Paton, Jurisprudence, p.3

www.amarboi.org

ক. ইসলামি আইন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ব্যবস্থা

প্রাচীন মতবাদ অনুযায়ী ইসলামি আইন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধান, একটি ঐশ্বরিক আদেশমূলক ব্যবস্থা যা ইসলামি রাষ্ট্রের আগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এটি মুসলিম সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে, মুসলিম সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না[২]। ইসলামি আইনের প্রাধান্য সমাজ ও রাষ্ট্রেরও উর্ধ্বে। ইসলামি রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আইনকে বলবৎ করা। এই আইনের লক্ষ্য হচ্ছে সঠিক পথ প্রদর্শন করা এবং চরিত্রের সেই মাপকাঠি নির্ধারণ করা যা মানবিকতার সেবায় আনন্দ পাবে। আইন হচ্ছে অধিকার ও দায়িত্বের সমষ্টি, চিরস্থায়ী ও ন্যায় পরায়ণমুখী, তা সর্বকালের জন্য সকল মানব জাতির জন্য প্রবর্তিত।

ইসলামি আইনে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছে সকল সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং তিনি হচ্ছেন আইনের উৎস। সকল আনুগত্য তারই জন্য। যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্ব শক্তিমান যেহেতু মানুষের কর্মকাণ্ড নির্ধারিত হয় তার ইচ্ছার দ্বারা[৩]। এই হচ্ছে ইসলামি আইনের বৈশিষ্ট্য যার কারণে একজন মুসলমানকে সত্যিকারের ইমান ও আন্তরিকতার সাথে এই আইন যথাযথ পালনে ব্রতি হতে হয়।

ইসলামি আইন বিজ্ঞানকে বলা হয় ফিক্‌হ। এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞান অথবা কোনো কিছু বুঝায়। ইমাম আবু হানিফার মতে ফিক্‌হ হচ্ছে মানুষের জন্য যা হিতকর ও তার জন্য যা অনিষ্টকর তার জ্ঞান। এর অর্থ হচ্ছে মানুষ মূলত কী কী করতে পারে এবং কী কী তার জন্য নিষিদ্ধ তার জ্ঞান। এর মধ্যে অর্জন ও বর্জনের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থে একই হচ্ছে এমন বিজ্ঞান যা মানুষের স্বাধীনতার সঠিক সীমারেখা নির্ধারণ করে। অর্থাৎ এটি হচ্ছে দায় দায়িত্বের বিজ্ঞান।

খ. ইসলামি আইনের বৈশিষ্ট্য

ইসলামি আইনের কিছু ধর্মীয় দায় দায়িত্ব সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এই দায় দায়িত্বগুলো একজন মুমিনকে পালন করতে হয়। আল্লাহ তায়ালার আইন তার স্বকীয়তা বজায় রাখবে যদি পৃথিবীতে তা বলবৎ করার মতো কেউ নাও থাকে[৪]। মুসলমানরা যদি ইসলামি রাজ্যের বাইরেও থাকে তবুও তাকে এই আইন মেনে চলতে হয়। কেননা, এই আইন নাযিল হয়েছে ব্যক্তি হিসাবে মুমিনদেরকে একতাবদ্ধ করার জন্য তারা যেখানেই থাকুক না কেন। ইসলামি আইনের প্রধান

---

[২] Coulson, A History of Islamic Law, p.1.

[৩] সহিহ, বুখারি, খ. ১, পৃ. ২।

[৪] Fitzgerald, Nature and Sources of Sharia in Law in the Middle East, p. 85

www.amarboi.org

বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে বৃহত্তর সমাজের স্বার্থ। যদি ব্যক্তি স্বার্থ ইসলামি স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখনই ব্যক্তির স্বার্থকে সার্বিক নিরাপত্তা দেওয়া হয়[৫]।

ইসলামি আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক সঙ্গতি ও সংস্কার। এই জন্য এখানে বিভিন্ন উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে তবে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। কিন্তু গর্হিত কর্মকাণ্ড ও অপরাধ যখন বেপরোয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন কিছু শাস্তির বিধান পালন করতে হয়। এ সবেরই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করা। এই জন্য দেখা যায় হত্যা, শারীরিক আঘাত, অনাচার, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা অপবাদ এবং মদ্যপানের মতো অপরাধ ও গর্হিত কর্মকাণ্ডগুলো প্রতিহত করার জন্য রয়েছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান। পক্ষান্তরে সুদ, জুয়া ও অন্যান্য ভদ্রবেসি অপরাধগুলোর শাস্তি আখিরাতের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। এগুলো মূলত সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলার চাইতে বাণিজ্যিক লেনদেনের সাথে অধিকতর সম্পৃক্ত। ইসলামি আইনের মূলনীতি হচ্ছে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং প্রয়োজনে আইনের জোরালো প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকে পুনর্গঠিত করা। এই জন্য নিজেকে সুধরাবার জন্য সুযোগ ও পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়।

ইসলামি আইনের উদ্দেশ্য মূলত দুই ধরনের উপকার এবং সামাজিক কল্যাণ। তাই এর প্রধান নীতি হচ্ছে প্রতিদানের মাধ্যমে আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করা এবং শাস্তি আরোপের মাধ্যমে অবাধ্যতাকে নিরুৎসাহিত করা। এই দুনিয়াতে কিংবা আখিরাতে শাস্তি প্রয়োগ করা হতে পারে। কিন্তু প্রতিদান শুধুমাত্র মৃত্যুর পর দেওয়া হবে যা হবে চিরস্থায়ী।

মানবিক সকল কর্মকাণ্ড ও লেনদেনের মূল্যায়ন হয় মন্দ ও ভালো সম্পর্কিত নীতিমালার মাধ্যমে। এটি হচ্ছে ইসলামি আইনের মূল বৈশিষ্ট্য যার সামাজিক ঐক্য ও সঙ্গতির নিশ্চয়তা প্রদান করে। ইমাম শাফী ইসলামি আইনের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করার জন্য ব্যাপক সংগ্রাম চালিয়ে যান এবং এই লক্ষ্যে তিনি কুরআন ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরার পক্ষে বক্তব্য দেন। তার মতে কুরআনের ন্যায় মহানবি সা.-এর বাণী অথবা হাদিসও হচ্ছে আইনের কর্তৃত্বধারী উৎস[৬]। এর পাশাপাশি ইজমা অথবা কোনো বিষয়ে আইনবিদদের ঐক্যমত এবং কিয়াস অথবা তুলনামূলক বিশ্লেষণও আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা যেতে পারে। ফিকাহ্ শাস্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি ইসলামি আইনের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রাখার জন্য বিভিন্ন

---

[৫] Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, p. 26

[৬] Khadduri, Shafi'i's Risala, p.36

www.amarboi.org

বিধানের প্রবর্তন করেন। ইসলামি আইনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তৎদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। তার মতে কুরআন ও সুন্নাহর ঐশী বাণী অনুযায়ী জীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান করতে হবে। ঐশী বাণীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবিক আচরণের সঠিক মানদণ্ড প্রবর্তন করা। তাই এই বাণীতে এমন কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে যা সামাজিক লক্ষ্য ও অনুপ্রেরণাকে শক্তি যোগাবে।

সুশীল সমাজের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে দুর্বলের জন্য দয়া, বাণিজ্যিক লেনদেনে সততা, বিচারিক ব্যবস্থায় দুর্নীতির অনুপস্থিতি ইত্যাকার বিষয় সদস্যদের মেনে চলতে হয়। গর্হিত কর্মকাণ্ড, যেমন সুদ, জুয়া ইসলামি ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত আইনের মূল উদ্দেশ্য মানব জীবনের গঠন এবং সমাজকে পুণ্যের উপর ভিত্তি করে গঠন করা। তার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতিকে পাপ থেকে পরিশুদ্ধ করা এবং এই জন্য সৎলোকের একটি দল গঠন করা যারা ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজের প্রতিবাদ করবে (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১১০)।

বর্তমান বিশ্বে যে ধর্মনিরপেক্ষ আইন রয়েছে তা যুক্তিমুখী হলেও ভুলের উর্ধ্বে নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত আইনের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা যা ঐশী বাণী আকারে মহানবি সা.-এর উপর নাযিল হয়। বিভিন্ন গোত্র ও জাতীয় বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ইসলামি ব্যবস্থা মুমিনদের একক সমাজে বিশ্বাসী। এখানে আঞ্চলিক বিভেদ কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। ভূগোল কিংবা জাতীয়তাবাদ নয়। বরং মানব জাতির জন্য উত্তম সামঞ্জস্য বিধানকারী শক্তি হচ্ছে ধর্ম। ইসলামি ব্যবস্থায় রাষ্ট্র কুরআনের অধীন যা বাড়তি কোনো বিধানের ক্ষেত্র তেমন রেখে যায়নি এবং এগুলো সকল বিরোধিতা ও সমালোচনার উর্ধ্বে। এই পৃথিবীকে দেখা হয় পরকালের সাফল্যের সোপান হিসেবে। তাই কুরআনে অন্যান্যের প্রতি কি কি আচরণ মানুষ করবে এবং সমাজের প্রতি কী দায়িত্ব পালন করবে তা বিধৃত হয়েছে সুন্দরভাবে যাতে দুনিয়া থেকে আখিরাতে পৌঁছাবার পথ সহজ ও নিরাপদ হয়। রাজনৈতিক কিংবা বিচারিক মতবাদগুলোকে মহানবি সা.-এর শিক্ষা থেকে পৃথক করা যাবে না। তার শিক্ষায় আমরা ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঠিক আচরণবিধি পেতে পারি[৭]।

পাপ ও পুণ্য, মন্দ ও ভালো যুক্তির আলোকে নির্ধারণ করা যায় না। কেননা, আমরা কোনো কিছুকে নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মনে করলেও বাস্তবে হয়তো তা আমাদের জন্য উপকারি :

---

[৭] Jackson, Foreword to Law in the Middle East, pp.6-7

www.amarboi.org

> কিন্তু তোমাদের জেনে রাখা উচিত, এমনতো হতে পারে যা তোমাদের ভালো লাগে না, তাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার একইভাবে এমন কোনো জিনিস, যা তোমাদের খুবই ভালো লাগবে কিন্তু তা হবে তোমাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর; আল্লাহ তায়ালাই সবচাইতে ভালো জানেন, তোমরা জান না (সুরা বাকারা ২ : ২১৬)।

এই জন্য, ইসলামি আইন মানবিক কর্মকাণ্ড সমূহকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছে যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে প্রকৃত কল্যাণ কোথায় নিহিত। সেগুলো হচ্ছে :

১. ফরজ বা আবশ্যক
২. হারাম বা নিষিদ্ধ
৩. মাকরুহ বা বেঠিক,
৪. মানদুভ বা যা করলে ভালো,
৫. মুবাহ বা অনুমোদিত।

ফরজ হচ্ছে এমন বাধ্যবাধকতা যা মানুষকে আবশ্যকভাবে পালন করতে হয়। হারাম বা নিষিদ্ধ হচ্ছে কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা। যখন কোনো কিছুর দাবি জোরালোভাবে করা হয় না তখন সে কাজটি করলে হয় মন্দুভ বা আমরা নফল বলে জানি। যদি কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা উত্তম হয় তাহলে তা হয় মাকরুহ বা নিন্দনীয়। যে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ও রসুলের নির্দেশও নেই সেগুলোকে ধরা হয় মুবাহ বা অনুমোদিত। যে কাজগুলোর ব্যাপারে কোনো আবশ্যকতা বা নিষেধাজ্ঞা কিংবা নিন্দা নেই সেগুলোই হচ্ছে এর শেষ পর্যায়[৮] এবং এর জন্য দরকার নতুন বিধানের।

গ. বিধান

যে সকল বিষয়ে মূল আইনের কোনো বিধান নেই সে সকল ক্ষেত্রে নতুন বিধান প্রবর্তন করা যেতে পারে। ইসলামি আইন এটাই ব্যাপক যে তার এমন কিছু মূলনীতি রয়েছে যাকে অবলম্বন করে সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো সম্ভব। মুসলিম সমাজের মধ্যে যারা আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে পারদর্শী তারা এই নতুন বিধান জারি করার অধিকার রাখেন। ইবনে কাইয়েম এর মতে এই ধরনের লোককে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে এবং শরিয়া প্রবর্তনের কারণ ও উদ্দেশ্যগুলো সম্বন্ধে তার উত্তম অন্তর্দৃষ্টিও থাকতে হবে[৯]।

---

[৮] A. Rahim, Muhammadan Jurisprudence, p. 61.

[৯] ইবনুল কাইয়িম, খ. ২, পৃ. ২০।

www.amarboi.org

ইসলামি আইনে নতুন বিধান জারি করার অর্থ হচ্ছে মৌলিক বিধানগুলোর আলোকে জীবনে উদয় হওয়া নতুন সমস্যার সমাধান দেওয়া। যেমন কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ব্যবসা বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন এবং সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন। এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিভাষাটি ব্যাপক এবং মহানবি সা.-এর হাদিসের আলোকে এর সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব যার আলোকে আমরা আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন বাণিজ্যিক লেনদেনে সমস্যা সমাধান করতে পারি। কিন্তু যদি মনে হয় নতুন ধরনের কোনো লেনদেন এই হাদিসের আলোকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন প্রয়োজন ও চাহিদার আইন প্রযোজ্য হবে।

ইমাম শাফী রহ. ঘোষণা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালার আইন হচ্ছে সকল বিষয়ে প্রযোজ্য এবং সকল ঘটনার জন্য তার সম্ভাব্য সমাধান দিয়ে রেখেছে। আল কুরআনে এর ঘোষণা স্পষ্ট রূপে দেওয়া হয়েছে :

> আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি, মুসলমানদের জন্য এই কিতাব হচ্ছে দ্বীন সম্পর্কিত সব কিছুর ব্যাখ্যা, আল্লাহ তায়ালার হেদায়াত ও মুসলমানদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ স্বরূপ (সুরা নাহল ১৬ : ৭৯)।

এখানে যে ব্যাপ্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার আলোকেই আমরা প্রয়োজন ও চাহিদার বিধান খুঁজে পেতে পারি এবং জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআনের এই ঘোষণাই যথেষ্ট।

এখন আমরা খোলাফায়ে রাশেদীনদের আইন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করব। মহানবি সা. যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন কোনো সমস্যা হয়নি। কেননা তিনি নিজেই মুসলমানদেরকে পথ দেখাতে এসেছেন এবং কোনো সমস্যা দেখা দিলে ঐশী বাণীর মাধ্যমে তার সমাধান করা হতো। কিন্তু তার অন্তর্ধানের পর ঐশী বাণী আসা বন্ধ হয়ে যায় এবং সাহাবীদের কুরআনের আয়াতের আলোকেই সকল বিধি বিধান প্রবর্তন করতে হতো। এই ক্ষেত্রে আমরা কিয়াস বা তুলনামূলক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রথম খলিফা আবু বকর রা.-এর নির্বাচনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি। মহানবি সা. মৃত্যুর পূর্বে তাকে ইমামতি করতে বলেছিলেন। তাই মুসলিম সমাজ তাকে এই প্রত্যায়নের উপর ভিত্তি করে খলিফা নির্বাচন করে। তারা দেখলেন যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে সে পার্থিব বিষয়েও নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, ইসলামি আইনে নতুন বিধান জারি করার অর্থই হচ্ছে কিয়াস বা তুলনামূলক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নতুন কোনো বিধান প্রবর্তন

www.amarboi.org

করা। কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে ইসলামি আইনের দুইটি প্রধান উৎস এবং কিয়াস হচ্ছে এই দুইয়ের আওতাধীন একটি আইনী প্রক্রিয়া। যদি এই ধরনের কোনো বিশ্লেষণ সাধারণ ঐক্যমত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তা গণ ঐক্য বা ইজমায় পরিণত হয় এবং এটিও ইসলামি আইনের একটি উৎস। এই উৎসের মাধ্যমে প্রবর্তিত আইনের উপরও তুলনামূলক বিশ্লেষণ বা কিয়াস চর্চা করা যায়। ইমাম শাফীর মতে, মৌলিক আইনের উৎসের পাশাপাশি ইজমা ও কিয়াসও হচ্ছে আরো দুইটি উৎস। ইজমা হচ্ছে মহানবি সা.-এর উম্মতের মধ্যে যারা ফিকাহবিদ কোনো বিষয়ে তাদের ঐক্যমত। কুরআনে সুন্নাহর বিভিন্ন বাণীর আলোকে আইনের এই উৎস প্রমাণিত। কিয়াস এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে মাপা, সমান করে দেখা ইত্যাদি। আইনের উৎস হিসেবে এর সংজ্ঞা হচ্ছে মূল বিধানের উপর ভিত্তি করে নতুন কোনো বিষয়ে বিধান প্রবর্তন করা। এই ক্ষেত্রে মাধ্যম হচ্ছে ইল্লত বা কার্যকর কারণ। শুধুমাত্র আদি বিধানের ভাষার ব্যাখ্যার আলোকে যে সমস্যা সমাধান করা যায় না সেই ক্ষেত্রে কিয়াস প্রযোজ্য। সহজ ভাষায় কিয়াস হচ্ছে এমন নতুন কোনো বিষয়ে আইনের প্রবর্তন করা যা পূর্ববর্তী বিধানের ভাষার আলোকে সমাধান করা সম্ভব নয়। এটি হচ্ছে বিশ্লেষণমূলক প্রক্রিয়া যা মূল বিধানের যুক্তির আলোকে চর্চা করা হয়। এই ভাবেই ইসলামি শরিয়তের মূল শিক্ষা ধরে রাখা হয় যাতে করে সমাজ ও আইনের ঐক্য বজায় থাকে।

এই ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে বলা হয় ইজতেহাদ যার অর্থ হচ্ছে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল বিধান থেকে নতুন কোনো বিধান বের করা।

খোলাফায়ে রাশেদীনগণ ইল্লাত বা অভিন্ন কারণের আলোকে এই পদ্ধতি চর্চা করেছেন যা আমরা হযরত আবু বকর রা. কে প্রথম খলিফা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে দেখতে পাই। ইজতেহাদ হচ্ছে কিয়াসের পূর্ণাঙ্গরূপ। যদি কোনো ইল্লত বা অভিন্ন কারণ পুরাতন বিধান ও নতুন সমস্যার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে মুজতাহিদ বা সঠিক ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে পারে। তাওয়িল আরবি শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যাখ্যা। কিন্তু এর প্রকৃত হচ্ছে কোনো উপসংহারে কিংবা সিদ্ধান্তে পৌছানো। এর অর্থ হলো বিধান প্রবর্তনকারী কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ও বাণীর আলোকে পুরাতন বিধানের অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করা। বাজনবি তার কাশ গ্রন্থে তাওয়িলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, এটি হচ্ছে কোন প্রমাণ সাপেক্ষে সন্দেহপূর্ণ অর্থকে খণ্ডন করার মতো ব্যাখ্যা চর্চা করা[১০]।

---

[১০] বাযদাওয়ী, কাশফ, পৃষ্ঠা-৪৪।

www.amarboi.org

তাওয়িল বা স্পষ্ট ব্যাখ্যা হচ্ছে খলিফারা কি রূপ চর্চা করতেন তার প্রমাণ আমরা হযরত ওমর রা.-এর মাঝে পাব। দান হচ্ছে শুধুমাত্র চাহিদাসম্পন্ন ও দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য, আর যারা তার সংগ্রহ করে এবং যাদের দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করতে অর্থের প্রয়োজন তাদের জন্য। তাছাড়া গোলামকে মুক্ত করার জন্য এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সহায়তা করার জন্য। তা যারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় যুদ্ধ করে এবং পথিকদের জন্য। এটি কুরআনের আয়াত (সুরা তাওবা ৯ : ৬০) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এখানে এক দলের কথা বলা হয়েছে যারা ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে কিছু আর্থিক প্রণোদনার আশায় থাকে। কিন্তু খলিফা যখন দেখলেন ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণে এই ধরনের আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে তখন তিনি এই খাতে যাকাত বিতরণ বন্ধ করে দেন। কারণ যেহেতু আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না সেই জন্য এই বিধান প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তাও আর থাকল না।

কুরআনের আয়াতে এখানে স্পষ্ট কোনো কারণের উল্লেখ নেই। কিন্তু হযরত ওমর রা. তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বের করেন এবং এই ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ তায়ালার বিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ও পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করেন।

এখান থেকেই বুঝা যায়, সমাজে উদ্ভূত যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে এ তাওয়িলের। এজন্য ইমাম শাফেয়ী রা. কোনো বাণি ব্যাখ্যা প্রক্রিয়ার বৈচিত্রকে সাধুবাদ জানান। একটি বাণির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এতে ব্যবহৃত শব্দাবলির আলোকে, অন্তর্নিহিত অর্থের সাহায্যে, মহানবি সা.-এর হাদিসের মাধ্যমে, এমনকি পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে[১১]। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমাজের চাহিদা ও পরিস্থিতির আলোকে আয়াত সমূহের উপযুক্ত ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর দুয়ার এখনো উন্মুক্ত, তাতেও যদি প্রয়োজন না পুরুন হয় তাহলে চাহিদা ও প্রয়োজনের নীতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আমরা পুনরায় খলিফা ওমর রা.-এর বরাত দিয়ে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারি। কুরআনে বলা হয়েছে (সুরা মায়েদা ৫ : ৩৮) নারী হোক পুরুষ হোক চুরির জন্য উভয়ের হাত কাটা হবে। কিন্তু তার শাসন আমলে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল তখন প্রয়োজনের স্বার্থে এবং মানুষের জীবন রক্ষার্থে তিনি এই বিধান স্থগিত করেন[১২]। তিনি মহানবি সা.-এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এই কাজটি করেন। প্রয়োজনের

---

[১১] Khadduri, op. cit., p. 35

[১২] Mahamassani, The Philosophy of Jurisprudence of Islam, p. 97

www.amarboi.org

স্বার্থে ইসলামি আইনবিদগণ প্রয়োজন নিষিদ্ধকে বৈধ করে নীতিটি প্রবর্তন করেন। যদি কোনো বিষয় বিলাসিতার পরিবর্তে কষ্টমুখী ভীষণ চাহিদা বা প্রয়োজন বলে মনে হয় তখন ইসলাম সেটিকে প্রাণ রক্ষার্থে অনুমোদন করে। তবে কোনোক্রমেই ইসলাম বিলাসিতাকে উৎসাহিত করে না।

ঘ. প্রয়োজন ও চাহিদার আইন

উসমানী ও বেসামরিক আইন (Ottoman Civile Code) মাযাল্লার ২১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে 'প্রয়োজন নিষিদ্ধকে বৈধ করে।' ইমাম গাজ্জালীর মতে প্রয়োজনের কারণে নিষিদ্ধ জিনিসও বৈধ হতে পারে[১৩]। এটি প্রমাণ করার জন্য আমরা অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম হবো। দেখা যায় এই ধরনের নীতির আওতায় অনেকেই আবশ্যক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। যেমন, ছোট শিশু, পাগল, অসুস্থ ব্যক্তি, অজ্ঞতা এবং জোর জবরদস্তি[১৪]। ইসলামি আইন কঠোরতা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে যাতে তা অনুসারীদের উপর বুঝা হয়ে না দাঁড়ায় : আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য সহজতা চান এবং কঠোরতা চান না (সুরা বাকারা ২ : ১৮৫)। ফিজ্জাল প্রয়োজনের এই আইনকে আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে দেখেছেন[১৫]। একজন ঘোড় সওয়ার সৈনিক যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থান করেন তাহলে ঘোড়ায় বা বাহনে বসেই নামাজ আদায় করতে পারবেন। রোজা রাখার সময় কোনো কিছু খাওয়া নিষেধ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়ম ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে। একজন মুসলমান তার জান বাঁচাতে প্রয়োজনে নিষিদ্ধ জিনিস ভক্ষণ করতে পারে।

আইন পালনের ক্ষেত্রে যদি কেউ খুতখুতে মনোভাব অবলম্বন করে কঠোরতা পালন করে তাহলে তা হবে তার জন্য অনিষ্টকর। তাই ইসলাম প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এই প্রয়োজন ও চাহিদার আইন প্রবর্তন করেছে। ক্ষুধার কারণে মানুষ মারা যেতে পারে। তাই প্রয়োজনে জান বাঁচাতে নিষিদ্ধ জিনিস ভক্ষণ বা পান করার অনুমতি রয়েছে। তবে এই আইন একেবারেই উন্মুক্ত নয় বরঞ্চ নির্ধারিত সীমাবদ্ধতা পালন করেই তা কাজে লাগানো যায়। এই প্রসঙ্গে কুরআন নির্দেশ হচ্ছে :

> অবশ্যই তিনি মৃত (জন্তুর গোশত), সব ধরনের রক্ত ও শুকরের গোশত হারাম (ঘোষণা) করেছেন এবং (এমন সব জন্তুও হারাম করছেন) যা

---

[১৩] গাজ্জালী, ওয়াজীয, ২/২১৬

[১৪] Mahamassani, op. cit. p. 97

[১৫] Fitzgerald, opKe. cit., p. 102

www.amarboi.org

> আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই (কিংবা উৎসর্গ) করা হয়েছে, তবে (সে ব্যক্তির কথা আলাদা) যাকে (এজন্য) বাধ্য করা হয়েছে, যদি সে ব্যক্তি এমন হয় যে, সে (আল্লাহ তায়ালার আইনের) সীমা লঙ্ঘনকারী হয় না, অথবা (যেটুকু হলে জীবনটা বাঁচে তার চাইতে বেশি ভোগ করে না) অভ্যস্ত হয়ে পড়ে না, তাহলে (এই অপরাগতার সময়ে হারাম খেলে) তার ওপর কোনো গোনাহ নেই; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, তিনি অনেক মেহেরবান (সুরা বাকারা ২ : ১৭৩)।

আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এখানে বলা হয়েছে যদি সেই ব্যক্তি এমন হয় যে, সে সীমা লঙ্ঘনকারী হয় না অথবা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে না। এর ব্যাখ্যায় তাবারী বলেছেন নিষিদ্ধ জিনিসটি ভক্ষণ করার কোনো আগ্রহ থাকতে পারবে না। তাই যতটুকুতে তার প্রয়োজন মিটে যায় ততটুকুতে তাকে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। তবে যদি সে তা থেকে বিরত থাকতে পারে তাহলেই উত্তম হয়। কেননা জিনিসটি মূলত অবৈধ[১৬]। এই প্রসঙ্গে রাজী বলেন, যদি এই ধরনের সংকটাপন্ন অবস্থা আর বিরাজ না করে তাহলে এই আয়াতের নির্দেশনা পালন করারও বৈধতা থাকে না[১৭]।

ইবনে কাইয়েম প্রয়োজন ও চাহিদার মধ্যে একটি সীমারেখা এঁকে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাকে বলা হয় সাদ- আল দারায়ে। এটি তখনই অনুমোদিত হয় যখন এর প্রয়োজন প্রকট হয়ে পড়ে। কিন্তু কোনো নিষিদ্ধ জিনিস অতি প্রয়োজন ছাড়া কখনো অনুমোদিত হতে পারে না। এখানে যে পার্থক্য করা হয়েছে তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে[১৮]। ইসলামি আইনের চারটি উৎস ও তার সম্পূরক হিসেবে আমরা প্রয়োজন ও চাহিদার আইন নিয়ে আলোচনা করেছি এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাধানের জন্য এগুলোই যথেষ্ট। এখন আমরা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত আইনের ন্যায়বিচার সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করব।

২. ন্যায়বিচার

ক. সংজ্ঞা

ন্যায় বিচারের অর্থ হচ্ছে নৈতিকভাবে সঠিক হওয়া। দুইটি প্রধান অর্থে এর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই, (১) কোনো ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য দিয়ে দেওয়া, এবং (২) ন্যায়

---

[১৬] তাবারী, তাফসীর, ২/৩২৪

[১৭] রাজী, তাফসীর, কাবির, ২/১৩১

[১৮] M. Muslehuddin, Islamic Jurisprudence and the Rule of Necessity and Need, p. 63

www.amarboi.org

ও অন্যায়ের মধ্যে সঠিক পার্থক্য করা যার আলোকে সীমারেখা লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেওয়া হবে। ইসলাম উভয় ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠা চায়। আবু বকর রা. বলেন :

> আল্লাহ তায়ালার কসম, তোমাদের মধ্যে যে সবচাইতে পরাক্রমশালী সে হবে দুর্বল, এবং যে দুর্বল সে হবে পরাক্রমশালী, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাদের কাছ থেকে অধিকার ছিনিয়ে নেয়[১৯]।

এই প্রসঙ্গে খলিফা ওমর রা. বলেন :

> কেউ যেন আমার পক্ষ থেকে অন্যায়ের শিকার না হয় অথবা আমি যাতে কারো অধিকার খর্ব না করি। কেউ যদি তা করে আমি তাকে কঠোর শাস্তি দিব। যাতে সে অন্যের অধিকার তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়[২০]।

প্লেটো তার *রিপাবলিক* গ্রন্থে ন্যায়বিচারকে চারটি মৌলিক পুণ্যের একটি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অপর তিনটি হচ্ছে দয়া, প্রজ্ঞা ও সাহস। একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হচ্ছে আত্ম শৃঙ্খলা সম্পন্ন মানুষ যিনি যুক্তির মাধ্যমে নিজের আবেগকে সংবরণ করতে পারেন। প্লেটোর মতে যুক্তি হচ্ছে সকল পুণ্যের জলধারা। কিন্তু ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করে দেখেছি যে, যুক্তিও ভুলের শিকার হতে পারে এবং সর্বক্ষেত্রে তা সমান নাও হতে পারে। ইসলামের ন্যায়বিচার যেহেতু সকল ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে সেহেতু এখানে শুধু ভালোর কথা বলা হয় না বরঞ্চ ভালোর দিকে ফেরার আহ্বান জানানো হয়েছে।

> অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজকর্ম ও সীমালঙ্ঘনজনিত সব কাজ থেকে নিষেধ করেন, তিনি তোমাদের (এগুলো মেনে চলার) উপদেশ দেন, যাতে করে তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো (সুরা নাহল ১৬ : ৯০)।

এই বিষয়ে আরো অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে :

> আর যখন মানুষের মাঝে কোনো কিছুর ব্যাপারে তোমরা বিচার করবে তখন তা ন্যায় ইনসাফের ভিত্তিতে করবে (সুরা নিসা ৪ : ৫৮)।

এই বিষয়ে আরো অনেক আয়াতে জোর দেয়া হয়েছে :

---

[১৯] আবু উবাইদ, কিতাব আল-আমওয়াল, পৃষ্ঠা-৮

[২০] আবু ইউসুফ, কিতাব আল খারাজ, পৃষ্ঠা-১৬৭

www.amarboi.org

> হে ইমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালার জন্য (সত্য ও) ন্যায়ের ওপর সাক্ষী হয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, (মনে রাখবে বিশেষ) কোনো সম্প্রদায়ের দুশমনী যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে, (এর ফলে) তোমরা (তাদের সাথে) ন্যায় ও ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো, কারণ এ (কাজ) টি (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে চলার অধিক নিকটতর; তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ওয়াকেফ রয়েছেন (সুরা মায়েদা ৫ : ৮)।

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার অবলম্বন করতে বলেছেন বিশেষ করে লেনদেনের ক্ষেত্রে এবং কথাবার্তার বেলায় ও সততা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে :

> তোমরা কখনো এতিমদের সম্পদের কাছেও যেয়ো না, তবে উদ্দেশ্য যদি নেক হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট বয়স সীমায় পৌঁছানো পর্যন্ত (কোনো পদক্ষেপ নিলে তা ভিন্ন কথা), পরিমাপ ও ওজন (করার সময়) ন্যায়ভাবেই তা করবে, আমি কখনো কারো ওপর তার সাধ্যসীমার বাইরে কোনো দায়িত্ব চাপাই না, যখনই তোমরা কোনো ব্যাপারে কথা বলবে তখন ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, যদি তা (তোমাদের একান্ত) আপনজনের (বিরুদ্ধে) ও হয়, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে দেওয়া সব অঙ্গীকার পূরণ করো। এ হচ্ছে তোমাদের (জন্য আরো কতিপয় বিধান); এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আদেশ দিয়েছেন (তোমরা যেন এগুলো মেনে চলো), আশা করা যায় তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে (সুরা আন'আম ৬ : ১৫২)।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ন্যায় বিচারের আদেশ দিয়েছেন (সুরা নাহল ১৬ : ৯২)। তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করো ন্যায়বিচার ও ভারসাম্যের সাথে (সুরা হুজুরাত ৪৯ : ৮)।

> ন্যায় ও ইনসাফে তোমার মালিকের কথাগুলো পরিপূর্ণ হয়েছে (সুরা মায়েদা ৫ : ১১৫)।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারব যে, গ্রিক, রোমান কিংবা অন্যান্য যে কোনো মানবিক আইন থেকে ইসলামি আইন-ই উত্তম। এটি মূলত মানব জাতির অন্তর্নিহিত চালিকা শক্তি বিবেচনা করা হয়েছে। মহানবি সা.

www.amarboi.org

নিজেই বলেছেন ইচ্ছার উপর কর্ম ফল নির্ভরশীল। আমাদেরকেও এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যেন আমরা আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতি উপলব্ধি করছি।

> 'নিঃসন্দেহে আমি মানুষদের সৃষ্টি করেছি, তার মনের কোণে যে খারাপ চিন্তার উদয় সে সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত আছি। কারণ আমি তার ঘাড়ের রগ থেকেও অনেক কাছে' (সুরা ক্বাফ ৫০ : ১৬)।

ন্যায়বিচার হচ্ছে এমন একটি বন্ধন যা সমাজকে একতাবদ্ধ করে রাখে। এতে করে পুরো সমাজ একটি ভ্রাতৃত্বে পরিণত হবে। মহানবি সা. এই সমাজের সদস্যদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন সবাই একে অপরের কল্যাণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল (সহিহ বুখারি, কিতাব আল আহকাম)। ইসলামি আইন হচ্ছে মুক্তির একটি শক্তিশালী দড়ি এবং এটাকেই আমাদেরকে শক্ত করে ধরে রাখতে হবে :

তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ তায়ালার রশিকে শক্ত করে আকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হও না (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১০৩)। যেহেতু ইসলামি আইন আল্লাহ তায়ালার প্রবর্তন করা আইন সেহেতু তার সৃষ্টির প্রতিও আমাদের ন্যায় পরায়ণ আচরণ করতে হবে। এর অর্থ হলো সামাজিক জীবনে আমাদের যে দায়িত্বগুলো বর্তাবে সেগুলো যথাযথভাবে আমাদের পালন করতে হবে। এই হিসেবে ন্যায়বিচার বলতে সামাজিক বিচারকেই বুঝায়।

খ. সামাজিক ন্যায়বিচার

সামাজিক ন্যায়বিচার সম্বন্ধে প্লেটো বলেন : প্রত্যেক মানুষের যে অধিকারটি রয়েছে সেটি হচ্ছে তার মর্যাদা অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করা। এই ক্ষেত্রে তার যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ হচ্ছে মাপকাঠি। তাই উচিত হবে পদ মর্যাদা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করে অন্যের প্রতি নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা। তিনি এখানে যে, ন্যায় বিচারের কথা বলেছেন তা বলেছেন তার কর্মকাণ্ড ও সেবার আলোকে। এগুলো একজন ব্যক্তি পালন করে থাকে সাধারণত রাষ্ট্রের প্রতি। তার মতে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে পারস্পরিক চাহিদার উপর। তাই রাষ্ট্রীয় ন্যায় বিচারের দাবি হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালন করবে। মূলত রাষ্ট্রের ব্যক্তির যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বের উপরই নির্ভর করে একজন ব্যক্তির মূল্যায়ন।

গ্রিক পলিটিক্যাল গ্রন্থের প্রণেতা বার্কার সামাজিক ন্যায়বিচার সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেন সমাজের মূলনীতি হচ্ছে এটাই যে, এর সদস্যরা পারস্পরিক চাহিদার ভিত্তিতে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং তাদের এই সম্পৃক্ততা সমাজের সৃষ্টি করে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন কাজের যে বৈচিত্র আছে তাতে যদি সবাই মনোযোগী হয়

www.amarboi.org

তাহলে সমাজে যথার্থ রূপ ধারণ করে কেননা এটি হচ্ছে মূলত পুরো মানব জাতির উৎপাদন ও প্রতিফলন।

সামাজিক ন্যায় বিচারের যে সংজ্ঞা উপরে দেওয়া হয়েছে তা ইসলামি অনুপ্রেরণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইসলামি ব্যবস্থায় রাষ্ট্র উপাস্য কোনো সত্তা নয়, বরঞ্চ এটি হচ্ছে এমন একটি সামাজিক সংগঠন যা আল্লাহ তায়ালার আইন মেনে চলতে বাধ্য। ইসলামি সমাজে পারস্পরিক চাহিদার ভিত্তিতে এর সদস্যরা কখনো একতাবদ্ধ হয়নি, কেননা তা হচ্ছে স্বার্থপরতা। বরঞ্চ তারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একতাবদ্ধ হয় একে অপরের কল্যাণ সাধনের জন্য। এই প্রসঙ্গে মহানবি সা. যে দিক নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। যদি আমাদের আল্লাহ তায়ালার আইনের আলোকে সামাজিক ন্যায় বিচারের সংজ্ঞা দিতে হয় তাহলে তা হবে নিম্নরূপ :

১. প্রতিটি ব্যক্তিকে স্বাধীন ও সমান হিসেবে দেখতে হবে যার জন্মগত অধিকার হচ্ছে এই দুইটি বিষয়,

২. নিজের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য যে সকল সুযোগের প্রয়োজন তাকে তা সরবরাহ করতে হবে যাতে সে তার নিজের পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে;

৩. প্রতিটি ব্যক্তিকে তার অধিকার বুঝিয়ে দিতে হবে, তার জীবন ধারা যেমনই হোক না কেন, এবং

৪. তার সাথে সমাজের সম্পর্ক এমনভাবে নির্ণয় করতে হবে যাতে সে কখনো সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে না পারে বরঞ্চ নৈতিক মূল্যবোধ ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

এই লক্ষ্যগুলো অর্জন করা সম্ভব যদি মানুষ সমাজের প্রতি তার দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং ইসলামি আইন অনুযায়ী তাকে যথাযথ প্রতিদান দেওয়া হয়। এই লক্ষ্যে মহানবি সা. প্রথমেই শিক্ষাকে প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। তিনি নিজেও কুরআনের বিধৃত নৈতিকতাগুলো বাস্তবে দেখিয়ে উত্তম আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তিনি বলেন : তোমরা জ্ঞান অর্জন করো কেননা জ্ঞানী ব্যক্তি সত্য মিথ্যার পার্থক্য করতে পারে; জ্ঞান হচ্ছে বেহেশতে যাওয়ার আলোকবর্তিকা। যখন কোনো বন্ধু থাকবে না তখন জ্ঞানই আমাদের পরম সাথী; এটি হচ্ছে সুখ সমৃদ্ধির দিক নির্দেশনা; এটি হচ্ছে আমাদের বিপদের বন্ধু; শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র এবং বন্ধু কুলের অলংকার। এরই মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা

www.amarboi.org

জাতির মর্যাদা সমুন্নত করেন এবং কল্যাণ নিশ্চিত করণে তাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেন। তাদেরকে দেয় নেতৃত্ব যার কারণে তাদের পদাঙ্ক সবাই অনুসরণ করে, তাদের কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে অনুকরণীয় এবং তাদের মতামতকে মনে করা হয় গ্রহণযোগ্য এবং দেখা হয় শ্রদ্ধার চোখে[২১]।

মহানবি সা. এই ভাবেই জ্ঞানের মূল্যায়ন করেছেন। আল্লাহ তায়ালার যে গুণাবলী দ্বারা মানুষকে ভূষিত হতে বলা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে জ্ঞান। এই ভাবেই ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রচলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে ব্যক্তি নিজেও নৈতিকভাবে উন্নত হবে যা তার ব্যক্তিত্বকে করবে আরো সমৃদ্ধ। সমাজের উন্নয়ন নির্ভর করে ব্যক্তি ও সমাজের মিথস্ক্রিয়ার উপর। এই মিথস্ক্রিয়া মানবিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন নির্দিষ্ট ভারসাম্যের আলোকে এবং মানুষকেও এটি যথার্থ রূপে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন :

> আসমান- তাকে তিনি সমুন্নত করে রেখেছেন এবং (মহাশূন্যে তার ভারসাম্যের জন্যে) তিনি একটি মানদণ্ড স্থাপন করেছেন। যাতে করে তোমরা কখনো (আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত এই মানদণ্ডের) সীমা অতিক্রম না করো। ইনসাফ মোতাবেক (তোমরা ওযনের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করো এবং (ওযনে কম দিয়ে) মানদণ্ডের ক্ষতি সাধন করো না (সুরা আর রহমান ৫৫ : ৭-৯)।

এখানে যে মানদণ্ড ও ওজনের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ন্যায় বিচারের প্রতীক। এটি মানুষ যদি যথাযথভাবে পালন করে তাহলেই একটি আদর্শ সমাজ গড়ে উঠে। মানুষ নিজের উপর সুবিচার করবে এবং তার আশে পাশের সবার সাথে এই ন্যায়পরায়ণ আচরণ করবে। এই প্রসঙ্গে কুরআনে আরো বলা হয়েছে :

> আমি অবশ্যই আমার রসুলদের কতিপয় সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ (মানুষদের কাছে) পাঠিয়েছি এবং আমি তাদের সাথে কিতাব পাঠিয়েছি, আরো পাঠিয়েছি (আমার পক্ষ থেকে এক) ন্যায়দণ্ড, যাতে করে মানুষ (এর মাধ্যমে) ইনসাফের ওপর কায়েম থাকতে পারে (সুরা হাদীদ ৫৭ : ২৫)।

এখানে যে ইনসাফের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যেই আমরা সামাজিক ন্যায়বিচার দেখতে পাই। এই ন্যায় বিচারের আলোকেই সকল বৈষয়িক ও নৈতিক বিষয়

---

[২১] ইবনে আব্দুল বার, ফাদলুল ইলম

www.amarboi.org

সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়। আচরণের সাথে সম্পৃক্ত ভালো ও মন্দ সম্পর্কিত সকল প্রশ্নের উত্তরও খুঁজে পাওয়া যায়।

একটি অভিন্ন জীবন ধারার প্রয়োগ করতে হলে সামাজিক ন্যায় বিচারে এই দুইটি ধারণা স্পষ্টরূপে তুলে ধরতে হবে : একটি হচ্ছে ব্যক্তি সম্বন্ধীয় ধারণা, যা মানবিকতার একটি বিশেষ গুণ এবং ব্যক্তিগত জীবনে তা সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় ধারণাটি হচ্ছে বিশ্বজনীন যা কিনা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত এবং ব্যক্তি পর্যায়ে সবাই এই ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। বিশাল এই পৃথিবীতে হয়তো একজন ব্যক্তি তেমন গুরুত্ব নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাম্য ও স্বাধীনতার দাবি সে করতে পারে। এই বিবেচনায় মানবাধিকার মোটামুটি রূপে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত যা আমরা স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে ফেলতে পারি।

গ. সবার জন্য সমধিকার

মানুষের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিধান হচ্ছে এটাই যে সবাই সমান রূপে জন্ম নেয়। এই সাম্যের ব্যাপারে কুরআনে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে :

> আল্লাহ তায়ালাই তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর এক বিন্দু শুক্র থেকে তিনি জীবনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন, এরপর তোমাদের তিনি নর নারীর জোড় বানিয়েছেন (সুরা ফাতির ৩৫ : ১১)।

খলিফা ওমর এই বিষয়টির উপর তার ঐতিহাসিক বক্তব্যের মাধ্যমে জোর দেন। মিশরের শাসক একজন মিশরীয় খ্রিষ্টানকে বেত্রাঘাত করলে ওমর রা. তাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, কখন থেকে তুমি লোকজনকে গোলাম বানাতে শুরু করলে যখন কিনা তাদের মা তাদেরকে স্বাধীনভাবে জন্ম দিয়েছে? তাছাড়া তিনি আবু মুসা আল আশআরীকে যে শাসন সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সেগুলোও প্রণিধানযোগ্য :

তোমরা মানুষের মাঝে এমনভাবে সাম্য বিধান করবে যেন অভিজাতরা তোমাদের অবিচারের সুযোগ নিতে না পারে। একই কারণে দুর্বলরা যাতে হতাশ না হয়ে পড়ে। কুরআনের বিধান মতে, মানুষ একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই দাস :

> (কেননা) আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, তাদের মাঝে কিছুই এমন নেই যা (কেয়ামতের দিন) দয়াময় আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে তার অনুগত (বান্দা) হিসেবে উপস্থিত হবে না (সুরা মারইয়াম ১৯ : ৯৩)।

ইসলামে কেউ একে অপরের উপর কোনো ধরনের বৈশিষ্ট্য কিংবা বড়ত্ব যাহের করতে পারে না। সামাজিক মর্যাদায় সবাই সমান যা আমরা জামায়াতে নামাজ

www.amarboi.org

পড়ার সময় প্রতিফলিত হতে দেখি। এখানে শ্রেণিভেদে বিশেষ কোনো কাতারের ব্যবস্থা নেই, হোক না সে কোনো খলিফা কিংবা কোনো দাস। আল্লাহ তায়ালার চোখে সবাই সমান। চিরুনির দাঁতের মতো সমাজের সব সদস্যই সমান, এই ছিল মহানবি সা.-এর শিক্ষা। তিনি আরো বলেন অনারবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্টত্ব নেই, কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, একমাত্র ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া। শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা :

> হে মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্য জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে (আল্লাহ তায়ালাকে)– বেশি ভয় করে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর (পুঙ্খানুপুঙ্খ) খবর রাখেন (সুরা ক্বাফ ৫০ : ১৩)।

ঘ. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কাজ কর্ম করা, বক্তব্য দেওয়া, কোনো কিছু বিশ্বাস করা, শিক্ষা অর্জন করা এবং পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতাকে বুঝায়। প্লেটোর মতে, নাগরিক জীবনে অংশগ্রহণ করাই হচ্ছে উত্তম জীবনের মূল ভিত্তি। তাদের মতে রাষ্ট্র হচ্ছে মূলত শ্রম বিতরণের ক্ষেত্র। এখানে তারা যে নাগরিক জীবনের কথা বলেন তাতে কর্মকাণ্ডের উপর জোর দিলেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়টি তারা এড়িয়ে গেছেন। পক্ষান্তরে ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতাকে জন্মের অধিকার হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।

ইসলামে অধিকারের সাথে আবার দায়িত্বের সম্পর্ক রয়েছে। মূলত অধিকারের চাইতে দায়িত্ব বেশি যাতে অবাধ স্বাধীনতা লাগামহীন হয়ে সমাজের স্বার্থে আঘাত না হানে। ইসলাম সামাজিক শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য সব সময় সকল চরমপন্থা বর্জন করে এসেছে। তাই নেতিবাচক প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া ব্যবসা এখানে নিষিদ্ধ। তাছাড়া সকল কল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এই ব্যবস্থায় বৈধ বলে স্বীকৃত।

ইসলাম মানুষকে স্বাধীনতার পাশাপাশি কর্মের অধিকারও দিয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

> হে ইমানদার ব্যক্তিরা, জুমুয়ার দিনে যখন তোমাদের নামাজের জন্যে ডাক দেয়া হবে তখন তোমরা (নামাজের মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালার

www.amarboi.org

স্বরণের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাও এবং (সে সময়ের জন্য) কেনাবেচা ছেড়ে দাও, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা তা উপলব্ধি করো (সুরা জুমআ ৬২ : ১০)।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

অতএব তোমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রিজিক চাও, শুধু তারই এবাদত করো এবং তার নিয়ামতের শোকর আদায় করো (সুরা আনকাবূত ২৯ : ১৭)।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

তিনিই সে মহান সত্তা যিনি ভূমিকে তোমাদের অধীন করে বানিয়েছেন, তোমরা (যখন যেখানে চাও) এর অলিগলির মধ্য দিয়ে চলাচল করো এবং এর থেকে (উদ্গাত) রিজিক তোমরা উপভোগ করো; (মনে রেখো) একদিন (তোমাদের সবাইকে) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে (সুরা মুলক ৬৭ : ১৫)।

এই সকল আয়াতে আমরা মানব জাতিকে কাজের প্রতি উৎসাহিত করতে দেখেছি। নামাজের পর আল্লাহ তায়ালা যে বিষয়টি নির্ধারণ করেছেন সেটি হচ্ছে হালাল রেযেক অনুসন্ধান করা। তাই মহানবি সা. মুমিনগণকে অলসতা করতে বারণ করেন এবং ফজরের পরপরই রিজিকের সন্ধানে নেমে যেতে বলেন। বাক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমরা হযরত ওমর রা.-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারি। এক মহিলা হজরত ওমরকে তার সামনেই বলেন আল্লাহ তায়ালা যেখানে নারীদের দেন মোহরের কোনো সীমারেখা নির্ধারণ করেননি সেখানে ওমরের দেন মোহরের অংক কমানো ঠিক হয়নি। তাছাড়া দেনমোহর হিসেবে যা দেওয়া হয় স্বামীরা তার সামান্যতমও ফেরত নিতে পারবে না (সুরা নিসা ৪ : ২০)।

ধর্মে কোনো জোর জবরদস্তি নেই (সুরা বাকারা ২ : ২৫৬), এই হচ্ছে ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কুরআনের বাণী। মানব জাতিকে যার যার ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, পছন্দমতো শিক্ষা গ্রহণ করা এবং পেশা অবলম্বন করারও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষ যাতে তার ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ঘটাতে পারে সেই সকল সুযোগ সুবিধাই নিশ্চিত করেছে। এই নীতিটি সক্ষম ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হলেও প্রতিবন্ধিদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে রাষ্ট্র নিজে। ইসলামি সামাজিক ব্যবস্থার ন্যায়পরায়ণতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে এই ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা।

www.amarboi.org

ঙ. বিচারিক প্রশাসন

আমরা ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অমুসলিমদের অধিকার নিয়েও আলোচনা করেছি। বিচারিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আইনের চোখে সবাই সমান। তবে সাক্ষী গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের চরিত্র বিবেচ্য বিষয়। যদি কোনো ব্যক্তি অতীতে কোনো নারীকে অপবাদ দিয়ে তার প্রমাণ করতে পারেনি তাহলে সে সাক্ষী দেওয়ার যোগ্যতা হারায়।

সাক্ষীগণের সংখ্যার পাশাপাশি তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাও বিবেচ্য বিষয়। তাই যে ব্যক্তি তার অসৎ চরিত্র কিংবা মিথ্যার জন্য কুখ্যাত তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। উসমানী নাগরিক আইনের মাযাল্লার ১৭১৬ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, প্রকাশে ও গোপনে সাক্ষীর ব্যাপারে অনুসন্ধান করা হবে। আবু হানিফার মতে কারো বিরুদ্ধে যদি সাক্ষী দাঁড় করানো হয় তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষীর বিশ্বাস যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে। তাছাড়া, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীর মধ্যে কোনো ধরনের শত্রুতা থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রেও সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি সাক্ষী গ্রহণের ক্ষেত্রে লাভ লোকসানের প্রশ্ন আসে তাহলেও সাক্ষী রহিত হবে। রক্ত সম্পর্কের কারো সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না, অধিনস্থ কর্মচারী, বাণিজ্যের অংশীদার, কিংবা জামানত দানকারীর সাক্ষ্য হবে না[২২]।

কোনো কিছু প্রমাণ করার মাধ্যম হচ্ছে স্বীকারোক্তি সাক্ষী অথবা কসম। কোনো ব্যক্তি যদি কারো বিরুদ্ধে কিছু দাবি করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি এই দাবি প্রত্যাখান করে তখন প্রমাণের আলোকেই তা সুরাহা করা হবে। যদি প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে বাদী কসমের মাধ্যমে এই দাবি প্রত্যাখান করবে। অন্যথায় বিবাদীর দাবি বিচারক প্রত্যাখান করবেন। তাই দেখা যায় কোনো মামলার ফায়সালার ক্ষেত্রে কসম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সব শেষে বলা যায় ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিচারিক প্রশাসন মূলত নৈতিক মূল্যবোধ ও নিরপেক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে পদমর্যাদা কিংবা সামাজিক অবস্থান কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ইসলামি আইনের চোখে সবাই সমান। ইসলামি সমাজ যেহেতু একটি শ্রেণিহীন সমাজ সেহেতু এখানে আর সমাজতন্ত্রের কোনো প্রয়োজন নেই।

---

[২২] Mahamassani, op. cit., p. 184

www.amarboi.org

পঞ্চদশ অধ্যায়

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম

সমাজতন্ত্র ও তার উত্থান

বিভিন্নভাবে সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তবে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে এটি হচ্ছে সামাজিক সংগঠনজনিত মতবাদ যাতে মালিকানা ও উৎপাদন মাধ্যমের উপর তার নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয় এবং এই নীতির উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রশাসন ও বিতরণ ব্যবস্থা সাজানো হবে। এই মতবাদে মানুষ হচ্ছে এক ধরনের স্বার্থপর প্রাণী। তাই সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানার সকল প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত করে তাকে ক্ষমতাহীন করে দেওয়া। সমাজতন্ত্রের মতে ব্যক্তি মালিকানা বলেই মানুষ একে অপরকে শোষণ করে যা থেকে উৎপত্তি হয় শ্রেণি সংঘর্ষ।

আধুনিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শুরু হয় যখন ১৯৪৮ সালে কার্লমার্কস ও ফ্রেডরিক অ্যানজেলস তাদের বিখ্যাত মেনিফেস্টো প্রচার শুরু করে। তারা শ্রমিকদের নতুন একটি সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ডাক দেয়। এটি হচ্ছে এক ধরনের বৈশ্বয়িকতাবাদী যা আমরা অ্যানজেলসের মন্তব্য থেকে বুঝতে পারি : বিশ্বের একমাত্র বাস্তবতা হচ্ছে বিষয়। তবে মার্কস ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বৈশ্বয়িকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, বরঞ্চ তিনি মনে করেন অর্থনীতি ও সমাজের মধ্যে একটি বৈশ্বয়িক সম্পর্ক রয়েছে। এরই মাধ্যমে সমাজের নারী ও পুরুষ জীবিকা নির্বাহ করে বিধায় সমাজের অগ্রগতিতে অর্থনৈতিক ও বৈশ্বয়িক সম্পর্কের ভিত্তিতে গভীর প্রভাব ফেলে। এই প্রভাবেই একটি সমাজের নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ গড়ে উঠে। মার্কস যেখানে বৈশ্বয়িকতাবাদের উপর জোর দিয়েছেন সেখানে অ্যানজেলস ধর্ম বিরোধী নিরপেক্ষতাবাদের কথা বলেন এবং সামাজিক সকল পুনঃসংস্কারের জন্য এটিকে তিনি পূর্ব শর্ত মনে করেন।

মার্কস সমাজতান্ত্রিক আদর্শের আলোকে সমাজের যে বিশ্লেষণ পেশ করেন তাকে তিনি বিজ্ঞানসম্মত বলে দাবি করেন। তার সামাজিক দর্শনের মূল ভিত্তি ছিল ইতিহাসের গভীর অধ্যায়। তিনি দেখেন আবহমান কাল থেকেই সমাজ দুইটি সংঘর্ষের সাক্ষী : যাদের আছে এবং যাদের নেই। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণি দ্বিতীয়টিকে

www.amarboi.org

শোষণ করে যাচ্ছে। এই ভাবেই তিনি তার দাবিকৃত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদ ব্যক্ত করেন।

শ্রেণি সংঘর্ষের অবসান ঘটানোর জন্য তিনি এই উপসংহারে পৌছান যে, উৎপাদন মাধ্যমকে জাতীয়করণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। কেননা ধনীরা এই উৎপাদন মাধ্যমকে অবলম্বন করেই দরিদ্রদের শোষণ করে। এই ভাবেই তিনি যোগ্যতা ও কাজের বিবেচনা না করে সম্পদের উপর সবার সমধিকার নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। প্রত্যেকেই পাবে তার চাহিদা অনুযায়ী সব কিছু এবং প্রত্যেকের থেকে নেওয়া হবে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ, এটি ছিলো তার মূলনীতি। তিনি মনে করেন, এই ভাবেই একটি শ্রেণিহীন দূয়ার উন্মুক্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে এই ধরনের ব্যবস্থায় ব্যক্তি সত্তার কোনা অস্তিত্ব থাকে না এবং ব্যক্তিমালিকানা থেকে মানুষ সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবে।

মার্কস তার প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় মানুষকে ব্যক্তিগত সহায় সম্পদের স্তরে নামিয়ে এনেছেন। যদি তাই হয় তাহলে সামাজিক ন্যায় বিচারের কোনো সুযোগ আর থাকল না যার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে অধিকার ও দায়িত্ব। ব্যক্তিবর্গের মাঝে সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায় এবং দায়িত্বশীল যারা আছে তারাই অধিকার ও দায়িত্ব পালন করতে পারে, তবে ব্যক্তিগত সম্পদের মধ্যে ন্যায়বিচার চর্চা করা যায় না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানব জাতিকে এই স্তরে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে।

উপরিল্লিখিত আলোচনা থেকে এটাই বুঝা যায় যে, সমাজতন্ত্র হতে কোন সামাজিক ন্যায়বিচার আশা করা যায় না। পক্ষান্তরে ইসলামের মর্মবাণী ও অনুপ্রেরণা হচ্ছে এই সামাজিক ন্যায়বিচার। ইসলামি মূলনীতি হচ্ছে সবাই তার যোগ্যতা ও কাজ অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। যারা কাজ করতে পারবে তাদেরকে সঠিক প্রতিদান দেওয়া হবে এবং প্রতিবন্ধী ও দরিদ্রদের চাহিদা পূরণ করা হবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মতবাদের আলোকে। এই মতবাদ অনুযায়ী দরিদ্ররা হচ্ছেন ধনীদের আমানত এবং ধনীদের কাছে যে সম্পদ রয়েছে তার আমানতদার হচ্ছে তারাই যা তাদেরকে সমাজের কল্যাণে ব্যায় করতে হবে। এতে করে ধনীরা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য উত্তম প্রতিদানের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

এটি হচ্ছে সম্পদের সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ বিতরণ। এটি এতটাই বাস্তবমুখী যে শুধুমাত্র মহানবি সা.-এর যুগেই তা বাস্তবায়িত হয়নি বরঞ্চ তার মৃত্যুর পর খোলাফায়ে রাশেদীন এমনকি ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের (মৃত্যু ৭২০ খ্রি.) যুগেও বাস্তবায়িত হয়েছে।

www.amarboi.org

এই ব্যবস্থার আওতায় কোনো শ্রেণি সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে না, যেহেতু তা সামাজিক ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেককে তার প্রতিদান দেওয়া হয় যোগ্যতা ও কাজ অনুযায়ী। তাছাড়া অসহায় প্রতিবন্ধী ও দরিদ্রদের চাহিদাও নিশ্চিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সমাজে যখন ন্যায়বিচার দেখা যাবে না তখনই মানুষের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হবে। এবং যারা অধিকতর মেধাবী তাদেরকে যদি কম মেধাবীদের কাতারে ফেলা হয় এবং দক্ষ কর্মীরা যদি উপযুক্ত প্রতিদান না পায় তাহলে ব্যক্তির মেধার কোনো মূল্যায়ন হলো না। সমাজতন্ত্র যদি শ্রেণিহীন সমাজ গঠন করতে যায় তাহলে এই রকম অরাজকতারই সৃষ্টি হবে। এটি কোনো অবিচার নয় বরঞ্চ এক ধরনের স্বৈরাচার যা ইসলাম কখনো গ্রহণ করতে পারে না। এখনও কমিউনিস্ট দেশগুলোতে লোহার পর্দার অন্তরালে ব্যাপক অসন্তোষ বিরাজ করছে। এই তথাকথিত শ্রেণিহীন সমাজ থেকেই এখন উচ্চ বেতনের ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তা শ্রেণির আবির্ভাব হয়েছে যারা কখনো নিজেদেরকে নিম্ন শ্রেণির সদস্য হিসেবে দেখতে চায় না।

যদি সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাবনা অনুযায়ী ব্যক্তি মালিকানা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের আওতায় সব দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে শুধু এক ধরনের সার্বিক পরিকল্পনা অর্থনীতি প্রবর্তন করা হবে না বরঞ্চ শ্রেণীহীন সমাজে কেউ কাউকে শোষণ করার সুযোগ পাবে না। মানবিক সকল সম্পর্ককে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় এই ধরনের ব্যবস্থায় শিল্প কারখানার নিয়ন্ত্রণে থাকে এক ধরনের ব্যবস্থাপক শ্রেণি যার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিতরে আমরা পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হতে দেখতে পাই। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেমনটা আশা করে যে ব্যক্তি মালিকানার বিলুপ্তি হয়তো মানবিক সম্পর্কের নৈতিক দিককে সমুন্নত করবে তা বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

ইসলামের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্রের কৃত্রিম ও অবাস্তব ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। ইসলামি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী, যিনি জানেন মানব জাতির জন্য কল্যাণকর কোনটি। মানব জীবনকে এখানে দেখা হয় একটি সার্বিক ব্যবস্থা হিসেবে যেখানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিষয়গুলো পরিচালিত হবে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী। এই ভাবেই ইসলামি ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলাম সমাজের ভারসাম্য রক্ষায় বিশ্বাসী এবং আত্মা ও শরীরের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সব ব্যবস্থা এখানে প্রবর্তন করা হয়েছে। বৈষয়িকতার প্রতিফলন

www.amarboi.org

আমরা যদি মানুষের শরীরে দেখতে পাই তাহলে আত্মার অনুপ্রেরণা আমরা পাব স্বাধীনতা ও নৈতিক কল্যাণের মাঝে। মানুষের শরীর যেখানে তাকে বৈষয়িকতার দিকে ধাবিত করে এবং প্রবৃদ্ধির চাহিদা মেটাতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে, সেখানে আত্মা তাকে আত্মত্যাগে এবং সঙ্গী সাথীদের ভালোবাসার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত আইন শরীর ও আত্মার কর্মকাণ্ড ও মিথস্ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় পার্থিব জীবনের উপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় যা আরো উত্তম ও চিরস্থায়ী। এতে করে মানুষ আল্লাহ তায়ালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে যিনি পরম দয়ালু এবং যার কাছে মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের হিসাব রয়েছে। মুমিন যখন আল্লাহ তায়ালার শাস্তিকে ভয় পাবে এবং তার উত্তম প্রতিদানের আশা করবে তখন সঠিক পথেই পরিচালিত হতে চায়।

নৈতিকভাবে একজন মানুষের মন ইসলামি শিক্ষার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এর অর্থ হলো আত্মত্যাগের মধ্যেই মানুষের আনন্দ পাওয়া উচিত এবং এমন সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাকে লিপ্ত হওয়া উচিত যা তার অন্যান্য ভাইদের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাবে। মহানবি সা. মক্কার মোহাজির এবং মদিনার আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এই আদর্শই বাস্তবায়িত করেছিলেন এবং বিগত অধ্যায়গুলোতে আমরা এই নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

ইতিমধ্যে এটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আত্মত্যাগ ও একে অপরের ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি মুসলমানের মূলমন্ত্র হচ্ছে বাঁচ এবং বাঁচতে দাও তারা এই নীতি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের বিবেচনায় সবাই সমান। আধ্যাত্মিক পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বাস্তবে এটি হচ্ছে একটি শ্রেণিহীন সমাজ। এটি হচ্ছে নৈতিক কল্যাণ যার প্রতিফলন আমরা জামাতের নামাজ যখন পাঁচটি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। তখন দেখা যায় কেউ কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে পারে না, গোলামের উপর মনিবের নয়, এখানে সরকার প্রধান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের অতি সামান্য নাগরিকও একই কাতারে নামাজ পড়তে বাধ্য। এরই মধ্যে আমরা ইসলামি জীবন প্রসঙ্গে যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির নির্দেশ পেয়েছি তার সাথে সামাজিক মতবাদের বৈষয়িকতাবাদী ধরনের ব্যাপক তারতম্য দেখতে পাই। সমাজতন্ত্র কখনো বৈষয়িকতাবাদ থেকে মুক্ত হতে পারেনি যারা এই ব্যবস্থায় বিশ্বাসী তাদেরকে বিষয়টি অবশ্যই মেনে নিতে হবে। বৈষয়িকতাবাদের অর্থ হচ্ছে এটাই বিশ্বাস করা যে, বৈষয়িকতা ছাড়া অন্য কিছুই বাস্তব নয়। ইসলাম এই মতবাদ প্রত্যাখান করে এবং ঐশী বাস্তবতায় বিশ্বাস করে। ইসলাম বিশ্বাস করে একাত্মবাদে যা মানব জাতির ঐক্যেই প্রতিফলিত হয়।

www.amarboi.org

কমিউনিজম

মার্কেস পরবর্তী যুগে লেনিন এসে সমাজতন্ত্রের নাম দেয় কমিউনিজম। এর মাধ্যমে তিনি প্রলেতারিয় অর্থাৎ সমাজের দরিদ্র শ্রেণির একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বুঝাতে চেয়েছেন। বর্তমানে আমরা যে সমাজতন্ত্র দেখতে পাই তা হচ্ছে মূলত শিল্পমুখী পুঁজিবাদের সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ। এই মতবাদের প্রবক্তারা এটিকে প্রগতিশীল আন্দোলন বলে দাবি করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা প্রতিবিপ্লবী বলে মনে হয়।

মার্কস মনে করেন সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন। সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে নিঃসন্দেহে মানব সমাজ কিছু পর্যায় পেরিয়ে এসেছে এবং প্রতিটি পর্যায়ে রয়েছে নিজস্ব অর্থনৈতিক উৎপাদনের ধরন। প্রথম মৌলিক পর্যায়গুলো হচ্ছে :

১. প্রাক ঐতিহাসিক সাম্যবাদী সমাজ,

২. দাসত্ব,

৩. সামন্তবাদ,

৪. পুঁজিবাদ এবং

৫. সমাজতন্ত্র।

প্রথম দিকে উৎপাদনের মাধ্যম কৃষি ও হাতের কাজেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সমাজের সকল সদস্যই ছিলো এগুলোর মালিক। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এমন একটি শ্রেণি দেখা দেয় যারা উৎপাদন মাধ্যমগুলোর মালিকানা নিয়ে যারা কাজ করে তাদেরকে শোষণ করতে থাকে শ্রমিক শ্রেণি হিসেবে। মালিকানা ও শোষণের ভিত্তিতে দুইটি শ্রেণির মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে শ্রেণি সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। একটি পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে তখনই যাওয়া হয় যখন মৌলিক কোনো প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দেখা দেয়। এতে করে উৎপাদনমুখী শক্তিগুলো সামাজিক রূপরেখাকে শক্তিমত্তার দিকে ছাড়িয়ে যায়। তখন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

এই ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বৃহৎ মাত্রায় শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিদ্যমান মালিক শ্রেণির জায়গা করে নেয় অন্য একটি শ্রেণি যেমন দাস দাসীদের মালিকদের জায়গা করে নেয় সামন্তবাদী জমিদাররা। এবং সামন্তপতিদের জায়গা দখল করে নেয় পরবর্তী যুগে পুঁজিবাদীরা, এভাবেই শিল্পপতিদের জায়গা করে নেয় ব্যাংকাররা। পঞ্চম স্তরে দেখা যায় সামজতন্ত্রের আবির্ভাব হলে শ্রমিক শ্রেণি

www.amarboi.org

পুঁজিপতিদের উৎখাত করে এবং একটি শ্রেণিহীন সমাজের জন্ম হয় যেখানে শোষিত বলতে কোনো শ্রেণি আর থাকে না।

এই ধরনের প্রক্রিয়া মোটেই প্রগতিমুখী নয়। বরঞ্চ সমাজের প্রাথমিক স্তরের বর্বরতায় ফিরে যাওয়ার মতোই। এটি নিঃসন্দেহে মানবতার লাঞ্ছনা যা ইসলাম কোনোক্রমেই মেনে নিতে পারে না। সমাজতন্ত্রের পরিভাষায় কখনো ইসলামের বিচার করা যাবে না, এমনকি ইসলামের সাথে সমাজতন্ত্র যোগ করে ইসলামি সমাজতন্ত্রের মতো পরিভাষার ব্যবহার করা যাবে না। ইসলাম ও সমাজতন্ত্র বিপরীত দুই মেরুর মতাদর্শ, তাই আদর্শ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত।

মার্কস যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা ত্রুটিপূর্ণ। একজন মানুষের কথাই চিন্তা করা যায়। যদি ব্যক্তি মালিকানার বিষয়টি বিলুপ্ত করা হয় তাহলে কোন ধরনের প্রণোদনা ছাড়া সে কি কখনো সমাজের উন্নয়নে কাজ করে যাবে? তার বিবর্তনবাদী মতবাদ অনুযায়ী সামন্তবাদ জন্ম দেয় পুঁজিবাদের এবং পুঁজিবাদ জন্ম দেয় সমাজতন্ত্রের যা, তার মতে, একদিন পৃথিবীতে একক রাজত্ব করবে। এই আশায় লেনিন রাশিয়া কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দাবি করেন যে, এই ধরনের একনায়কত্ব এক ধরনের ক্রান্তিকালীন প্রতিষ্ঠা মাত্র। মূল লক্ষ্য হচ্ছে উন্মুক্ত ও সমতামুখী সদস্যদের গণতন্ত্র। এই জন্য অনেক রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু শেষতক অর্জন আর কতটুকু হলো?

আসলে যা দাবি করা হয়েছে বাস্তবে ঘটেছে তা একেবারেই বিপরীত- একটি স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা সমাজের সদস্যদের জন্য এক ধরনের কারাগার ছাড়া কিছুই নয়। এই ব্যবস্থায় মানুষের কাছ থেকে শ্রম আদায় করা হয় জোর জবরদস্তির মাধ্যমে[১]। এখন আমরা সংক্ষেপে সমাজতন্ত্র ও ইসলামের পার্থক্যগুলো তুলে ধরতে পারি।

ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

নিম্নে সংক্ষেপে ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো :[২]

১. ইসলাম সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে, তবে এটিকে মালিকের হাতে এক ধরনের আমানত মনে করে (সুরা হাদীদ ৫৭ : ৭)। দরিদ্র ও অসহায়দের

[১] M. Muslehuddin, Islamic Socialism, What it implies, pp. 17,18

[২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪১-৪৪

www.amarboi.org

প্রয়োজন মেটাবার পাশাপাশি মালিকদেরকে নিজেদের জন্য এটি ব্যবহারের অনুমতি দিলেও ভোগ বিলাসিতার কোন অনুমতি দেয়া হয়নি। ইসলামে মূলত ভোগ বিলাসিতার কোন স্থান নেই। অথচ সমাজতন্ত্র ব্যক্তিমালিকানার এই ধারণাই অস্বীকার করে।

২. এই ধরনের মালিকানা অনুমোদন দিয়ে ইসলাম মানুষের কাজ করার এবং জীবিকা নির্বাহের অধিকার নিশ্চিত করেছে। তাকে সম্ভাব্য সকল বৈধ পন্থায় কাজ করার ও কামাই করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে যাতে বেশি করে অভাবী ভাইদের চাহিদা মেটাতে পারে। ব্যক্তি মালিকানার অধিকারটি মানুষের মধ্যে কাজ করার প্রণোদনা জিইয়ে রাখে। কিন্তু সমাজতন্ত্র এই প্রণোদনা কেড়ে নিয়ে ব্যক্তি মালিকানা বিলুপ্ত করে। পরিণতিতে, কাজ আদায় করার জন্য বল প্রয়োগ করতে হয় যা কিনা এক পর্যায়ে স্বৈরাচারে পরিণত হয়।

৩. ইসলাম ব্যক্তিত্বের উন্নয়নকে উৎসাহিত করেছে মানব জাতিকে ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে। একমাত্র যে সত্যটি তার উপর আরোপ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে যে সে সমাজে কোন অন্যায় করতে পারবে না। এই ভাবেই মানুষকে সমাজের জন্য উপকারি হিসাবে আবির্ভূত হতে উৎসাহিত হয়েছে। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় মানুষ হচ্ছে কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি। অথচ সমাজতন্ত্র মনে করে মানুষ সমাজের জন্য মূলত ক্ষতিকর তাই তার ব্যক্তিসত্তাকে বিলুপ্ত করতে হবে। এই ভাবেই মানুষ এই ধরনের ব্যবস্থায় তার স্বাধীনতা হারায় এবং অনুপ্রেরণাহীন কর্মকাণ্ড চর্চা করার কারণে সমাজও বিশাল ক্ষতির সম্মুখিন হয়।

৪. ইসলামি মতবাদ অনুযায়ী মানুষ হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে পবিত্র ও কল্যাণমুখী। সে মূলত স্বার্থপর হতে পারে না। যদি তাই হতো তাহলে কখনো পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি হতে পারত না, যার সামনে আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতাদের মাথা নত করতে বলে। যদি সে স্বার্থপর হতো তাহলে তাও বেশি দিন বিরাজমান করার অনুমতি ইসলাম দেয় না।

৫. ইসলামি আইন মোতাবেক একজন মুসলমানকে আল্লাহ তায়ালা ও তার সৃষ্টির প্রতি অনেক দায় দায়িত্ব পালন করতে হয়। সমাজতন্ত্র মনে করে মানুষ হচ্ছে আগ্রাসী ও স্বার্থপর প্রকৃতির। তাই তার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয় এবং তার জীবন মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রীয় করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৬. ইসলাম ন্যায় বিচারের কথা বলে এবং মানুষের যোগ্যতা ও জন্মগত মেধার ভিত্তিতে সম্পদের বিতরণে বিশ্বাসী। সমাজতন্ত্র যখন সাম্যবাদী সম্পদ বিতরণ

www.amarboi.org

ব্যবস্থার কথা বলে তখন কিন্তু মানুষের যোগ্যতাও অন্যের তুলনায় অধিক উপার্জন করার ক্ষমতাকে উপেক্ষা করে। এখানে মূলনীতি হচ্ছে সবাইকে দেওয়া হবে তার চাহিদা অনুযায়ী।

৭. ইসলামি ব্যবস্থায় রাজনৈতিক মর্যাদার বিবেচনায় সবাই সমান এবং এখানে বৈষয়িক সম্পদ ও মাহাত্মের মাপকাঠি নয় বরঞ্চ ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহ তায়ালার আইনের প্রতি আনুগত্যই হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। আল্লাহ তায়ালা সর্ব জ্ঞানী এবং তিনি নির্দিষ্ট পরিমাপ মতো তার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করেন (সুরা ক্বামার ৫৪ : ৪৯)। তিনি সবচাইতে ভালো জানেন তার সৃষ্টির জন্য ভালো কোনটি। তিনি কাউকে হয়তো অন্যদের তুলনায় বেশি মেধা দিয়েছেন এবং কাউকে পদমর্যাদায় অন্যের তুলনায় কয়েক ধাপ এগিয়ে রেখেছেন যাতে সমাজের একে অপরের সেবা থেকে উপকৃত হতে পারে (সুরা আয যুখরুফ ৪৩ : ৩২)। এই ভাবেই সূক্ষ্মভাবে ভারসাম্যপূর্ণ শ্রেণিব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে যাতে সমাজে কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, অন্যথায় সবাই যদি একই মেধার অধিকার হতো তাহলে বিরাট অচলাবস্থার সৃষ্টি হতো। সমাজতন্ত্র এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। তারা যতই শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের কথা বলুক না কেন আমরা সাবেক সোভিয়েত রাশিয়াতে ঠিক বরাবর শ্রেণি বিভাজনের অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছি। সেখানে কিছু বেতন ভোগী কর্মকর্তা ছিল এবং ছোট খাট সম্পদের মালিকরা ছিল যারা নিজেদেরকে প্রলেতারিয় ভাবতে অস্বীকার করত। শ্রেণিব্যবস্থা সেখানে ঠিকই বিরাজ করছিল তাই বলা যায় কমিউনিস্টরা শ্রেণিহীন সমাজ গড়ার যে স্বপ্ন দেখে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৮. ইসলামি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কোনো বিধান নেই। আল্লাহ তায়ালা এটিকে উন্মুক্ত রেখেছেন। যেহেতু তিনি তার বান্দাদের কাউকে অপরের তুলনায় বেশি মেধা দিয়েছেন। এই ব্যবস্থা চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্ম চঞ্চলতায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে এবং সমাজের চাহিদাও এতে মেটানো যায়। সমাজতন্ত্র অর্থনীতিকে রাজনৈতিক ক্ষমতার করতলগত করে রেখেছে, যার অর্থ হচ্ছে তাদের প্রকৃতি বিরোধী ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য জোর জবরদস্তি করাটা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে।

৯. জীবনের সমস্যা বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ইসলাম সহনশীলতা ও ভারসাম্য, আপোষ ও সমঝোতার নীতিকে উৎসাহিত করেছে। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্র প্রায় সমগ্র বিষয়ে জোর জবরদস্তি ও বল প্রয়োগের আশ্রয় নিয়েছে।

www.amarboi.org

১০. ইসলাম জীবন ধারায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে তাই কোনো ক্ষেত্রেই চরমপন্থাকে উৎসাহিত করেনি। সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে গিয়ে চরমপন্থা অবলম্বন করেছে। মৌলিক পরিবর্তনের নামে তারা বল প্রয়োগের একটি প্রথা চালু করেছে।

১১. ইসলামি সমাজ ন্যায়পরায়ণতা ও ধার্মিকতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাড়াবাড়ি ও অন্যায়ের উপর।

১২. ইসলাম আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদকে প্রকাশ করতে মানব জাতির ঐক্যকে উৎসাহিত করেছে। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রের মূলমন্ত্র হচ্ছে ঈশ্বরকে নির্বাসনে পাঠানো এবং পুঁজিবাদকে ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্ছেদ করা।

১৩. ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার আইন বলবৎ করার জন্য তার নিযুক্ত প্রতিনিধি। তবে তিনি কোনো ধরনের রাজকীয় স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিতে পারেন না। সমাজতন্ত্র সর্বশক্তিমান কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিশ্বাসী এবং তাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে প্রলেতারিয়তের একনায়কতন্ত্র। মুসলমানরা আল্লাহ তায়ালা যেমন বিশ্বাস করে সমাজতন্ত্রবাদীরা তেমনি রাষ্ট্রের পূজা করে।

সমাজতন্ত্র পুরোপুরিভাবে বৈষয়িক এবং আখেরাতে কোনো ধ্যান ধারণা এখানে স্থান পায়নি। অথচ আখিরাতের প্রতিদান ও শাস্তি যথাক্রমে মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখে। তাই যারা সমাজতান্ত্রিক পরিভাষার আলোকে ইসলাম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। নিঃসন্দেহে ইসলামি মূল্যবোধ সম্বন্ধে অজ্ঞ কিংবা আল্লাহ তায়ালা বিহীন কৃষ্টি ও প্রথা এবং আল্লাহ তায়ালার কৃষ্টি ও প্রথার মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারেনি। তেমনি তারা প্রাকৃতিক ও প্রকৃতি বিরোধী ব্যবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য তা বুঝতে সক্ষম হয়নি।

www.amarboi.org

ষোড়শ অধ্যায়

মানুষ স্বভাবজাতভাবে ইসলামি সমাজের জন্য তৈরি

ক. মানব প্রকৃতি

ইসলাম হচ্ছে জীবনের একটি শান্তিপূর্ণ পথ। তাই মানুষ স্বভাবজাতভাবে এর জন্যই সৃষ্টি হয়েছে :

> অতএব (হে নবি), আপনি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে (সঠিক) দ্বীনের ওপর কায়েম রাখুন; আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতির ওপর (নিজেকে দাঁড় করাও), যার ওপর তিনি মানুষকে পয়দা করেছেন (মনে রেখো); আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির মাঝে কোনো রদবদল নেই; এ হচ্ছে সহজ (সরল) জীবন বিধান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না (সুরা রূম ৩০ : ৩০)।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে : মানব প্রকৃতি কী জিনিস? এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে আমাদের জেনে নেওয়া ভালো দার্শনিকগণ এই বিষয়ে কী ভেবেছেন। আমরা যদি সামাজিক দর্শনের ইতিহাস গভীরভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বিজ্ঞানে অধ্যয়নের বিষয়বস্তু ছিলো মানুষ। কেননা সব কিছুই বিশ্লেষণ করা হতো তারই অবস্থার আলোকে। তবে মানব প্রকৃতি নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা গেছে। যেমন তা কি ধরনের হতে পারে। এই উত্তরটি তারা খুঁজে পেতে চায় যাতে এর উপর ভিত্তি করে স্থায়ী সমাধানের জন্য কোনো কার্যকর মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায়। ইপুকেরিয়ান ফেলোসফির মতে মানব প্রকৃতি হচ্ছে মূলত স্বার্থপর ধরনের। এর পিছনে রয়েছে তার সুখ ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা। ম্যাকিয়াভেলী যে রাজনৈতিক দর্শন আমাদের দিয়ে গেছেন তার মূল ভিত্তি হচ্ছে এটাই যে, মানুষ আসলে চরম স্বার্থপর, মালিকানামুখী এবং আগ্রাসী। হব্‌স তার বিখ্যাত গ্রন্থ লেভিয়াথানে মানব প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, সে হচ্ছে পশুর চাইতেও অধম এবং স্বার্থপরতাই হচ্ছে তার সবচাইতে বড় চালিকা শক্তি। লক এবং অন্যান্যরা মনে করেন মানুষ মূলত আত্মকেন্দ্রিক। সংক্ষেপে বলা যায়,

www.amarboi.org

অধিকাংশ চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের মতে, মানুষ হচ্ছে স্বার্থপর এবং প্রকৃতিগতভাবে সে হচ্ছে মন্দ।

মানব প্রকৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা ভিন্ন। এই মতে মানুষ মূলত ভালো এবং শান্তিপ্রিয় ধরনের। এর অর্থ হচ্ছে স্বভাবজাতভাবে মানুষ হচ্ছে উত্তম প্রকৃতির। তাই ইসলামি সমাজও চায় একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে। সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ তায়ালা যখন মানুষকে বলেন, আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা বানাতে চাই; তারা বললো, তুমি কি এমন কাউকে (খলিফা) বানাতে চাও যে (তোমার) জমিনে (বিশৃঙ্খলা ও) বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং (স্বার্থের জন্য) তারা রক্তপাত করবে, আমরাই তো তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার তাসবীহ পড়ছি এবং (প্রতিনিয়ত) তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি; আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না (সুরা বাকারা ২ : ৩০)। এই আয়াতের পাশাপাশি আমরা মহানবি সা.-এর বাণী স্মরণ করতে পারি যাতে বলা হয়েছে প্রতিটি শিশুই মুসলিম বা শান্তিকামী হয়ে জন্মায়। এই বাণীর মর্মার্থ হচ্ছে মানুষ মূলত ভাল ও শান্তিকামী। সে মন্দ প্রকৃতির নয়।

কুরআনের অন্য আয়াতে মানব প্রকৃতির ভালো দিকের উপর জোর দেওয়া হয় :

> অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে পয়দা করেছি, তারপর (তার অকৃতজ্ঞতার কারণেই) আমি তাকে সর্বনিম্নস্তরে নিক্ষেপ করবো, তবে যারা ইমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এমন সব পুরস্কার যা কোন দিন শেষ হবে না (সুরা আততীন ৯৫ : ৪-৬)।

এই আয়াতে আরবি একটি শব্দ আছে যা হচ্ছে তাকয়িম। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে উত্তম কাঠামোতে তৈরি করা। যদিও এর দ্বারা উত্তম আকৃতির পাশাপাশি উত্তম প্রকৃতি ও সংবিধানকে বুঝানো হয়েছে। এই আয়াত মতে মানুষ কখনো খারাপ প্রকৃতির হতে পারে না। কেননা তাকে সর্বোত্তম পবিত্রতা দিয়ে তৈরি করার কারণেই ফেরেশতাদের সিজদা করতে বলা হয়েছে (সুরা বাকারা ২ : ৩৪)। মানব প্রকৃতি যদি মন্দ হতো তাহলে পৃথিবীতে তার খলিফা হিসেবে প্রেরণ করার মত সম্মান তাকে দিত না। প্রশ্ন হচ্ছে : তাহলে মানুষ কেন সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে আসে?

কুরআনের আয়াতের আলোকে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের মর্যাদাই সর্বোচ্চ। তাকে পৃথিবী পরিচালনার জন্য অনেক

www.amarboi.org

কিছুই শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে (সুরা বাকারা ২ : ৩১)। তাছাড়া সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে বিশেষ ক্ষমতাও তাকে দেওয়া হয়েছে (সুরা শামস ৯১ : ৭-১০)। এই গুণগুলো দেওয়া হয়েছে যাতে পৃথিবীতে সে আল্লাহ তায়ালার আইন বাস্তবায়িত করতে পারে। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই উত্তম প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করা। যদি তাই হয় তাহলে পার্থিব লোভ লালসার শিকার সে হবে না। মূলত তার আচার আচরণ ও মন মানসিকতা পরীক্ষা করার জন্যই পৃথিবীতে চাকচিক্যময় করে গড়ে তোলা হয়েছে (সুরা কাহাফ ১৮ : ৭)।

এটাই হচ্ছে মানব জাতির জন্য পরীক্ষা এবং সে যদি নিজেকে সংবরণ না করে এবং লোভ লালসার শিকার হয় তাহলে তাকে আল্লাহ তায়ালা যে ক্ষমতা দিয়েছেন তার অপব্যহার সে করবে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। ফলে সে পশুর চাইতে অধম সত্তায় পরিণত হবে। কিন্তু যারা তাদের প্রতিভাকে সঠিক কাজে লাগায় এবং আল্লাহ তায়ালার আইন মেনে চলে তারা নিঃসন্দেহে মানব জাতির জন্য আল্লাহ তায়ালা যে উচ্চ সম্মান নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই উপভোগ করবে। আর আল্লাহ তায়ালা এই ধরনের মানুষকে দিবেন অগণিত নিয়ামত (সুরা আততীন ৯৫ : ৬)।

খ. ব্যক্তি স্বার্থ

উপরের আয়াত সমূহের আলোকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ব্যক্তি স্বার্থ হচ্ছে মানব প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য। এই স্বার্থপরতার উপর ভিত্তি করেই দার্শনিকগণ বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ উপস্থাপন করেন। তবে এই মতবাদগুলো ইসলামি আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মানুষ শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বার্থপরতার কারণেই তার স্বাস্থ্য, যোগ্যতা ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করে না। নৈতিক দায়িত্ব হিসেবেও মানুষ নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়। কেননা জীবনের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি সুস্বাস্থ্যের উপরই নির্ভর করে। কোনো কাজ নিজের স্বার্থে করলেই তা মন্দ হয়ে যায় না। কিন্তু এই কাজ যদি অসৎ, অবিবেচনাপ্রসূত এবং অন্যের অধিকার খর্ব করার মতো হয়ে থাকে তাহলে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। ব্যক্তি স্বার্থ বলতে বুঝায় নিজের সুবিধাকে সংরক্ষণ করা অথবা অন্যের তুলনায় নিজের সমৃদ্ধিকে এগিয়ে নেওয়া। এই মতে স্বার্থপরতা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করা। এই আলোকেই সে তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করে। তবে এই ধরনের স্বার্থবাদী মন মানসিকতা ইসলামি অর্থনীতির আমানতমুখী

www.amarboi.org

দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মতে মানুষ হচ্ছে তার সহায় সম্পদের আমানতদার মাত্র এবং দরিদ্র ও চাহিদাসম্পন্ন মানুষের স্বার্থও তাকে দেখতে হবে। সে নিজে কষ্ট সাধ্যের মাধ্যমে যাই-ই আয় করুক না কেন অন্যের স্বার্থও দেখতে হবে।

মানুষ যদি অর্থনৈতিক বিবেচনায় সহায় সম্পদের আমানতদার হয়ে থাকে এবং অন্যের কল্যাণের ব্যাপারেও তাকে যদি চিন্তা ভাবনা করতে হয় তাহলে সে কখনো স্বার্থপর প্রকৃতির হতে পারে না। যদি স্বভাতজাতভাবে তা হয়েও থাকে সেটি তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তবে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করলেও চলবে না। ইসলামি রাষ্ট্রনীতি হচ্ছে স্বভাবজাত স্বার্থপরতাকে বিলুপ্ত না করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা। অতীতে আল্লাহ তায়ালার আইনের অধীনে এই ধরনের আত্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক সফলতা দেখা গেছে। মানুষের স্বার্থপরতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় আল্লাহ তায়ালার বিধান মতো পরিচালিত হয়ে যা তাকে নিজের স্বার্থের পাশাপাশি সমাজের সম্মিলিত স্বার্থও দেখার আদেশ দেয়। আল্লাহ তায়ালার প্রতি তার যে দায়িত্ব আছে তা হচ্ছে ইমান, নামাজ ও তার আদেশ- প্রত্যাদেশের প্রতি আনুগত্য। এর পাশাপাশি তাকে সমাজের স্বার্থে কল্যাণমূলক কাজ করতে হবে। শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ করলেই চলবে না। আবার সম্মিলিত কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে নিজের স্বার্থকে উপেক্ষা করলেও চলবে না। এই প্রসঙ্গে মহানবি সা.-এর একটি বাণী প্রণিধানযোগ্য : তোমার উপর তোমার আত্মার অধিকার রয়েছে এবং তোমার শরীরেরও অধিকার রয়েছে। এই হাদিসে আমরা আত্মা ও শরীরের সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন দেখতে পাই।

ইসলাম আমাদের যে জীবন দর্শন দিয়েছে তা সমাজ ও ব্যক্তির স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ভারসাম্যপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান নিশ্চিত করেছে। বাস্তবতার জগতে যদি কোনো ধরনের সংঘর্ষ দেখাও দেয় তাহলেও ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। এখানে বল প্রয়োগের কোনো প্রশ্ন আসে না। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষকে তার দায় দায়িত্বগুলো উত্তম রূপে উপলব্ধি করতে হবে এবং তার জন্য কুরআনের দিক নির্দেশনাগুলোই যথেষ্ট। কুরআনের শিক্ষা মানুষের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করে। তাছাড়া মহানবি সা. নিজেও সামাজিক স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে একটি উত্তম আদর্শ বাস্তবতায় পরিণত করে দেখিয়ে গেছেন।

আগের আলোচনা থেকে আমরা বুঝেছি যে, ব্যক্তি পর্যায়ের নৈতিকতা সম্বন্ধীয় বিধি বিধানগুলোর বিষয়ে নৈতিক দর্শনের জগতে ব্যাপক মতপার্থক্য বিরাজ করছে।

www.amarboi.org

এগুলো মূলত দায়িত্ব ও স্বাধীনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। নৈতিক দর্শন অনুযায়ী দায়িত্ব হচ্ছে এমন কোনো কাজ করা যার আগে মানুষকে চিন্তা করতে হয়। কিন্তু ইসলামি মতে শুধুমাত্র চিন্তা ভাবনা করলেই হবে না বরঞ্চ ইসলাম নৈতিকতার যে মাপকাঠি প্রবর্তন করেছেন সেই অনুযায়ী হতে হবে। ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, মানবিক কর্মকাণ্ডকে ইসলাম পাঁচটিভাবে বিভক্ত করেছে।

নৈতিক দর্শন অনুযায়ী স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় যে মতবাদগুলো আছে সেগুলো দায়িত্ব সংক্রান্ত মতবাদের কারণে ব্যাপক ভুলের শিকার হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, সামাজিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত কিংবা সম্মিলিতভাবে করা হয় তখন এরও একটি সর্বনিম্ন সীমারেখা নির্ধারণ করা উচিত এবং এই ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে বিলুপ্ত করলেও চলবে না। তার কর্মকাণ্ড ও চিন্তাধারার স্বাধীনতায় হাত দেওয়া যাবে না। তবে সামষ্টিক মতবাদের প্রবক্তাগণ এর বিরোধীতা করে বলেন যে মানুষকে যদি ব্যক্তি পর্যায়ে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সমাজে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিবে কেননা সে হবে আগ্রাসী ও স্বার্থপর। ইসলাম তার নিজস্ব আদলে এই দ্বন্দ্বের সমাধান দিয়েছে। এখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাধিকারকে সমুন্নত রাখা হয়েছে তবে এই শর্তে যে তা সম্মিলিত সামাজিক স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

যদি নৈতিকতার কথা বলা হয় তাহলে ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষকে অবাধ স্বাধীনতার দিকে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে না, পক্ষান্তরে সমাজও তার ব্যক্তিসত্তাকে বিলুপ্ত করার কোনো অধিকার রাখে না। সমাজ পারে না ব্যক্তিকে তার মালিকানার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে যেমনটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো করেছে। ইসলাম ন্যায়বিচার ও সাম্যে বিশ্বাসী। তাই এমন জীবন বিধান প্রবর্তন করে যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য উপাদেয়। এটি কখনো ব্যক্তিসত্তাকে বিলুপ্ত করার পক্ষে অবস্থান করেনি বরঞ্চ সম্মিলিত স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে তাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করেছে মাত্র। ইসলামি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণমূলক কর্মকাণ্ড আইন শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং কারো ন্যায়সঙ্গত অধিকার যাতে খর্ব না হয় সেই দিকেই তার সজাগ দৃষ্টি থাকে। এই ভাবেই ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত অধিকার সংরক্ষণ করে এবং নিজ ব্যক্তিগত উন্নয়নে সকল সুযোগ সুবিধাকে সংরক্ষণ করে যাতে তা সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসতে পারে। ব্যক্তিগত উন্নয়ন যাতে আবার অহংকারের দিকে মানুষকে নিয়ে না যায় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ইসলামি ব্যবস্থার আচরণ বিধি প্রবর্তন করেছে যা তার অনুভূতি ও কর্মকাণ্ডকে চারিত্রিক উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত করে।

www.amarboi.org

গ. মানুষের ব্যক্তিসত্তা

ইসলামি আদর্শ মতে ব্যক্তিসত্তা মানুষের একটি স্বভাবজাত ও অন্তর্নিহিত বিষয় তাই তাকে দিতে হবে যথাযোগ্য সম্মাননা। ইসলামি ব্যবস্থায় মানুষ ব্যক্তিসত্তাহীন কোনো প্রাণী নয় বরঞ্চ কুরআনের আয়াত অনুযায়ী সে হচ্ছে একটি দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্ব : একজন কখনো আরেকজনের বুঝা বহন করে না (সুরা আন'আম ৬ : ১৬৪, সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ১৪)। সে ব্যক্তির জন্য ততটুকুই বিনিময় রয়েছে যতটুকু সে সম্পন্ন করবে (সুরা বাকারা ২ : ২৮৬)। এই ধরনের আরো অন্যান্য আয়াত মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্বের দিকে ইঙ্গিত করে যার অর্থ হচ্ছে তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তাই মানুষের মূল্য আপেক্ষিক কোনো বিষয় নয় এটি হচ্ছে একটি অন্তর্নিহিত বিষয়। কান্ট অবশ্য এর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে মতে বলা যায় মানুষকে ব্যবহার করতে হবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে তাকে কখনো মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

ইসলামের কল্যাণেই মানুষ তার যথার্থ পুণ্য অর্জন করতে পারে এবং সে সভ্যতার কোনো নগণ্য অংশ হিসেবে নিজেকে দেখতে পারে না। অ্যারিস্টটল অবশ্য তাকে সভ্যতার একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবেই দেখেছেন। ইসলামি সমাজে মানুষ তার গুরুত্ব হারায় না, কেননা তার ব্যক্তিত্বকে সম্মান করা হয় এবং অনেক সামাজিক সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে এই মানুষ। সম্পর্কগুলো নির্ভর করে তার ব্যক্তিসত্তার উপর, গুণাবলী ও কর্মকাণ্ডের উপর। এই সম্পর্কগুলোই তাকে প্রভাবিত করে এবং তার কর্মকাণ্ড ও গুণাবলীকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়। তাই বলা যায় সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে ব্যক্তি মানুষ যে সামাজিক মূল্যবোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নিজের নৈতিকতাকেও সমুন্নত করতে পারে। মূলত সে যেমন সমাজ থেকে নেয় তেমনি সে সমাজকে দেয়। সমাজ কল্যাণ আসলে এই ধরনের পারস্পরিক লেনদেনের উপরই নির্ভরশীল।

ঘ. সমাজের জন্য মানুষ এবং মানুষের জন্য সমাজ

সমাজ যেহেতু মানবিক সম্পর্কের একটি ব্যবস্থাপনা সেহেতু তারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ব্যক্তি মানুষ। তেমনি ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমাজ। ব্যক্তিবাদে যেমন ব্যক্তিসত্তার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তেমন অতিমাত্রায় গুরুত্বারোপ ইসলামে করা হয়নি। সমাজতন্ত্রের মতো সমাজকেই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ইসলামি ব্যবস্থায় একটিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আরেকটিকে বিনাশ করা হয়নি। কেননা ব্যক্তি ও সমাজ ইসলামি জীবনব্যবস্থায়

www.amarboi.org

সমান গুরুত্বের দাবিদার। ব্যক্তিসত্তাকে দমন করার পরিবর্তে ইসলাম কিছুটা সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে সমাজের স্বার্থকে সমুন্নত রেখে ব্যক্তিসত্তাকে সংরক্ষণ করতে চায়। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিসত্তার নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কেননা যদি ব্যক্তি নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ করে তাহলে আপনা আপনি সমাজের কল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারবে। ইসলামি জীবনব্যবস্থা মতে সমাজ ব্যক্তিসত্তার সমাবেশ ছাড়া আরো কিছুই নয়।

ইসলাম যেহেতু একটি আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত প্রাকৃতিক বিধান সেহেতু এখানে তার প্রবর্তিত বিশ্বাস সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বের দাবিদার। তাই এটি বিশ্বজনীন ধর্ম। এই প্রসঙ্গে চার্লস গাইড ও চার্লস রেস্ট এর ব্যাখ্যাগুলো আমরা তুলে ধরতে পারি :

> 'আমরা বলতে পারি যে, প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিতে সর্বোত্তম ব্যবস্থা। এটি শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে নয় বরঞ্চ যুক্তিবাদী, সাংস্কৃতিক ও উদারমনা যে কোনো ব্যক্তি তা মেনে নিবে। বাহ্যিক নিয়ামক সমূহের পর্যালোচনা থেকে এর জন্ম নয় বরঞ্চ অন্তর্নিহিত মূলনীতি থেকেই তা উৎসারিত হয়। এই ব্যবস্থা একটি অতি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা। তাই প্রাত্যহিক জীবনে আকর্ষিকতার উর্ধ্বে এসে এটি বিশ্বজনীনতা ও অপরিবর্তনীয় ধারার গুণে গুণান্বিত। সর্বকালের জন্য এটি একই অবস্থায় সবার জন্য বিরাজ করেছে। এর মূলনীতিগুলো ছিল অদ্বিতীয়, চিরস্থায়ী অপরিবর্তনীয় এবং বিশ্বজনীন। ঐশ্বরিক সত্তাই হচ্ছে এর আদি উৎস তাই পরিধির বিবেচনায় এটি হচ্ছে বিশ্বজনীন'[১]।

ইসলাম যেমন ধর্ম হিসেবে বিশ্বজনীন, তেমনি তার সমাজব্যবস্থা। যেহেতু এটি আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ব্যবস্থা সেহেতু এটি সূক্ষ্ম ও সুনিয়ন্ত্রিত। সমাজবিজ্ঞানীগণ যে সুসংগঠিত সমাজ ও বিশ্ব ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেন তা একমাত্র বাস্তবায়িত করা যাবে যদি মানব জাতি ইসলামি মূলনীতিগুলো অনুসরণ করে এবং তার বাণী ও মর্মার্থগুলো যথাযথভাবে পালন করে।

---

[১] Charles Gide and Charles Rest. A History of Economic Doctrines, p. 29

www.amarboi.org

সপ্তদশ অধ্যায়

ইসলামে সামাজিক বিবর্তন

সামাজিক বিবর্তনের সাধারণ মতবাদ

বিবর্তন বলতে সাধারণত প্রাথমিক অবস্থা থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌঁছানোর ধীর স্থির প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়। সামাজিক বিবর্তন বলতে সাধারণত ঊর্ধ্বমুখী সরল রৈখিক অগ্রগতিকে বুঝানো হয় যা কখনো কখনো পিছিয়ে পড়তে পারে কিংবা নিম্নমুখী হতে পারে যদি অগ্রগতির কাঙ্ক্ষিত চালিকা শক্তি অনুপস্থিত থাকে। সভ্যতার পতনে টয়েনবি তিনটি নিয়ামক চিহ্নিত করেছেন : সংখ্যালঘুর মধ্যে সৃজনশীল শক্তির অভাব, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুকরণের অনুপস্থিতি এবং পুরো সমাজে সামাজিক সঙ্গতির অভাব। এই তিনটি নিয়ামক থেকেই সামাজিক অগ্রগতির পরিবর্তে স্থবিরতার সৃষ্টি হয়।

সামাজিক ইতিহাসের আলোকে আমরা সামাজিক বিবর্তনের অর্থ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো। সামাজিক ইতিহাসে সাধারণত সামাজিক সম্পর্কের যে পরিবর্তনশীল রূপরেখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং সামাজিক মতবাদ ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করা হয়। সামাজিক বিবর্তন শুরু সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে যা কিনা কোনো নির্দিষ্ট সমাজের অর্থ ও মূল্যবোধের পরিবর্তন সাধন। সমাজের কোনো গুরুত্বপূর্ণ উপদলও এই পরিবর্তন আনতে পারে।[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামাজিক প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানের উপর বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়। অনেকেই তখন বিশ্বাস করতেন খোদ মানুষের অন্তর্নিহিত সামাজিকতার মধ্যেই সামাজিক অগ্রগতি বিরাজ করে। কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) দাবি করেন যে, এই প্রক্রিয়ার উন্নয়নে যে চালিকা শক্তিটি কাজ করে সেটি হচ্ছে সমাজ ও ব্যক্তিবর্গের সংগ্রাম, প্রতিযোগিতা ও সাম্যবাদী শক্তির সংগ্রাম[২]।

এই ক্ষেত্রে সবচাইতে ব্যক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন হেগেল তার দর্শনের ইতিহাসের মাধ্যমে (১৭৭০-১৮৩১)। তার মতে, অগ্রগতি সাধিত হয় সংশ্লেষণ ও সংঘর্ষের ফলাফল রূপে। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় দেখা যায় একটি আন্দোলন অথবা মতবাদ

---

[১] A Dictionary of the Social Sciences, "Social Change".

[২] Barnes, An Introduction to the History of Sociology, p.56

www.amarboi.org

অথবা অভিসন্দর্ভ এই ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে থাকে। তখন অগ্রগতির পথে কোনো বিপরীত মতবাদ বাধার সৃষ্টি করে নতুন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই বাধা ও সংঘর্ষ থেকে এমন এক চূড়ান্ত সংশ্লেষণের সৃষ্টি হয় যা সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়াকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। এই সংশ্লেষণটি নতুন করে আরেকটি তথ্যে পরিণত হয়। এই ভাবেই বিবর্তন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কার্লমার্ক্স হেগেলের এই মতবাদের বিকল্প হিসাবে নতুন একটি মতবাদ পেশ করেন। হেগেল যেখানে আদর্শবাদের কথা বলেন সেখানে কার্লমার্কস বৈষয়িকতাবাদের উপর জোর দিয়ে বলেন। সামাজিক বিবর্তন কোনো সামাজিক চিন্তাধারার পরিবর্তনের ফসল নয় বরঞ্চ তা হচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলাফল।

সামাজিক বিবর্তনের ইসলামি মতবাদ

সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে ইসলামের নিজস্ব মতবাদ রয়েছে। এটি হেগেলের আদর্শবাদ ও মার্কেসের বৈষয়িকতাবাদের চাইতে ভিন্ন। এটি বৈষয়িকতা ও আধ্যাত্মিকতার একটি সমৃদ্ধ সংশ্লেষণ। এখানে নৈতিক চালিকা শক্তি হচ্ছে ইচ্ছা শক্তি। এই কারণে ইসলামি সমাজব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমাজের আন্তরিক মিথস্ক্রিয়ায় বিশ্বাসী।

ইসলামি সমাজব্যবস্থার মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয় তার পাপ ও পুণ্য, ভালো ও মন্দের নৈতিকতা সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। প্রতিটি মুসলমানকে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো যথাযথভাবে পালন করতে হবে। আল্লামা ইকবাল তার আ'শরার-ই-খুদি (আত্মার গোপন কথা) তে এই বিষয়ে জোর দেন যে, ইমানের মাধ্যমে ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ঘটাবে। তার গুণাবলীতে সে আল্লাহ তায়ালাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে। এই সকল আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমেই রাষ্ট্র ও সামাজিক সঙ্গতি সংরক্ষণ করার সুযোগ। সকল অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের উৎস হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা এবং সকল নৈতিক বিধানের উৎস হচ্ছে আল-কুরআন।

সময়ের আবর্তে কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত মূল্যবোধগুলোর মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে। তবে আধ্যাত্মিক ও অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ ও আদর্শগুলোর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসতে পারে না। তাই ইসলামের নৈতিক বিধান হচ্ছে সর্বকালীন ও সর্বজনীন প্রকৃতির। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করেই ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম জীবন সম্বন্ধীয় যে দূরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দিয়ে গেছে তার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে যা আমাদের পুরণ করতে হবে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে কোনো কিছুই সৃষ্টি করা হয়নি (সুরা আদ দুখান ৪৪ : ৩৮)। সকল সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার মহান ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনা মতো হয়েছে। জীবন অর্থহীন নয়, এর রয়েছে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

www.amarboi.org

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই চূড়ান্তভাবে ফিরে যাবে (সুরা নাজম ৫৩ : ৪২) এ হচ্ছে আহ্বান। এর অর্থ হচ্ছে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যক্তিকে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কারণ জীবন নামক নাটকের অবসান এখানেই নয় বরঞ্চ মৃত্যুর পরও জীবন নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হবে।

পার্থিব জীবন হচ্ছে এক ধরনের ক্রান্তিকাল ও পরীক্ষা মাত্র। এটি হচ্ছে ভবিষ্যতের সোপান যা পার্থিব জীবনের চাইতে উত্তম ও চিরস্থায়ী। এই কারণেই অবিরাম প্রচেষ্টার উপর জোর দেওয়া হয় যাতে করে আল্লাহ তায়ালার আইনের প্রতি আনুগত্য ও ন্যায়পরায়ণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তার চূড়ান্ত সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এই লক্ষ্যে আমাদেরকে যথাযথভাবে মূল্যবোধ পালন করতে হবে যাতে আমরা সে ভাবেই উত্তম প্রতিদান পাই কুরআনে (সুরা ইনশিকাক ৮৪ : ৪০)। বলা হয়েছে ধীরে ধীরে তোমাদের উপরে পৌছানো হবে। এই পর্যায়ক্রমিক উত্থানের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করে অগ্রগতি সাধন করা। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদের আল্লাহ তায়ালার আইন অনুযায়ী যথাযথভাবে জীবনযাপন করতে হবে এবং আমরা কখনো পরকালের ব্যাপারে উদাসীন হতে পারব না।

একজন মুসলমানের জীবন সম্বন্ধীয় সঠিক দর্শন হচ্ছে পার্থিব জীবনকে অবজ্ঞা না করা এবং সাথে সাথে তাতে এতটাই মত্ত হয়ে না যাওয়া যার কারণে সে আধ্যাত্মিক ভবিষ্যতকে ভুলে যেতে পারে।

> 'মানুষদের ভেতর থেকে একদল লোক বলে, হে আমার মালিক, (সব) ভালো জিনিস তুমি আমাদের এ দুনিয়াতেই দিয়ে দাও, বস্তুত (যারা এ ধরনের কথা বলে) তাদের জন্যে পরকালে আর কোনো পাওনাই (বাকি) থাকে না। (আবার) তাদেরই আরেক দল বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, এ দুনিয়ায়ও তুমি আমাদের কল্যাণ দান করো, পরকালেও তুমি আমাদের কল্যাণ দান করো; (সর্বোপরি) তুমি আমাদের আগুনের আযজাব থেকে নিষ্কৃতি দাও। এ ধরনের লোকদের তাদের নিজ নিজ উপার্জন মোতাবেক তাদের যথার্থ হিস্যা রয়েছে, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী' (সুরা বাকারা ২ : ২০০-২০০২)।

তাই দেখা যাচ্ছে তারাই সৌভাগ্যবান যারা ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী জীবন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। আমরা ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী ও উত্তম প্রতিদান হারাবো যদি শুধুমাত্র পার্থিব সাফল্যকেই মুখ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত করি। আমাদের এই পার্থিব জীবনযাপন করতে হবে পরকালের দিকে লক্ষ্য রেখে। আমাদের সামাজিক অগ্রগতি নির্ভর করে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস ও সেই অনুযায়ী আমলের উপর। আমাদের এই দুইটি বিষয় বজায় রাখতে হবে পরকালে তার সাথে সাক্ষাৎ

www.amarboi.org

হওয়া পর্যন্ত। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আমাদেরকে অবিরত আল্লাহ তায়ালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে এবং অবিরাম কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড চর্চা করে যেতে হবে।

> 'অতএব তোমাদের মাঝে যদি কেউ তার মালিকের সাক্ষাৎ করে সে যেন নেক আমল করে, সে যেন হামেশা নেক আমল করে, সে যেন কখনো তার মালিকের এবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে' (সুরা কাহাফ ১৮ : ১১০)।

আল্লাহ তায়ালার পথের যাত্রার উত্তম পাথেয় হচ্ছে ভাল চরিত্র যা প্রতিফলিত হয় উত্তম কর্মকাণ্ডের মধ্যে। শুধুমাত্র ইমান অথবা বিশ্বাসী যথেষ্ট নয় এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে মহৎ কাজকে। আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে চিন্তাধারা ও বিশ্বাস অসার হয়ে যাবে যদি মানবিক জীবনে তার বাস্তব প্রতিফলন দেখা না যায়। মানুষের মধ্যে যদি নৈতিকতার সঞ্চার না হয় তাহলে মানসিক উন্নয়ন অথবা আধ্যাত্মিক চর্চা কোনো কাজে আসবে না। তাই বন জঙ্গল কিংবা গুহায় জীবনযাপন করা ইসলামে নিষিদ্ধ। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি তাই আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীতে তাকে সজ্জিত হতে হবে এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর সৃষ্টির সেবায় এই গুণাবলী প্রতিফলিত হতে হবে। এখানে আল্লাহ তায়ালার প্রতি যে ভক্তির কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে আমরা নিজেদের ইচ্ছাকে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে দিব। এতে করে আমরা ধার্মিক জীবনযাপন করার সুযোগ পাব এবং এর উত্তম আদর্শ ও নমুনা পূর্ব পুরুষদের মাঝে খুঁজে পাব। তারা তাদের আদর্শকে বাস্তব রূপ দেওয়ায় ব্রতি ছিলেন। একজন মানুষের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে উন্নত নৈতিক জীবনযাপন করা এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি হিসেবে নিজের ভূমিকা পালন করা। তাই তাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালার আইন মেনে চলতে হবে এবং পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে মূলত এক ধরনের পবিত্র আমানত। ইবনে আব্বাস রা.-এর মতে এই প্রতিনিধিত্বের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব যা মানুষকে পালন করতে হবে সকল আন্তরিকতার সাথে।

আল্লাহ তায়ালার পথে যারা চলে তাদেরকে কুরআনে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছে। তাদের এই শ্রেণি বিভাগ নির্ভর করে এই যাত্রায় তারা আল্লাহ তায়ালার যে গুণাবলী প্রকাশ করে তার উপর। প্রতিটি শ্রেণির নামকরণ করা হয়েছে তার বিশিষ্ট গুণ অনুযায়ী। এই শ্রেণির কর্মকাণ্ড ও ধার্মিকতায় নাম নির্ধারণ করে এখানে বিশ্বাস মৌলিক বিষয় বলে তা বিবেচ্য বিষয় নয়। মূলত, প্রতিটি ইমানদার ব্যক্তি এই যাত্রার প্রতীক। তবে আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত প্রতিনিধি হচ্ছে তারাই যারা তাদের ইমানকে সুন্দর কর্মকাণ্ড দ্বারা সজ্জিত করেছে। ইসলাম শুধুমাত্র কিছু বিশ্বাসের সমষ্টি

www.amarboi.org

নয়। এর রয়েছে নিজস্ব পরিকল্পনা, জীবনধারা ও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যারা এগুলোর গুরুত্ব বোঝে তারা এই লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে নেক আমলের মাধ্যমে। কুরআনে সালেহীনদের উল্লেখ রয়েছে, তারা হচ্ছে যারা সঠিক পথ অনুসরণ করে। মুসলেহীন হচ্ছে তারা যারা সমাজের পুণর্গঠনে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। মুহসিনীন তারা যারা অন্যের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। মুফলেহীন তারা যারা মানুষের কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে। মুকসিতীন তারা যারা তাদের কর্মকাণ্ডে সদা সর্বাদা ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে। সিদ্দিকীন তারা যারা পূঙ্খানুপূঙ্খভাবে সত্যকে লালন পালন করে এবং নিজেরা বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করার চেষ্টা করে। মুকাররাবিন তারা যারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এতটাই চেষ্টা করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কাছে টেনে নেন।

তাদের একটি শ্রেণি হচ্ছে সুহাদা যারা আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় নিজেদের জীবন দান করে দেয়। এই সকল ইতিবাচক শ্রেণির বিপরীতে কুরআন নেতিবাচক শ্রেণির উল্লেখও করেছে। নেতিবাচক শ্রেণিরও বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে তাদের নেতিবাচক গুণাবলী ও কর্মকাণ্ড অনুযায়ী। কাফেরুন হচ্ছে তারা যারা অবিশ্বাসী ও অকৃজ্ঞ। মুশরিকিন হচ্ছে তারা যারা বহু ঈশ্বরবাদী এবং আল্লাহ তায়ালা সহযোগিতে যারা বিশ্বাসী। যালেমীন তারা যারা অন্যায় ও জুলুমে অভ্যস্ত। মুফসেদিন তারা যারা অরাজকতা সৃষ্টিতে উগ্রীব। মুনাফেকিনীন তারা যারা দ্বিমুখী আচরণে অভ্যস্ত। এই ধরনের আরো নেতিবাচক শ্রেণির উল্লেখ কুরআনে ও হাদিসে রয়েছে। ইসলামের প্রশংসিত ও নিন্দিত শ্রেণি বিভাগ এটাই ইঙ্গিত করে যে পাপ ও পুণ্যময় কর্মকাণ্ডের উপর একজন মানুষের মূল্যায়ন উঠানামা করে। এর অর্থ হলো ইসলামি বিবর্তন মতবাদ অনুযায়ী মানবিক অগ্রগতির যেমন উত্থান রয়েছে তেমনি তার নিম্নমুখী পতনও রয়েছে। এই বিষয়ে কুরআনের একটি আয়াতের উল্লেখ করা যেতে পারে :

> 'অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে পয়দা করেছি, তারপর (তার অকৃতজ্ঞতার কারণেই) আমি তাকে সর্বনিম্নস্তরে নিক্ষেপ করবো, তবে যারা ইমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এমন সব পুরস্কার যা কোনো দিন শেষ হবে না' (সুরা আততীন ৯৫ : ৪-৬)।

আল্লাহ তায়ালার কাছে মানুষ হচ্ছে পবিত্র এবং সে উত্তম সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী। তার দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তাকে যেভাবে বানিয়েছে সে উত্তম আকৃতি ও প্রকৃতিকে ধরে রাখা (সুরা রূম ৩০ : ৩০)। আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রতিনিধি হিসেবে যে উত্তম মর্যাদা দিয়েছেন তা ফেরেশতাদের চাইতেও উত্তম তাই ফেরেশতাদেরকে তার সামনে সেজদা করার আদেশ দিয়েছেন (সুরা বাকারা ২ : ৩০- ৩৪)। মানুষের উচিত এই প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা রক্ষা করা।

নিজের প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝার ক্ষমতা দিয়েছেন (সুরা শামস ৯১ : ৭-৮)। তাই মানুষের কাছে প্রত্যাশা সে যেন তার যথাযথ ব্যবহার করে। যারা নিজের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগায় এবং আল্লাহ

www.amarboi.org

তায়ালার আইনকে মান্য করে তারা তাদের জন্য নির্ধারিত চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়। কিন্তু এর পরিবর্তে যারা মন্দের পিছে ছুটে তাদেরকে অনেক নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়।

এই পর্যন্ত আমরা ইসলামি বিবর্তনের উর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ইসলাম উর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে উৎসাহিত করে যারা পরকালে তার মুক্তি নিশ্চিত করবে। নিম্নমুখী যাত্রাকে নিরুৎসাহিত করে কেননা তাকে তা সর্ব নিম্নস্তরে নামিয়ে আনে। মানব জাতিকে এই অধঃপতন থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম যেমন নৈতিক শিক্ষার বিধান করেছে তেমনি আত্মার পরিশুদ্ধির ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়ে রেখেছে। নৈতিক শিক্ষার কল্যাণে মানব জাতি আল্লাহ তায়ালার দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন হয় এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনেও নিষ্ঠাবান হয়। ইসলামের যে মূল স্তম্ভগুলো আছে সেগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবাত্মার পরিশুদ্ধি যা কিনা সকল আবেগ ও চাহিদার উৎস। মানবিক প্রবৃদ্ধি মূলত নাফ্স আম্মারা বলে পরিচিতি। এটি চায় হীন পার্থিব ভোগ বিলাসিতা চরিতার্থ করতে। কিন্তু অন্যের উপকার এবং ন্যায়পরায়ণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই কুপ্রবৃদ্ধিকে নাফ্স মুতমাইন্নয়া পরিণত করা যায়। এটি হচ্ছে মানুষের ন্যায়পরায়ণ আত্মা যা অন্যের কল্যাণ সাধনে আনন্দ খুঁজে পায়। এখানেই আমরা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব খুঁজে পাই যা স্বার্থপর মানুষকে কল্যাণপ্রবণ সত্তায় পরিণত করে। ব্যক্তি মানুষকে সমাজের জন্য ক্ষতিকর উপাদানে পরিণত হতে না দিয়ে তাকে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করা হয়। এবং সমাজও তাকে ইসলামি ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের উন্নতি সাধনের সুযোগ করে দেয়। এই ধরনের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যেতে যেতে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়, যার বর্ণনা কুরআনে দেওয়া হয়েছে :

> (নেককার বান্দাদের বলা হবে), হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও সন্তুষ্টিচিত্তে ও তাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে, অতঃপর তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের দলে শামিল হয়ে যাও (সুরা ফজর ৮৯ : ২৭-২৮)।
>
> এই ভাবেই মানুষ তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয় : আর প্রবেশ করে আমার অনন্ত জান্নাতে (সুরা ফজর ৮৯ : ৩০)।

ইসলামের সৌন্দর্য হচ্ছে এটাই যে তা মানুষকে সঠিক পথ দেখায় এবং তাকে মন্দ থেকে দূরে রাখতে চায়। এই ভাবেই ইসলাম যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে তা নিম্ন থেকে উর্ধ্বমুখী পর্যায়ের বিবর্তনে মানব জাতিকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। তবে তার জন্য শর্ত হচ্ছে সর্বাত্মকরণে ইসলামের শিক্ষাগুলো বাস্তবায়িত করা।

www.amarboi.org

অষ্টাদশ অধ্যায়

উপসংহার

সমাজ বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিভিন্ন পর্যালোচনা থেকে এটাই প্রতিভাত হয়েছে যে, সামাজিক সংহতি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ছিল আবহমান কাল থেকেই সাংঘর্ষিক। গ্রিক সভ্যতায় সামাজিক সংহতি সংরক্ষণ করা হয়েছে নগর রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে। গ্রিক চিন্তা ভাবনার উপর রাষ্ট্রের প্রতি দেশাত্মমূলক আনুগত্যই ছিলো প্রধান বিষয়। কিন্তু তারা যখন প্রথমে মেসিডোনিয়দের অধীনে চলে গেল এবং পরবর্তীতে রোমানদের করতলগত হলো তখন তাদের স্বাধীনতাকালীন চিন্তাভাবনার কোনো বাস্তব প্রয়োগ ক্ষেত্র থাকল না। রোমান কর্মকর্তা ও রোমান আইন এমন একটি রাষ্ট্র তৈরি করে যা ছিলো কেন্দ্রীয় ধরনের এবং এখানে সব কিছুই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করত জোর জবরদস্তির মাধ্যমে। এই কারণে তারা যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যা অতিমাত্রায় ব্যক্তিবাদের উপর যেমন জোর দেয় তেমনি তাতে সামাজিক নৈতিকতার অভাব ছিলো প্রকট।

এই দিকে পরবর্তী যুগে খ্রিষ্টবাদ ঈশ্বরের প্রতি মানুষের দায়িত্বকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে। এই খ্রিষ্টবাদী শিক্ষার মূল বিষয় ছিলো রাষ্ট্রের প্রতি দায় দায়িত্বের চাইতেও মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি। এ বিষয়টি অবশ্য সক্রেটিস এবং এপোল্টস অতীতে আগেই উপস্থাপন করেছিলেন। অন্ধকার যুগের সময় যা পঞ্চম শতাব্দী থেকে সূচনা হয় এবং একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিরাজ করে। ফলে পশ্চিমা রোমান বিশ্ব বিরাট পরিবর্তনের শিকার হয়। ঈশ্বরের প্রতি দায়িত্ব ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে যে সংঘর্ষ খ্রিষ্টবাদ প্রচার করে তা চার্চ - রাজার দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। এতে করে রাজনৈতিক মতবাদে ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মধ্য যুগে রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পর্কিত মতবাদগুলেতে পোপের ব্যাপক আধিপত্য ছিলো। ঈশ্বর সমস্ত ক্ষমতার উৎস, তিনি এই ক্ষমতা পৃথিবীতে দিয়েছেন পোপের মধ্যে যা ধর্ম সংক্রান্ত এবং এই ক্ষমতার কিছু দিয়েছেন রাজাকে যা পার্থিব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু পঞ্চাদশ শতাব্দীতে পোপ ও সম্রাট দু'জনই তাদের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন। কেননা পোপ নিজেই রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতার জন্য সংঘর্ষ ও সংগ্রাম চলতে থাকে। যার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় জাতীয়তাবাদী রাজাদের উত্থানে। তারা বিগত শতাব্দীতে চার্চ যে ক্ষমতাগুলো উপভোগ করছিলো তা কেড়ে নেয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে

www.amarboi.org

ইউরোপে পুনঃসংস্কারের আধিপত্য শুরু হয়। লুথার যে ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদগুলো পেশ করেন সেগুলো রাজারা যেমন মেনে নেয় তেমনি জনগণও মেনে নেয়। পুনর্গঠন প্রক্রিয়া জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর জন্য ছিল সহায়ক, তাই তারা সামাজিক সংহতির ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ক্যাথলিক মতবাদ অনুযায়ী ঐশী বাণীর অবতারণা মহাগ্রন্থের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়নি। বরঞ্চ চার্চের মাধ্যমে এর অবতারণা যুগের পর যুগ চলতে থাকবে। তাই ব্যক্তিগত বিষয়গুলোও একজন মানুষকে চার্চের হাতেই ন্যস্ত করতে হবে[১]। এই মতবাদ প্রচার করা হয়েছিল চার্চের কর্তৃত্ব রক্ষার হীন উদ্দেশ্যে। তবে তাদের এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে প্রটেস্টান্টরা। যারা দাবি করে সত্যের অনুসন্ধান করতে হবে শুধুমাত্র বাইবেলের মধ্যে। প্রতিটি মানুষ এই গ্রন্থ চর্চা করে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা চর্চা করতে পারবে। ব্যাখ্যাকরণ প্রক্রিয়ায় যদি মতপার্থক্য দেখা দেয় তবুও বিবাদ মীমাংসা করার মতো কোনো কর্তৃপক্ষ ঈশ্বর নির্ধারণ করে দেননি।

প্রটেস্টানট মতবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যে পার্থিব কোনো মধ্যস্থতাকারী থাকতে পারে না[২]। এই ভাবেই বাস্তবে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হলেও দেখা যায় ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে চার্চের যে ক্ষমতা ছিলো সেগুলো চর্চা করে কিছু ধর্মীয় সিদ্ধান্ত দেওয়ারও অধিকার সংরক্ষণ করে রাখে। তবে সেখানে পাইকারী হারে উদারতাবাদের বিস্তৃতি ঘটে। উদারতাবাদী মতবাদ শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই বিস্তৃত ছিলো না বরঞ্চ তা ধর্মকেও গ্রাস করে যার কারণে এই উদারতাবাদ এক পর্যায়ে নৈরাজ্যবাদে পরিণত হয়।

রাজনীতি ও ধর্মে যে নৈরাজ্যবাদ দেখা দেয় তা দর্শনের বস্তুনিষ্ঠবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। নৈরাজ্যবাদ তার বিকাশে দর্শনকে মাধ্যম হিসেবে অবলম্বন করে। তারা ছিলো এমন মতবাদের প্রবক্তা যারা নিজেদের চিন্তা ভাবনা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করে অস্পষ্ট ও বিকৃত রূপে। এর নেতিবাচক প্রভাব সমাজকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বস্তুনিষ্ঠবাদের দার্শনিক মতবাদ হচ্ছে এটাই যে, আমাদের সকল বিদ্যা হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ ও আপেক্ষিক। তাদের মতে বাস্তবমুখী জ্ঞানের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এই মতবাদ অনুযায়ী সব কিছুই হচ্ছে মানব জাতির আত্মা থেকে উৎসারিত বিষয়বস্তু। এই মতবাদ অনুযায়ী নৈতিকতার মূল ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থ।

---

[১] Bertrand Russell, History of Western Philosophy, p. 19.

[২] Ibid.

www.amarboi.org

আত্মবাদ কিংবা বস্তুনিষ্ঠবাদের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা ছিলো না। কেননা তারা অবাধ ব্যক্তিবাদ কিংবা স্বাধীনতাবাদে বিশ্বাসী ছিলো। তবে এই কারণে সমাজকে গভীর সংকটের মুখোমুখি হতে হয়। নিৎসে বস্তুনিষ্ঠ দর্শনের আলোকে মানুষের বিচার করেন। তিনি নৈতিকতার উপর ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেন। তাই নির্মমভাবে যে কোনো ধরনের প্রতিপক্ষকে নির্মুল করার পক্ষপাতি ছিলেন তিনি। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ সাল থেকে এই পর্যন্ত যে মতবাদ সম্পর্কিত ক্রমবিকাশ আমরা দেখতে পাই তার সাথে সাথে সমাজ সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনার মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। কিন্তু প্রয়োজন সত্ত্বেও সামাজিক সঙ্গতির বিষয়ে কোনো ঐক্যমতে পৌছানো সম্ভব হয়নি। সক্রেটিস ছিলেন প্রথম দার্শনিক যিনি মানবিক আচরণের একটি বিশ্বজনীন বিধান খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার সমকক্ষ গ্রিক দার্শনিকগণ এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। পুনরায় উনবিংশ শতাব্দীতে কোঁত জোর দেন মানব সমাজের বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়নের উপর যাতে করে সার্বজনীন কিছু বিধি বিধান প্রবর্তন করা যায়। এতে করে বিশ্বজনীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাবে। কিন্তু তার এই পরিকল্পনা সফলতার মুখ দেখেনি উপরিল্লিখিত কারণগুলোর জন্য। সম্ভবত এই কারণেও যে মানবিক আচরণকে গৎবাধা বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের আওতায় আনা সম্ভব নয়। মানুষের রয়েছে ব্যাপক ইচ্ছা শক্তি ও আবেগ অনুভূতি। তাই যে কোনো মুহূর্তে তার পছন্দ অপছন্দ ও ইচ্ছা অনিচ্ছার বিষয়গুলো নতুন রূপে আবির্ভূত হতে পারে।

এই দিকে, সামাজিক সংহতি অস্ত্রের মাধ্যমে জোর প্রয়োগ করেও নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনো ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যের কথা বলেও তা অর্জন করা সম্ভব নয়। কেননা রাষ্ট্র নিজেও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের শিকার। সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করা যায় একমাত্র মানুষের সাথে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। কেননা তিনি সকল পরিবর্তনের উর্ধ্বে।

> তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত (সুরা হাদীদ ৫৭ : ৩)।

তাই, ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামজিক সংহতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে সফল হয়। ব্যক্তির প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এই একাত্মবাদের প্রতিফলন মানব জাতির ঐক্যের মধ্যেই দেখা যায়। অন্য অর্থে বলা যায় মানব জাতির ঐক্যে আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদ প্রতিফলিত হয়।

www.amarboi.org

ইসলাম যেখানে সফল হয় সেখানে মানব জাতির ঐক্য সাধনে খ্রিষ্টবাদ দুইটি কারণে ব্যর্থ হয় :

১. ক্যাথলিক চার্চগুলো মানুষ ও আল্লাহ তায়ালার মাঝে মানবিক মধ্যস্থতার পক্ষপাতি ছিলো এবং তারা ছিলো যাজক শ্রেণি।

২. প্রটেস্টান্টবাদ অতিরিক্ত স্বাধীনতার কারণে ধর্মের সাথেই তাদের সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে।

ইসলাম একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এবং আল্লাহ তায়ালা যা কিছু নাযিল করেছে তার উপর ভিত্তি করেই সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এই প্রসঙ্গে আমরা নিম্নের আয়াতটি উল্লেখ করতে পারি :

> হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রসুলের এবং সেসব লোকদের, যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত, অতঃপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্য) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ তায়ালার ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর ইমান এনে থাকো। (তাহলে) এই পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং পরিণাম ফলের দিক থেকেও (এটি) হচ্ছে উত্তম পন্থা (সুরা নিসা ৪ : ৫৯)।

তাছাড়া, বার্টান্ড রাসেলের মতে, ইসলাম হচ্ছে একটি সাদামাটা একাত্মবাদ যা সব ধরনের জটিলতা থেকে মুক্ত। অথচ অবতারণাবাদ এবং তীর্থবাদের যে মতবাদগুলো রয়েছে সেগুলোর কারণে এই একাত্মবাদ জটিলতার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। নবি নিজেকে কখনো ঐশ্বরিক সত্তা বলে দাবি করেননি, এমনকি তার অনুসারীরাও তার পক্ষে এই দাবি করেননি[৩]।

চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। মহানবি সা.-এর হাদিস অথবা সুন্নাহকেও আল্লাহ তায়ালার কিছু কর্তৃত্ব দিয়েছেন। সাধারণত কুরআনের কোনো দিক নির্দেশনা বা ব্যাখ্যা না পেলে সুন্নাহর দারস্থ হতে হয়। সুতরাং বলা যায় কুরআনের সম্পূরক হচ্ছে এই সুন্নাহ। মহানবি সা.-এর প্রতিটি কথায় মূলত আল্লাহ

---

[৩] Bertrand Russell, op. cit., p.413

www.amarboi.org

তায়ালার দিক নির্দেশনায় পরিচালিত (সুরা নাজম ৫৩ : ৩-৪)। আমরা যদি কোনো বিষয়ে মতপার্থক্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি তাহলে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের স্বরণাপন্ন হতে পারি। ইসলামি বিধান মোতাবেক যারা সমাজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে তাদেরকে হতে হবে ন্যায়পরায়ণ। আমাদেরকেও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষনণ করতে হবে এবং যথাযথ আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। অন্যথায় সমাজে বিরাজ করবে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। সমাজে আইনের শাসন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এটাই একমাত্র পদ্ধতি। এই ভাবেই সম্ভব সমাজে বিরাজমান দ্বন্দ্বগুলোর অবসান ঘটানো।

সব যিনি জানেন সেই আল্লাহ তায়ালার প্রজ্ঞার সহায়তা ছাড়া মূল্যবোধের কোনো সঠিক মানদণ্ড পেশ করা যাবে না। ইসলাম আইনের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে না কেননা তা যদি হয় তাহলে মানব জাতি ও সমাজের নৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আইন হারিয়ে ফেলবে।

ইসলামি আইন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এবং অপরিবর্তনীয়। সমাজের উর্ধ্বে তার অবস্থান এবং সমাজকে তার দিক নির্দেশনা মত চলতে হবে। ইসলাম যে জীবন ধারা প্রবর্তন করেছে তা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির। এই মতবাদের উপর যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত তাকে হতে হবে চিরায়ত এবং অপরিবর্তনীয় আইনের অধিকারী। কিন্তু ইসলাম এই বাস্তবতাও সামনে রেখেছে যে বৈষয়িক এই জীবন সদা পরিবর্তনশীল। তাই ইসলামি শরিয়তে এমন কিছু মূলনীতি রয়েছে যা সমাজের ক্রমবর্ধমান ও পরিবর্তনশীল চাহিদা মেটাবার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাই নির্দিষ্ট বিধানের আলোকে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে পারেন তারাই যারা এই বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এই নিয়মটি করা হয়েছে যাতে ইসলামি আইনের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। কেননা এই আইন সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সমাজ কখনো তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। ইসলামি আইন সমাজকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি কখনো তাকে পথচ্যুত হতে দেয় না। মানব জাতি যাতে খারাপ চিন্তা ভাবনাও না করে সেই জন্য ইচ্ছার কল্যাণমূলক দিকের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে মন্দ কাজের কোনো প্রশ্নতো আসেই না। ইসলামি রাষ্ট্র প্রধানের কাজ হচ্ছে আইন প্রয়োগ করা। তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন কিংবা সংশোধন করা তার দায়িত্ব নয়। তবে সমাজের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির স্বার্থে তা পরিবর্তন করার ক্ষমতাও কারো নেই। কেননা এর রয়েছে ভালো ও মন্দের নিজস্ব কিছু নৈতিক মূল্যবোধ, তাছাড়া পাপ ও পুণ্য সম্পর্কিত কিছু স্বতঃসিদ্ধ যা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এই কারণে মানব জাতির বৈচিত্র সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট একটি ঐক্যমুখী মানদণ্ড ইসলাম প্রবর্তন করেছে যাতে সহজেই একটি

www.amarboi.org

ইসলামি বিশ্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায়। নৈতিক ভিত্তির কারণেই ইসলামি রাষ্ট্র আধুনিক অন্যান্য ব্যবস্থার চাইতে উত্তম। আধুনিক রাষ্ট্রগুলোতে সার্বিক কর্মকাণ্ডে নৈতিকতা বিবেচনা করা হয় না বরঞ্চ মানবিক পরিভাষার আলোকে শুধুমাত্র সার্বভৌমত্বের উপর জোর দেয়। যে সকল আসমানী আইন দ্বারা ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালিত সেগুলোর মূল ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা যা কিনা ইসলামি ব্যবস্থায় মানব জাতির মূল্যায়নের সত্যিকারের মাপকাঠি। এই ধরনের আইনের উপর ভিত্তি করে যে মানব চরিত্র তৈরি হবে তা হবে নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়। এই আইন সকল মানব জাতির জন্য তা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম একটি উৎকৃষ্ট সমাজব্যবস্থা, কেউ যদি এর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে এই ব্যবস্থায় সাম্যপূর্ণ মর্যাদা উপভোগ করবে।

ইসলামি আইনের লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক সংহতি নিশ্চিত করা। সুসংগঠিত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এই আইন ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষকে দুইটি গুরুদায়িত্ব দিয়েছে : একটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার জন্য আরেকটি হচ্ছে সমাজের জন্য। এই কারণে তার জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে অধিকারের পরিবর্তে দায়িত্বের বিধান। তাই এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা কখনো বিশৃঙ্খলায় পরিণত হওয়ার সুযোগ পায় না। এই ভাবেই ইসলামি সমাজব্যবস্থায় সবার অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে।

এই ধরনের আইনের উপর ভিত্তি করে যে বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত হবে তা সামাজিক নিরাপত্তার জন্যই কল্যাণকর নয় বরঞ্চ তা সামাজিক সংহতিকেও নিশ্চিত করে। ইসলামি সমাজের প্রতিটি সদস্য হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি (সুরা আন'আম ৬ : ১৬৫)। এর অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিটি ব্যক্তি একজন শাসক এবং সকলের কল্যাণের জন্য সে দায়ী। মহানবি সা.-এর নিম্নোক্ত হাদিসে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

প্রতিটি ব্যক্তি অপরের জন্য রাখাল স্বরূপ এবং সবার কল্যাণের জন্য সে দায়ী। প্রতিটি ব্যক্তির জবাবদিহিতা তখনই কার্যকর হয় যখন এটি মানুষকে ত্যাগে উৎসাহিত করে। তাহলেই সমাজের সবার সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হবে। দায়িত্ববোধের অর্থই হচ্ছে অবাধ ব্যক্তি স্বাধীনতায় কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করা। এখানেই আমরা সামাজিক সংহতি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মধ্যে সমন্বয় দেখতে পাব।

এই ধরনের সমন্বয় বিধান করতে ইসলাম কোনো বল প্রয়োগের পক্ষপাতি নয়। বরঞ্চ ব্যক্তিকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বিভিন্ন সদোপদেশ দেয় এবং আখেরাতে উত্তম প্রতিদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া পার্থিব জীবনেও বিভিন্ন সুখ সমৃদ্ধির কথাও বলা হয়। ইসলামি শিক্ষা মানুষের মনকে এমনভাবে

www.amarboi.org

গঠন করে যে, কোনো এক পর্যায়ে সে অন্যের কল্যাণ সাধনেই আনন্দ পায় ফলে মানুষ হয়ে উঠে ন্যায়পরায়ণ এবং ত্যাগ তিতিক্ষায় উৎসাহী। এই দুইটি গুণই হচ্ছে সামাজিক সংহতির মূল চাবিকাঠি।

ইসলাম মানব জাতির জন্য যে আচরণ বিধি দিয়ে গেছে তার সারসংক্ষেপ আমরা মহানবি সা.-এর একটি বাণীতে পাব :

> 'তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য তাই-ই চাইবে যা তুমি নিজের জন্য চাও। যে কোনো ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের সবচাইতে বড় সামাজিক আদর্শ হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। নিঃসন্দেহে মুমিনগণ ভাই ভাই' (সুরা হুজুরাত ৪৯ : ১০)।

তাই মানব জাতির প্রত্যেকেই হচ্ছে একে অপরের ভাই যার প্রতিফলন আমরা উপরোক্ত মহানবি সা.-এর বাণীতে পাই। তাতে বলা হয়েছে যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তি নিজেকে অপরের ভাই মনে করবে সেহেতু তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে নিজের জন্য যা সে চায় অপর ভাইয়ের জন্যও তাই সে চাইবে। কান্ট তার এক মতবাদে এর ব্যাখ্যা দেন : সবাইকে উদ্দেশ্য হিসেবে দেখবে, তোমার উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম হিসেবে নয়। এই ধরনের মন মানসিকতা তৈরি করতে হলে উত্তম নৈতিক চরিত্রের প্রয়োজন। তাই, ইসলাম মানুষের চরিত্রকে এমনভাবে গঠন করে যেন সে নিজেকে অন্যের কল্যাণে নিয়োজিত করে। যদি তা হয় তাহলে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে কোনো সংঘর্ষ কখনো দেখা দিবে না। তাই ইসলামি জীবনব্যবস্থা হচ্ছে শান্তিপূর্ণ এবং এর সামাজিক ব্যবস্থাই হচ্ছে সর্বোত্তম আদর্শ।

নিম্নে আমরা ইসলামি সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে তুলে ধরব :

১. এটি আল্লাহ তায়ালার আইন অনুযায়ী গঠিত যার অবস্থান সমাজেরও আগে এবং সমাজকে তা নিয়ন্ত্রণ করে, সমাজ তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সঠিক পথ প্রদর্শন করা এবং এমন চরিত্র গঠন করা যার কল্যাণে মানুষ ন্যায়পরায়ণ কর্মকাণ্ডেই আনন্দ পায়।

২. এখানে সমাজতান্ত্রিকতা বলতে কিছু নেই। তবে সামাজিক ব্যবস্থা রয়েছে যা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

৩. আল্লাহ তায়ালার একাত্মবাদের বিশ্বাস প্রতিফলিত হয় মানব জাতির একাত্মবাদে।

www.amarboi.org

৪. জীবন হচ্ছে একটি সমষ্টি। যার প্রতিটি শাখা প্রশাখা আল্লাহ তায়ালার আইন দ্বারা পরিচালিত। তবে জীবনের প্রাত্যহিক চাহিদা মেটাবার জন্য মূলনীতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

৫. এই ব্যবস্থার দাবি হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ কর্মকাণ্ডে একে অপরের সহযোগিতা। এখানে গর্হিত কর্মকাণ্ড ও অন্যায়ের ব্যাপারে সকল ধরনের সহযোগিতা।

৬. এর নিজস্ব নৈতিকতা মানদণ্ড রয়েছে যার উৎস হচ্ছে কুরআন ও রসুলের সুন্নাহ। এরই আলোকে মানব জাতির ঐক্য সংরক্ষণ সম্ভব।

৭. এটি নয় সমাজতন্ত্র নয় পুঁজিবাদ বরঞ্চ বৈষয়িকতা ও আধ্যাত্মিকতার একটি সমৃদ্ধ সংশ্লেষণ।

৮. এটি মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। তবে এই শর্তে যে তা সামাজিক স্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

৯. মানব ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলার সকল সুযোগ এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। যার কারণে ব্যক্তি সমাজের জন্য অনিষ্টকর নয় বরঞ্চ সমাজের কল্যাণেই ভূমিকা পালন করে।

১০. এর মূল ভিত্তি হচ্ছে সদস্যদের আত্মত্যাগ।

১১. যারাই ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের সবার জন্য এর দুয়ার উন্মুক্ত এবং এখানে সদস্যরা সবাই সমাধিকার উপভোগ করবে।

১২. ইসলাম সর্বকালীন ও বিশ্বজনীন, তেমনি তার সামাজিক ব্যবস্থা। সব শেষে আমাদের বলতে হয় : সমাজবিজ্ঞানীরা এখানে এসে তাদের সমস্যার সমাধান করুন।

www.amarboi.org

Non-Arabic Titles

- Abdur Rahim, *Muhammadan Jurisprudence*, Lahore, 1963.
- Adams, C.C., *Islam and Modernism in Egypt*, New York, 1933
- Anderson. J.N. D., *Islamic Law in the Modern World*, London, 1959.
- Arnold, T., *The Preaching of Islam*, Constable Co., London, 1913.
- Azzam, Abd al-Rahman, *The Eternal Message of Muhammad*, New York, 1965
- Baldwin, J.M., *The Story of the Mind*, New York, 1912.
- Barker, E., *Greek Political Theory* : Plato and His Predecessors, Chicago, 1951.
- Barnes, H.E., ed., *An Introduction to the History of Sociology*, Chicago, 1970.
- Baungardt, D., *Bentham and the Ethics of Today*, Princeton, 1952.
- Becker, H., and Alvin Bokoff. ed., *Modern Sociological Theory*, New York, 1957.
- Berlin, I., *Karl Marx, His Life and Environment*, London, 1948.
- Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, London, 1967.
- Bieanz, J., *Introduction to Sociology*, London, 1969.
- Bonner, R. J., *Aspects of Athenian Democracy*, Berkeley Calif, 1933.
- Brown, W.J., *The Austinian Theory of Law*, London, 1906.
- Chapin, F.S., *Cultural Change*, New York, 1928; *An Introduction to the History of Social Evolution*, New York, 1913.
- Chaplin, J.P., Krawice, T.S., *System and Theories of Psychology*, New York, 1968.
- Chapman, *The Positive Philosophy of Auguste Comte*, London, 1853.
- Charles Cide and Charles Rest, *A History of Economic Doctrines*, London, 1960.
- Coulson, N. J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh, 1964.
- Darwin, C., *The Origin of Species and the Descent of Man*, New York, n.d.

www.amarboi.org

- Dewey, J., and James, H.T., Ethics, New York, 1936; *Dictionary of Social Sciences*, Toronto, 1969.
- Ellwood, C.A., *A History of Social Philosophy*, New York, 1938.
- *Encyclopaedia Americana*, New York, 1957.
- *Encyclopaedia Britannica*, London, 1964.
- *Encyclopaedia Dictionary*, London, 1909.
- *Encyclopaedia of Islam*, Leyden and London, 1913-34.
- England, E.B., *The Laws of Plato*, Manchester, 1921.
- Ewing, A. C., *Idealism*, London, 1934.
- Ferguson, W. S., *Hellenistic Athens*, London, 1911.
- Fisher, S. N., *The Middle East A History*, New York, 1968.
- Fitzgerald, S.G.V., *Nature and Sources of the Sharia in Law in the Middle East* (Ed. M. Khadduri and H. J. Liebesny) Washington, 1955.
- Freedniann, W., *Legal Theory*, London, 1953.
- Gibb, H.A. R., *Whither Islam*, London, 1932.
- Gidding, F. H., *Studies in the Theory of Human Society*, New York, 1922.
- Glotz. G., *The Greek City and Institution*, tr. Mallison, N., London, 1929.
- Guillaume, A., *The Life of Muhammad*, Oxford, 1955; *The Traditions of Islam*, Oxford, 1924.
- Hall, G.H., *Founders of Modern psychology*, New York, 1912.
- Hamidullah, M., *Introduction to Islam*, Paris, 1959.
- Hayes. E.C., *Introduction to the Study of Sociology*, New York, 1913.

- Hall, G.H., *Founders of Modern psychology*, New York, 1912.
- Hamidullah, M., *Introduction to Islam*, Paris, 1959.
- Hayes. E.C., *Introduction to the Study of Sociology*, New York, 1913.

- Hegal, O.W. F., *The Philosophy of History*, tr., Sibree, J., New York, 1956.
- Ricks, R. D., *Stoic and Epicurian*, London, 1911.
- Hitti, P. K., *History of the Arabs*, London, 1958; *The Near East in History*, New York, 1961
- Hobbes, *Leviathan*, New York, 1948.

www.amarboi.org

- Hobhouse, L. T. *Social Evolution and Political Theory*, New York, 1911.
- Hosolitz., B.F., ef., *A Reader's Guide to Social Sciences*, New York,, 1965.
- Hughes, T. P., *A Dictionary of Islam*, London, 1885.
- Hume, D., *Selections*, ed., Charles, W. H., New York,, 1927.
- Ibn Khaldun, *An Arab Philosophy of History*, tr. Charles, I., London, 1950.
- Iqbal, *The Reconstruction of Religions Thought in Islam*, Oxford, 1934.
- *International Encyclopaedia of Social Sciences*, ed., David L. Sills New York.
- Kant. I., *Critique of Pure Reason*, tr., Smith, N. K., New York, 1958.
- Keller, A. G., *Social Evolution*, New York, 1931.
- Kelson, H., *Society and Nature, A Sociological Inquiry*, Chicago, 1943.
- Kerr, M. H. *Islamic Reform*, California, 1966.
- Khadduri, M., *Islamic Jurisprudence* : Shafi `i's Risala, Baltimore, 1961; *War and Peace in the Law of Islam*, Baltimore, 1960.
- Lammens, H., Islam : *Beliefs and Institutions*, tr. ... Dension Ross, London, 1929.
- Levy, R., *The Social Structure of Islam*, Cambridge, 1957.
- Lewis, B., *The Arabs in History*, London, 19585.
- Lundberg, G. A., *Foundations of Sociology*, New York, 1939.
- Macdonald, D. B., *Development of the Muslim Theology*, Jurisprudence and Constitutional Theory, London, 1903.
- Mahamassani, *The Philosophy of Jurisprudence in Islam*, tr.. Farhat J. Ziadah Leiden 1961.
- Malthus, H., *An Essay on the Principles of population*, New York, 1941.
- Mann, P.H., *Methods of Sociological Enquiry*, Oxford, 1968.
- Martindale, D., *The Nature and Types of Sociological Theory*, ed., Sprott, W.J. H., London, 1970.
- Mead, G. H., *Mind, Self and Society*, ed., Charles, W. M., Chicago, 1934.
- Mill, J. S., *Principles of Political Economy*, New York, 1936.

www.amarboi.org

- Muslehuddin, M., Economic and Islam, Lahore, 1974; *Islamic Jurisprudence and the Rule of Necessity and Need*, Islamabad, 1975; *Islamic Socialism- What it Implies*, Lahore, 1975; *Insurance and Islamic Law*, Lahore, 1969; *Banking and Islamic Law*, Karachi, 1974.
- O'Leary, *Arabia before Muhammad*, London, 1927.
- Ogburn, W. F., Social Change, New York, 1950.
- Park, R.E., Burgess, E. W., Introduction to the Sciences of Sociology, Chicago, 1970.
- Parsons, T., The Social Systems, London, 1970; Theories of Society, New York, 1965.
- Qutb, M., Islam the Misunderstood Religion, Kuwait, 1964.
- Ross, E. A., Social Control, Boston, 1959; Social Psychology, New York, 1929.
- Sabine, G. H., A History of Political Theory, London, 1951.
- Schacht. J., An Introduction to Islamic law, Oxford, 1964.
- Shorter Encyclopaedia of Islam, London, 1961.
- Small, A. W., Origins of Sociology, Chicago, 1924.
- Sorkin, P., Contemporary Sociological Theories, New York, 1928.
- Spencer, H., The Study of Sociology, New York, 1882; Principles of Sociology, New York, 1896.
- Sunner, W.G., Folkways, Boston, 1907.
- Swinton, W., Outlines of the World's History, New York, 1875.
- Taylor, A. E., The Laws of Plato, London, 1934.
- Timasheff N. S., Sociological Theory, New York, 1957.
- Toynbee, A., A Study of History, Oxford, 1947.
- Turner, R.E., The Great Cultural Traditions, New York, 1949.
- Warrender, H., The Political Philosophy of Hobbes, Oxford, 1957.
- Weber, M., Theory of Social and Economic Organization, tr. Henderson New York, 1947.
- Wells, H.G., The Outline of History, London, 1930; A Short History of the World, London, 1949.

www.amarboi.org

- Witz, M. J., Introduction to the Science of Sociology, London, 1970.
- Wright., H., The Meaning of Rousseau, London, 1929.
- Zimmern, A. E., The Greek Commonwealth : Politics and Economics in Fifth Century Athens, Oxford, 1931.

Arabic Titles

- 'Abd al-'Aziz; Sultan of Turkey, al-Majallah, Constantinople, 1880.
- Abu Dawud, al-Sijustani, Sulaiman ibn al-Ashas, Sunan, Cairo, 1863.
- Abu Ubayd, Qasim bin Sallam, Kitab al-Amwal, Cairo, 1353 A. H.
- Abu Yousuf, Yaqub bin Ibrahim, Kitab al-Kharaj, Cairo, 1352 A.H.
- Alusi, Shahabuiddin, Syed Mahmood, Rooh al-Maani, Cario, 1345 A.H.
- Ayni, Badr al-Din, Umdat al-Qari: Sharh Sahih al-Bukhari, Cario, 1348 A. H.
- Baihaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain, Sunan.
- Bazdawi, Abid al-Hassan 'Ali Ibn Muhammad, Al-Kashf, Istanbul, 1308 A.H.; al-Kubra, Hyderabad, 1352 A. H.
- Bukhiri, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, Sahih, Bulaq, 1879.
- Darimi, 'Abdullah bin Abd al-Rahman, Sunan, Lucknow, 1876.
- Ghazzali, Abu Hamid Muhammad, al-Mustasfa min llm al-Usul, Cairo, 1937; al-Wajiz, Cairo, 1317 A. H.
- Ibn Hanbal, Abu 'Abdullah Ahmed, al-Musnad, Cairo, 1895.
- Ibn Hisham, 'Abd al-Malik, al-Sirat al-Nabawiyyah, Cairo, 1955.
- Ibn Khaldun, Abd al-Rahman Ibn Muhammad, al-Muquddimah, Cairo, n.d.
- Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid, Sunan, Cairo, 1952-54.
- Ibn Nujaim, Zayn al-Abidin Ibrahi, al-Ashbah wa al-Nazair, Calcutta, 1926.
- Ibn Qayyim al- Jawziyah, Islam ul-Muaqqin 'an Rabb al-'Alamin, Cairo, n.d.
- Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din, al-Mughni, Cairo, 1948.
- Ibn Rushd, Abu al-Wahd Muhammad ibn Ahmed, Bidayat al-Mujtahid, Cairo, 1911.

www.amarboi.org

- Jassas, Abu Bakr, Ahmed ibn Ali, *Ahkam al-Qur'an,* Cairo, 1347, A.H.
- Marghinani, Burhan al-Din, *al-Haidaya,* Cairo, 1965.
- Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad, *al-Ahkam al-Sultaniyyah,* Cairo, 1969.
- Muslim, Abd al-Husayn ibn Hajjaj al-Nishaburi, *Sahih, Bulaq,* 1873.
- Qutb, Syed, *Nahva Mujtami Islami,* Jordan, 1969.
- Razi, Fakhr, al- Din Muhammad, *al-Tafsir al-Kabir,* Bulaq, 1872.
- Shafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Risala,* Cairo, 1940.
- Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muwafaqat fi-usul al-Sharia,* Cairo, n.d.
- Subki, Taj al-Din, *Jami al-Jawami,* Bulaq, 1880.
- SuYuti, 'Abd al-Rahman ibn al-Kamil ibn Muhammad Jalal al-Din, *al-jami al-Saghir,* Cairo, n.d.
- Tabari, Muhammad ibn Jarir, Cairo, 1953. *Tafsir al-Tabari.*
- Tabrizi, Wali al-Din, Mishkat al-Masabih, Damascus, 1381 A.H.
- Tirmidhi, Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Jami,* Bulaq, 1875.

www.amarboi.org

সমাজবিজ্ঞানের ইসলামিকরণ

ড. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী

www.amarboi.org

পশ্চিমা বিশ্বে সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি

পশ্চিমা বিশ্ব যাকে বলে সমাজবিজ্ঞান তার উৎপত্তি হয় এক শতাব্দীরও আগে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই বিদ্যার অধীনে পাঁচটি জেনারেল শাখার চর্চা করা হয়। সমাজবিজ্ঞান, মানববিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইতিহাস। দুটি আরো শাখা রয়েছে যা এগুলোর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন ভূগোল ও মনোবিজ্ঞান। মাঝে মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো এলাকার সাথে যখন সমাজবিজ্ঞানের অধ্যয়ন সম্পৃক্ত হয় তখন তা একটি নতুন সমাজবিজ্ঞানে পরিণত হয়, যা ভূ-সমাজবিজ্ঞান। এমনি করে তা ভূ-মনোবিজ্ঞান, ভূ-রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূ-অর্থনীতি, ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস কিংবা সংস্কৃতিতে পরিণত হয়। যদিও আমরা জানি নিরেট ভূগোলের আর্থিক অর্থ হচ্ছে মাটির চিত্র এবং এর সাথে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সম্পর্কটাই আসল। তখন একে বলা হয় প্রাকৃতিক ভূগোল। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে। এটি যখন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে করা হয় তখন তার সাথে প্রকৃতিক বিজ্ঞানেরই একটি অংশ। কিন্তু যখন তা দল বা সমাজ কেন্দ্রিক হয়, তখন তা হয়ে পড়ে সামাজিক মনোবিজ্ঞান।

বিগত শতাব্দীতে এ সকল শাখা ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এ উৎপত্তির মূল শেকড়ের সন্ধান করতে গেলে আমাদের আরো দুই শতাব্দী আগে ফিরে যেতে হবে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যারা ইউরোপে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করতেন, তারা পশ্চিমা সংস্কৃতি ও খ্রিষ্টবাদে যুক্তি ও বুদ্ধির আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। পশ্চিম ইউরোপের অধিংকাশই মনে করতেন, ফরাসি বিপ্লব তাদের এই লক্ষ্যকে চূড়ান্তে উপনীত হতে সাহায্য করেছে। তাদের এই প্রচেষ্টা ফলাফল বিশ্ববাসীর কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য এটিকে অন্তর্জাতিক রং দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যান। ফরাসি বিপ্লবের কারণে ইউরোপে বুদ্ধিজীবী সমাজ সংশয়বাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এর আগেও তারা চার্চের আধিপত্যের বিরুদ্ধে মধ্য যুগের শেষভাগ থেকে সোচ্চার হয়ে উঠেন। তখন থেকে প্রাকৃতিকবিজ্ঞান বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যায় ও সৃষ্টিবিদ্যায় বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। প্রাকৃতিকবিজ্ঞান নিরীক্ষা ধর্মে হওয়ার কারণে যে সকল বাস্তবতা বেরিয়ে আসতে থাকে, তা অধিকাংশই চার্চের বিশ্বাসের পরিপন্থী হয়ে দেখা দেয়। চার্চপন্থীদের মধ্যে যারা যুক্তিবাদী ছিলেন তাদের যুক্তি তর্কও রহিত হয়ে যায়।

www.amarboi.org

বুদ্ধিবৃত্তিক এই যুগেও প্রায়োগিক ধারাই জয় হয়। নিরীক্ষাধর্মী গবেষণাই প্রতিপক্ষকে হারাতে সক্ষম হয়। অনুমান ভিত্তিক সকল পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পূর্বপুরুষদের বুদ্ধিবৃত্তিক ভুল-ভ্রান্তিগুলো তুলে ধরলো অগাস্ট কোঁত। তিনি তাদের বুদ্ধির যুক্তি প্রত্যাখানের বর্ণনা দেন এবং ধারণা ও বিশ্বাসভিত্তিক যুক্তি চর্চার সমালোচনা করেন। কোঁত নিজেও ছিলেন বুদ্ধিবৃত্তিক নতুন ধারার সাথে চার্চের হঠকারীতার সাক্ষী। সৌভাগ্যবশত তিনি চার্চের পতনও প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি যখনই ভবিষ্যতের দিকে তাকাতেন আশাবাদী হতেন। তিনি নতুন এক ভোরের উন্মেষ দেখতে পান। যেখানে ইতিবাচক মনের বিকাশ ঘটবে দ্রুত গতিতে। তিনি নতুন এক বিশ্বের স্বপ্ন দেখেন। যেখানে মানবজাতি থাকবে সকল কুসংস্কার থেকে মুক্ত। এই যুক্তির কল্যাণে মানুষ পৃথিবীতে তার যথাযথ মর্যাদা লাভ করবে। কোঁতের বক্তব্য ছিলো মানুষকে হতে হবে প্রায়োগিক শিক্ষার ধারক ও বাহক। তার জ্ঞান চর্চার প্রতিফলন জীবনব্যবস্থায় দেখা দিতে হবে। মানুষের উপর স্বাস্থ্যবিজ্ঞান যেমন তার উপস্থিতি সরবে ঘোষণা করে, তেমনি সমাজবিজ্ঞানের প্রতিফলন দেখা দিতে হবে মানুষের সামাজিক জীবনে ও দলের সামষ্টিক জীবনে। নতুন জ্ঞান চর্চার পদ্ধতি হবে বাস্তবভিত্তিক যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকবে না। নতুন বিজ্ঞান যেহেতু তার প্রয়োগ বস্তু জগতে প্রমাণ করেছে। সেহেতু এই সফলতাকে মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে হবে।

প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের কিছু নমুনা

আমরা যে বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের কথা বলেছি, তার মূলে ছিলো প্রাকৃতিকবিজ্ঞানের নিরীক্ষাধর্মী গবেষণা। এর মূলনীতি ছিলো এটাই বিশ্বাস করা যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে মানবিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এবং এরই মাধ্যমে একটির সাথে আরেকটির তারতম্য উপলব্ধি করা যাবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই ক্ষেত্রে ব্যক্তির মন মানসিকতা যাতে সত্য উদঘাটনের প্রচেষ্টায় কোনো প্রভাব বিস্তার না করে। এই নীতি অবলম্বন করলে উদঘাটিত সত্য হবে সার্বজনীন। যার উপর ব্যক্তি ও এলাকার কোনো প্রভাব প্রতিলক্ষিত হবে না। নতুন এই জ্ঞান চর্চার পদ্ধতিতে পবিত্র বিশ্বাস বলতে কিছু থাকতে পারে না। সবকিছুই হতে পারে নিরীক্ষা ও সংশয়যোগ্য। একটি গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আরেকটি গবেষণার ফলাফল তা খণ্ডন করতে না পারে। যখন কোনো মতবাদ গবেষণার ফলাফলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে তখনই তা একটি স্বতঃসিদ্ধে পরিণত হতে পারে।

www.amarboi.org

নতুন এই বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গবেষণার আওতায় ফেলা হয়। তাই প্রকৃতিও মানবজাতির কাছে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হতে থাকে। মানবজাতি বাহ্যিক প্রপঞ্চসমূহের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা অর্জন করল। কোনো প্রপঞ্চ বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি হয়ে পড়ে। তা পর্যালোচনা করে কারণগুলো বের করা। এই কারণগুলো চিহ্নিত করেই মানবজাতি নির্দিষ্ট প্রপঞ্চের উপর তার নিয়ন্ত্রণ লাভের সক্ষমতা অর্জন করে। এভাবেই মানুষ সৃষ্টির সেরা হিসেবে পৃথিবীতে নিজের কর্তৃত্ব জোরদার করে নতুন এই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চার কল্যাণে। এটিকে মনে করা হয় শক্তি ও সৌভাগ্যের উৎস। নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমা মানুষের মাথায় জেঁকে বসে। যার কারণে সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্বব্যাপি প্রাকৃতিক রহস্য উদঘাটন করে তারাই তা কাজে লাগাতে পারে নিজেদের স্বার্থে। তারা যে লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে পারে তা আর স্বপ্ন রইল না। নিজেদের আদলে আদর্শ জীবন তারা গড়তে সক্ষম হলো। এক পর্যায়ে যেই জ্ঞান চর্চার পদ্ধতি তারা প্রকৃতির উপর প্রয়োগ করে আসছিল তা তারা মানবতার উপর প্রয়োগ করার উদ্যোগ নেয়। এই জ্ঞান পদ্ধতির প্রতিফলন তারা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে দেখতে চায়। তারা মনে করতে থাকে এই দুইই প্রকৃতির প্রতিনিধি। একই স্বতঃসিদ্ধের আওতায় না হলেও একই পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসতে হবে। পূর্বপুরুষগণ সমাজকে যে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন এই পদ্ধতির মাধ্যমেই তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল জ্ঞান-বিজ্ঞান অগ্রগতির সাথে সামাজিক উন্নয়ন তাল মেলাতে পারছিলো না। কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন করতে হলে আনতে হবে দ্রুত গতির পরিবর্তন। এজন্য বুঝতে হবে সমাজে ব্যক্তির আচরণ ও মানসিকতা। অচিরেই তারা উপলব্ধি করতে পারলেন তা সম্ভব একমাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতির মাধ্যমে। এই পদ্ধতির ফলাফলের আলোকেই সম্ভব সমাজকে বুঝে দিকনির্দেশনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

পশ্চিমা জ্ঞান পদ্ধতির ত্রুটি

পশ্চিমা কোনো বিদ্যার্থী যখন মানুষ ও সমাজের প্রকৃতি অধ্যয়ন করতে যায়। তখন এটা বুঝে না যে, সকল মানবিক বাস্তবতা যান্ত্রিক ও প্রায়োগিক নিরীক্ষার আলোকে বুঝা সম্ভব নয়। কেননা মানবিক প্রপঞ্চ শুধু দৃশ্যমান প্রাকৃতিক উপাদানে মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরঞ্চ এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আরো ভিন্নধর্মী উপাদান। তা হতে পারে আধ্যাত্মিক ও চরিত্র সম্পর্কিত। এই সকল বিষয় কখনো যান্ত্রিক ও প্রায়োগিক গবেষণার নিরিখে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। এগুলো কখনো বিশ্বজনিত

www.amarboi.org

স্বতঃসিদ্ধের আওতায়ও পড়তে পারে না। বরঞ্চ তা হতে পারে সংস্কৃতি, ধর্ম, দল ও ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন। তাই কখানো তা একক বিশ্বজনিত সংজ্ঞার আওতায় আনা সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহকে তার প্রাকৃতিক উৎস থেকে ভিন্ন করা সম্ভব নয়। এর নিরীক্ষা কোনো একক পদ্ধতির আওতায় আনাও অসম্ভব। পরিমাণগত (Quantitative) পদ্ধতিও এ ক্ষেত্রে অকার্যকর। অনস্বিকার্য অস্তিত্ব সত্ত্বেও এই বিষয়টিকে তারা অস্তিত্বহীন মনে করেন। তারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি মানবিক আচরণের অধ্যয়নেও প্রয়োগ করতে চায়, যার কারণে এমন সকল ব্যাখ্যা ও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়। তাদের চিন্তাধারা ও গবেষণাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রং দিতে সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক সত্যের বিশ্লেষণে নৈতিকতা ও অধ্যত্মিক দিকগুলোর প্রভাব ও গুরুত্বকে এড়িয়ে যায়। এর প্রভাব হয়ে পড়ে সুদূর প্রসারী। আজো এই শাখার জ্ঞান পদ্ধিতিতে এমন কোন উপাদান নেই যার আলোকে মানবিক অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য্য আধ্যাত্মিক পরিপ্রেক্ষিতগুলো বিশ্লেষণ করতে পারি।

সমাজবিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে তারা প্রথমে যে পদ্ধতিগত ভুলটি করে তা বুদ্ধিজীবী সমাজকে আরেকটি ভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। সমাজবিজ্ঞানের প্রধান শর্ত হচ্ছে, এই বিষয়টি অধ্যয়ন করতে হবে এমন সকল স্বতঃসিদ্ধের আলোকে যাতে সমাজের প্রকৃতি সত্যভাবে ফুটে উঠে। এখানে তাকে সব ধরনের ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব পরিহার করতে হবে। পূর্বনির্ধারিত ধারণা ও সিদ্ধান্তও বর্জন করতে হবে। সামাজিক প্রকৃতি নিরপেক্ষ সূত্রের আলোকে নিজেই প্রতিভাত হবে। কিন্তু অধিকাংশের বদ্ধমূল ধারণা হয় এত পদ্ধতিগত কঠোরতা অবলম্বন করলে সামাজিক প্রকৃতি রহস্য অবশ্য উদঘাটিত হবে। অতঃপর তার উপর চালানো হবে বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা পদ্ধতি। কিন্তু বাস্তবতা হলো যে, মানুষের আচরণ সম্পর্কিত সত্যাবলি ও প্রাকৃতিক সত্যাবলির মধ্যে পার্থক্য অনেক। মানবিক আচরণ প্রাকৃতিক রহস্যের বিপরীতে প্রাণচাঞ্চল্যতায় পরিপূর্ণ। যে ব্যক্তি এ নিয়ে গবেষণা করবে তার পছন্দ অপছন্দের বিষয়ও তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে। প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে অনেক রহস্যই উদঘাটন করতে নারাজ। গবেষক যে পুরুষ বা নারীদের নিয়ে গবেষণা করবেন তার সামনে হয়তো তারা তাদের প্রকৃত ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করল না। এর একটি কারণ হয়তো এটাই যে, তাদের প্রতি গবেষকের কোনো সহানুভূতি থাকতে পারে না। যাদের উপর গবেষক তার গবেষণা করবেন তারা হবেন শুধু মাত্র Subject। বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্যবোধ নিয়ে আমরা ব্যক্তি প্রভাবের আধিক্যই দেখতে পাই। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যক্তির

www.amarboi.org

প্রভাব কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না। সত্য সেখানে নিজস্ব সূত্র ধরেই প্রতিভাত হয়।

কিন্তু গবেষক যখন মানবিক মূল্যবোধের মূল্যায়ন করতে যান তখন তিনিই নির্ধারণ করেন তৎসম্পর্কিত সত্য। কিংবা তিনি নিজেও হয়তো সার্বজনিত কারণে পরিস্থিতির শিকার হয়ে বাস্তবতার সমর্থন বা বিরোধিতা করতে পারেন। মূল্যবোধের মূল্যায়ন অনেকটা নির্ভর করে ব্যক্তি গবেষকের বুঝার সক্ষমতার উপর। অনেক সময় বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও মূল্যবোধের মূল্যায়ন করা সম্ভব। কখনো এটা বলা যাবে না যে, মূল্যবোধ যতক্ষণ পর্যন্ত গবেষকের মন মানসকে প্রভাবিত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মূল্যবোধটাকে বুঝা সম্ভব নয়। তবে এটিও অনিবার্য সত্য যে, নির্দিষ্ট কোনো মূল্যবোধকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে গবেষককে সেই মূল্যবোধ সম্বলিত পরিবেশে মিশে যেতে হবে। তাকে পরিবেশের সাথে

ভাবের আদান প্রদানে লিপ্ত হতে হবে। মূল্যবোধজনিত বাস্তবতাই নির্ধারিত হবে গবেষকের সেই বাস্তব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির উপর। তাই আমরা দেখতে পাই পশ্চিমা ব্যক্তি ও সামাজিক আচরণ নিয়ে পশ্চিমা গবেষকগণ যা কিছু চর্চা করেন তার ফলাফল ও স্বতঃসিদ্ধ অনেকটাই পশ্চিমা ধাঁচের হয়ে থাকে। তাদের এই ধারণা ও স্বতঃসিদ্ধসমূহ কখনো কোনো মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না।

গবেষণা পদ্ধতি প্রবর্তনের শুরুতেই পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানীগণ দাবি করেন তাদের গবেষণা সম্পূর্ণ বিষয়কেন্দ্রিক। কিন্তু বাস্তবে এটা আমাদের ভালোভাবেই জানা তা হচ্ছে অসম্পূর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট। কিন্তু ভেলসী তার জ্ঞান সংক্রান্ত সমাজবিজ্ঞান প্রচার হওয়ার আগে তারা কখানো উপলব্ধি করতে পারেননি যে তাদের তথাকথিত বিষয়কেন্দ্রিকতা অলিক কল্পনা বাদে কিছুই নয়। তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় আদি সমাজকে কেন্দ্র করে যে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা চালায় তা অনেকটা নিরেট বস্তুবাদি প্রকৃতির। এই ক্ষেত্রে যিনি গবেষণার প্রথম উদ্যোগ নেন তাঁর সমালোচনার সাহস কেউ পাননি। তখনই তারা উপলব্ধি করেন মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিদ্যায় তারা যতই উন্নতি লাভ করুক না কোনো অন্য সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতি বুঝতে হলে তাদের পশ্চিমা মানসিকতাপূর্ণ গবেষণা পদ্ধতি কোনো কাজে আসবে না। নতুন বাস্তবতার রঙে নিজেদের রঙিন করতে হবে। এ বাস্তবটি অবশ্য সমাজবিজ্ঞানীদের আগে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ধর্ম গবেষকগণ উপলব্ধি করেন। নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমরা বলতে পারি সমাজবিজ্ঞানের যত জ্ঞান তা বৈচিত্র্যতায় পরিপূর্ণ

www.amarboi.org

কোনো ধারণ করণের আওতায় তা আনা সম্ভব নয়। বাস্তব অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ পর্যালোচনা ছাড়া বস্তুনিষ্ট গবেষণা চালানো যাবে না। বাস্তবতা ও সত্যকে উপলব্ধি করতে হলে তার সাথে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে হবে। গবেষক যদি নির্দিষ্ট সমাজ ও ব্যক্তির সাথে আন্তরিকতার সাথে মিশতে না পারেন তাহলে তৎসংক্রান্ত বাস্তবতা কখনো উন্মোচিত হবে না। তবে এই মেলামেশার জন্যও প্রয়োজন সঠিক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা। উল্লেখিত শর্তগুলোর একটিরও যদি অভাব থাকে তাহলে গবেষণা কখনো বস্তুনিষ্ট ও নিরপেক্ষ হবে না।

ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও জাতিগত মূল্যবোধ

এযাবৎ আলোচনা থেকে এটাই প্রতিভাত হলো যে, পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞান অনেকটাই অসম্পূর্ণ। আরো হয়তো বুঝে এসেছে যে, তা পশ্চিমা পক্ষাপাতদুষ্ট। তাই একজন মুসলমান ছাত্র বা গবেষকের জন্য তা কখনো ব্যক্তি ও সামাজিক বাস্তবতা উপলব্ধির মানদণ্ড হতে পারে না। তাছাড়া পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানের অনেক পদ্ধতিই ইসলামি জ্ঞান পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক।

ইসলামি জ্ঞান পদ্ধতির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে সত্যের একাত্ববাদ। এর অর্থ হলো সত্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলির একটি। তাই আল্লাহ তায়ালা যেমন এক, সত্যও তেমনি এক। বাস্তবতার অস্তিত্ব আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব থেকে পৃথক হতে পারে না। সত্য এক আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি তাই আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছে তার একমাত্র কারণ। তদুপরি সত্যের মূল্য ও অর্থ উভয়ই তার ইচ্ছায় নির্ধারিত হয়। তার ইচ্ছাই হচ্ছে সত্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই ব্যক্তি ও সামাজিক মূল্যবোধ নির্ধারিত হবে। মুসলিম সমাজবিজ্ঞানীকে বিশ্বাস করতে হবে যে সত্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছারই প্রতিফলন। সত্যের মূল্যায়ন করতে হবে মূল্যবোধের সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ তা বিবেচনা করে। ইসলামি জ্ঞান পদ্ধতিতে এর বাইরে সত্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই যখনই আমরা মানবিক সত্যগুলো উদঘাটন করতে যাব তখন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো সামনে রাখব। তাছাড়া দেখতে হবে সত্যের মানদণ্ডে তা কতটুকু মূল্যয়নের দাবিদার।

ইসলামের জ্ঞান পদ্ধতির সাথে ঐ মূলনীতির তারতম্য অনেক যাতে আধ্যাত্মিকতার উপর জোর দেওয়া হয়। তা হলো ইসলামি জ্ঞান পদ্ধতির একটি বাড়তি বৈশিষ্ট রয়েছে। এই বৈশিষ্টটি হচ্ছে জাতি সত্ত্বা সংক্রান্ত মূলনীতি। এই মূলনীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বলতে কিছু থাকতে পারে না। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সাথে

www.amarboi.org

সম্পর্কও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাই মূল্যবোধের উপলব্ধি ও বাস্তবায়নও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। ইসলাম এ বিষয়ে জোর দেয় যে আল্লাহ তায়ালার প্রত্যাদেশ ও নৈতিকতা সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা সবই সমাজ নিয়ে। মূল্যবোধ জাতির সামাজিক ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই মূল্যবোধ ছাড়া সমাজ এক কথায় অচল। এর কারণ এটাই যে, ইসলাম জাতিগত উন্নয়ন সামনে না রেখে তাকওয়া বা নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করে। নামাজের কথাই ধরা যাক। দেখা যায়, এটি আল্লাহ তায়ালার সাথে তার বান্দাদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ। কিন্তু আরেকটু উপলব্ধি করলে দেখা যাবে, আসলে এটি সামাজিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির একটি মাধ্যম। আর নিঃসন্দেহে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয় ।

এটি অনস্বীকার্য যে, ইসলামি ব্যবস্থার মূল্যবোধ এই সকল বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল। এজন্যই হয়তো এই ব্যবস্থাপনায় সন্যাসবাদ, চিরকুমারিত্ব নিষিদ্ধ। এই ধর্মের আইনী ব্যবস্থায় আমরা ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন দেখতে পাই। তবে সাধারণ প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এই সব মূল্যবোধ বাস্তবায়িত হতে পারে একমাত্র ইসলামি রাষ্ট্রে। এখানেই আমরা খ্রিষ্টবাদ ও ইসলামের পার্থক্য উপলব্ধি করার প্রয়াস পাব। খ্রিষ্টবাদে পরিত্রাণের জন্য সদিচ্ছাই যথেষ্ট। কিন্তু ইসলামে এই সদিচ্ছা বাস্তবায়ন জরুরি, যাকে আমল বলে জানি। তবে আমলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে এই সদিচ্ছা বা নিয়্যাত। এই নিয়্যাত হচ্ছে নিজেকে ও মূল্যবোধকে আল্লাহ তায়ালার তরে উৎসর্গ করা। তাই পার্থিব কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে বিবেক। ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসই সাক্ষী যে, এর আইন, আদালত, শাস্তি ও প্রতিদান সবই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও নির্দেশনাকে ঘিরে আবর্তিত। ইসলামি মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান, আইন এমনকি শিক্ষাব্যবস্থা সবই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার প্রতিফলন। আল্লাহ তায়ালার ওহীভিত্তিক নির্দেশনাসমূহে আমরা তারই প্রতিফলন দেখতে পাই। এই সকল নির্দেশনার বাস্তবায়ন আমরা যুগ যুগ ধরে জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্যেই প্রতিভাত হতে দেখতে পাই। মূল্যবোধজনিত বিদ্যার বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত ও জাতিগত বিশেষ পরিপেক্ষিত একে অপরের সম্পূরক এবং পরিবর্তনযোগ্য। এই সকল কিছুর সত্য নির্দিষ্ট মূল্যবোধ ছাড়া উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আর ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ কখনো জাতিগত সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা হাই বিন ইয়াকজান এর ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনি যখন নিজ চেষ্টা সাধ্যের পর ইসলামের প্রাকৃতিক যুক্তি আবিষ্কার করলেন তখন এই বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের

www.amarboi.org

জন্য সাগরময় ঘুরে বেড়ান এমন সকল জাতির খোঁজে যারা এই স্বাভাবিক যুক্তি ছাড়াই কালাতিপাত করছে।

পশ্চিমা বিশ্ব জ্ঞান পদ্ধতির স্বার্থে মানবিকবিজ্ঞান থেকে সমাজবিজ্ঞান পৃথক করে। এই পৃথকিকরণের কারণে সকল মূল্যবোধকে সমাজবিজ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়। শুধুমাত্র যতসামান্য কয়টি ব্যতিরেকে যেগুলো সংকীর্ণ চূড়ান্ত লক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল। জ্ঞানগত বস্তুনিষ্ঠতা তখন মানবিক বিজ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পরে। এগুলোর গুরুত্ব ও প্রয়োগ আরো নির্দিষ্টভাবে নিরেট ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর যখন এভাবে সমাজবিজ্ঞান সকল মূল্যবোধ থেকে শুন্য হয়ে পড়ল তখন অন্যান্য সকল অশুভশক্তির সামনে ভঙ্গুর ও দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশ্বায়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে তা হয়ে পড়ে আঞ্চলিক। প্রতিটি সমাজ নিজস্ব মাপকাঠির মানদণ্ডে বাস্তবতার বিচার করতে লাগল। বাস্তবতা কেন্দ্রিক মূলনীতি অতঃপর মূল্যবোধের স্বতন্ত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক সত্ত্বার আলোকেই সমাজবিজ্ঞানের বাস্তবায়ন বিশ্লেষণ হতে থাকে। নতুন এই জ্ঞান পদ্ধতি সমাজের জন্য যেন নিয়ে আসে ব্যাপক অবক্ষয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা কেনযির যৌনতা সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণার কথাই বলতে পারি। তার গবেষণার ফলে ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার চাইতে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপরই জোর দেওয়া হয়।

মানবিক বিভাগকে যখন বিজ্ঞানের এলাকা থেকে বহিষ্কার করা হয় তখন পদ্ধতিগত শৃঙ্খলা থেকেও তা অনেকটা মুক্ত হয়ে যায়। এতে করে এর মূল্যায়নেও ব্যাপক ঘাটতি দেখা দেয়। জ্ঞানগত সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড না থাকার কারণে এই ক্ষেত্রটি বস্তুনিষ্ঠতাও হারিয়ে ফেলে। ফলে পরিণত হয় সন্দেহ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও অপনোদনের কুরুক্ষেত্র। এতে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিশ্বাস, নৈতিকতা, আশা, কল্যাণ কামনা, দায়িত্ব ও সৌন্দর্যের মতো অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো। এর প্রভাব ছিল সুদুর প্রসারী। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই জীবন ইতিহাসের বিভিন্ন বিকৃত ধারায়। ইসলামি সমাজবিজ্ঞানে এটা স্বীকার করে নিতে হবে মানবজাতি মূলত আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি। আর এই খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব চর্চার প্রধান ক্ষেত্র সমাজ। এই সমাজ নিয়ে যে বিজ্ঞান চর্চা করবে তাকে ব্যক্তি কেন্দ্রিক না হয়ে হতে হবে বৈশ্বিক ও জাতি কেন্দ্রিক। ইসলামি পরিপ্রেক্ষিতে যখন মানব কেন্দ্রিক যে কোনো অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ইসলামি জ্ঞান পদ্ধতি মানবিক ও সামাজিক বিভাজনকে অস্বীকার করে। বরঞ্চ শুধুমাত্র প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ও জাতিবিজ্ঞানের বিভাজনের স্বীকৃতি দেয়। আর এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে দুটি অবিচ্ছেদ্য শাখা। একটি মানবিক ও অন্যটি সামাজিক।

www.amarboi.org

সমাজবিজ্ঞানের ইসলামিকরণ

ক. জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা যেমনি হোক না কেন তার বিকাশ হতে হবে তাওহীদের পাতাকাতলে। হোক না তা ব্যক্তি কিংবা সমাজ সম্পর্কিত, ধর্ম কিংবা বিজ্ঞান সম্পর্কিত। তাকে অবশ্যই স্রষ্টা, মালিক, দাতা, রিজিকদাতা এক আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত হবে হবে। তিনিই হচ্ছেন সকল কারণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের স্রষ্টা। বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতা তার ইচ্ছা ও প্রজ্ঞাপ্রসূত। মানবিক সকল ইচ্ছা ও সংগ্রাম তার ইচ্ছা ও আদর্শেরই প্রতিফলন। তাই সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকনির্দেশনা তার ইচ্ছা ও নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আর তা সম্ভব ওহীভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই প্রচেষ্টাই মানবজাতির জন্য নিয়ে আসতে পারে সৌভাগ্য ও প্রগতি।

খ. যে বিজ্ঞানে আমরা মানবজাতি ও তার মিথস্ক্রিয়া নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করব তাকে প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে যে, মানুষ মূলত এমন এক রাজ্যের বাসিন্দা যা চলে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ে তার ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল। মানবজাতির ইতিহাস চর্চা করলেই আমরা একক প্রভুত্বের নিদর্শন প্রতিফলিত হতে দেখতে পাই। ইসলামি জ্ঞান চর্চার ধারায় মানবিক ও সামাজিক শিক্ষায় পার্থক্য সৃষ্টি করার কোনো অবকাশ নাই। বরঞ্চ জ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিজ্ঞান, এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারে। মানবিক বিজ্ঞান হবে জাতি সম্পর্কিত অধ্যয়ন যার অন্তর্ভুক্ত হবে মানুষ ও সমাজ। যদি আমরা মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে কখনো সমাজবিজ্ঞান নামকরণটি প্রয়োগের উদ্যোগ নেই। এখনো এই বিষয়ে আমাদের পশ্চিমা জ্ঞানধারা চ্যালেঞ্জ করতে হবে যারা এটিকে মানবিকবিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, সমাজ অধ্যয়ন কখনো আচরণবিধি ও মূল্যবোধ থেকে খালি হতে পারে না। অন্যান্য যে কোনো বিদ্যা যেমন- দর্শন, তর্কবিজ্ঞান, আইন, কলা ইত্যাদির মতো এরও রয়েছে চর্চার কঠোর বিধিনিষেধ। পশ্চিমা বিশ্বের বিপরীতে আমাদের মানবিক বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করা। এই লক্ষ্যে একই মূলনীতি ও মানদণ্ড নির্ধারণ করে সত্য উদঘাটন করে তা যাচাই করা যেতে পারে।

www.amarboi.org

গ. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কারণে জাতিগত অধ্যয়নকে কখনো খাট করে দেখা উচিত নয়। মানবজ্ঞানের জগতে উভয়েরই সমান মর্যাদা রয়েছে বলা যায়। পার্থক্য শুধুমাত্র বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে জ্ঞান পদ্ধতির ক্ষেত্রে নয়। প্রাকৃতিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হচ্ছে জড়বস্তু আর সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্র হচ্ছে মানবিক অস্তিত্ব ও কর্মকাণ্ড।

বিষয়বস্তুগত তারতম্যের কারণে প্রত্যেকের জ্ঞান, পদ্ধতি ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু ঐশ্বরিক আদর্শ উপলব্ধির ক্ষেত্রে উভয়ের জ্ঞান চর্চা সম্পর্কিত বিধিবিধান একই ধাঁচের। ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই আমাদের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছে তার বাণীর মাধ্যমে। এই বাণীগুলো সহজেই বোধ ও বুদ্ধির মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে অনেক কিছুই আমরা প্রমাণও আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি এবং এই ধরনের প্রচেষ্টা এখনো জারি রয়েছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন ইবাদত সম্পর্কিত গুণাবলি, অজানা অতীত যা কোনো জ্ঞান ও যুক্তির আলোকে উদঘাটন করা অসম্ভব। তবে জোর দিয়ে বলা যায় এর বাইরে এমন কিছু নেই যা মানুষের বুদ্ধি বৃত্তিক কৌশলের উর্ধ্বে অবস্থান করতে পারে।

ঘ. পশ্চিমা বিশ্ব দাবি করে নিরপেক্ষ হওয়ার কারণেই সমাজবিজ্ঞানে বিজ্ঞানসম্মত বিষয় বলা সমুচিত। এখানে মানবিক ইচ্ছার প্রভাব দেখা যাবে না। সত্যকে তার মতই উপস্থাপন করে এবং এই বিজ্ঞানে সত্যকে তার মতো বলতে দেওয়া হয় অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু তাদের দাবি আমাদের কাছে কিছুটা অন্তসারশূন্য মনে হয়। কেননা, কোনো সত্যকে তার মূল্যবোধজনিত সম্পৃক্ততা ছাড়া উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই মূল্যবোধের অস্তিত্ব ছাড়াই যে ফলাফল বা সতঃসিদ্ধে উপনীত হবে তা হবে অপূর্ণ। তাই মূল্যবোধ ছাড়াই যখন কোনো পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক বাস্তবতা উপস্থাপন করবে তখনও ধরে নিতে হবে তা বিশ্বজনীন নয়। বরঞ্চ পশ্চিমা মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত বাস্তবতা। বিধায়, তা অন্যান্য সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। এই সমাজবিজ্ঞানী যখন মানবিক ধর্ম নিয়ে আলোচনা করবেন তখন তা হবে বাস্তবে খ্রিষ্ট ধর্মীয় আলোচনা। যখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূত্রের প্রসঙ্গ আসবে তখন বাস্তবে তা হবে পশ্চিমা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থারই প্রতিফলন মাত্র।

ঙ. সর্বশেষে বলা যায় সমাজবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য উদঘাটনই হতে হবে চূড়ান্ত লক্ষ্য। এই জন্য স্রষ্টার সাথে সমাজের সম্পৃক্ততার বাস্তবতাও

www.amarboi.org

তুলে ধরতে হবে। ঐশ্বরিক গুণাবলি ও বাস্তবতার আলোকেই সার্বজনীন সত্যের বিশ্লেষণ সম্ভব। কেননা, এর উপর বাস্তবতা বিশ্লেষণের সফলতা নির্ভরশীল। যখনই আমরা বাস্তবতার বিশ্লেষণ করব তখনই সকল বিষয়বস্তুর মূলভিত্তিকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। ঐশ্বরিক আদর্শ যে শুধুমাত্র অস্তিত্বের পবিত্রতাসম্পন্ন মানদণ্ড তা নয়। বরঞ্চ এটাই হচ্ছে বাস্তবতার মূল নির্যাস। যেহেতু সত্য ও বাস্তবতাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার নামান্তর। মানবপ্রকৃতি সমাজ ও জাতি প্রতিটি পর্যায়ে এই সত্য গভীরভাবে প্রোথিত। এই পবিত্র প্রপঞ্চটি হচ্ছে সকল জ্ঞান বিজ্ঞানেরর জন্য প্রবাহমান নদী। ইসলামি আদর্শে যখনই আমরা মানবিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করব, তখনই এই ঐশ্বরিক আদর্শ আমাদের সামনে রাখতে হবে। এর সাথে সম্পৃক্ত বাস্তবাতাকেও প্রত্যায়ন করতে হবে। এই বাস্তবতাই হবে সকল জ্ঞান শক্তির উৎস। তাহলেই আমরা কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ বাস্তবায়নের পথে বাধাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হব। এই নিয়ামকের আলোকেই আমরা জাতির অন্যান্য জাতিগত নিয়ামকসমুহের বিশ্লেষণে এগিয়ে যেতে পারব।

একজন ইসলামি সমাজবিজ্ঞানী লক্ষ্য উদ্দেশ্য হিসেবে ইসলামকেই সামনে রাখবে। মানবিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক আদর্শের উপরই গুরুত্ব দিবে বেশি। তখন যে মূল্যবোধসম্পন্ন জ্ঞান পদ্ধতির আলোকেই সমাজবিজ্ঞান তাই নয় বরঞ্চ প্রয়োজনে ঐশ্বরিক আদর্শের আলোকে সত্য বাস্তবতারও সমালোচনা করবে।

এর বিপরীতে সমাজের দৃশ্যমান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সমালোচনা করতে পারে না। তিনি শুধু বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমগুলোর ত্রুটি বিচ্যুতির উপর আলোকপাত করতে পারেন। এর প্রতি কোনো সমর্থনও ব্যক্ত করতে পারেন না। কিন্তু নির্ধারিত এই মূলনীতিও তারা প্রায়শই ধরে রাখতে পারেন না। পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানীরা তাদের পূর্বপুরুষদের চার্চের বিরোধিতার কারণে বর্তমানে সমাজের সাথে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ককে অস্বীকার করেন। তাছাড়া তাদের সামাজিক বিষয়বস্তুসমূহের বিশ্লেষণ হচ্ছে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বলেই বিবেচিত। সর্বোপরি এই বিশ্লেষণকে গোষ্ঠিগত বলা যায়। পক্ষান্তরে একজন মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী খোলামেলাভাবেই ইসলামি মূল্যবোধের অনুসরণ করে। তার সমালোচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা হবে এই আদর্শেরই আলোকে। তা করতে গিয়ে যদি তার মুসলিম সহকর্মীরাও কোনো ধরনের ভিন্ন দিকনির্দেশনা দেয় সেটা তিনি মেনে নিবেন নির্দ্বিধায়। তার মতে সত্য ও বাস্তবতা প্রতিফলিত হয় বিজ্ঞানমুখী বিশ্লেষণ ও আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসা তথ্য ও

www.amarboi.org

উপাত্তের মাধ্যমে। কুরআনের তথ্যের আলোকে ঐশী বাণীর বিশ্লেষণ করাও তার একটা গুরুদায়িত্ব। উল্লিখিত উভয় ধরনের তথ্যই মূলত আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। এদের কোনোটির মধ্যেই গোপন বলতে কিছু নয়। উভয়ের বৈশিষ্ট্য উন্মুক্ত। উভয় ক্ষেত্রেই বোধ ও বুদ্ধির প্রাধান্য বিরাজমান।

উপরল্লিখিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে বলা যায় একজন মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী সহজেই বিচার বিশ্লেষণের নতুন এক পদ্ধতি সমাজবিজ্ঞানকে উপহার দিতে পারে। শুধুমাত্র অর্জনকে সামনে রেখে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয় তার কারণে পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞান অনেকটাই দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে এই বিদ্যা কৌশল বা ছল ছাতুরির বিদ্যায় পরিণত হয়। তবে এই কৌশলগত অধ্যয়নের মাধ্যমে যে লক্ষ্য অর্জিত হয় কোনো ব্যক্তি সেটিকে চূড়ান্ত বলে দাবি করতে পারে না। ইসলামি জ্ঞান পদ্ধতি অনুসরণ করার কারণে একজন মুসলিম বিজ্ঞানী মনে করে মানবজাতি হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার খলিফা বা প্রতিনিধি। ইতিহাস জুড়ে তার দায়িত্বের প্রতিফলন দেখা যায় মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার মধ্যে। তাই ইসলামি সমাজবিজ্ঞান প্রচলিত সমাজবিজ্ঞানের সাথে মানবিক বিষয়গুলো সংযুক্ত করতে পারে। নতুন এই অধ্যয়নে মানবিক জীবনে মানব আদর্শেরই প্রাধান্য বিরাজ করবে। অথচ পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানে মানবিক আদর্শ ছিলো এক ধরনের প্রহসনসম গৌন বিষয়। গোপন শক্তির কাছে যা ভীষণ অসহায়।

কার্যকরিতা প্রসঙ্গে কিছু প্রস্তাবনা

বিশ্বব্যাপি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের সংখ্যা অপর্যাপ্ত। আমাদের জানা মতে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও নেই যা দাবি করতে পারে যে তাদের সমাজবিজ্ঞান ইসলামি ধারায়। তবে এটাও অনস্বীকার্য যে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এমন অনেক ইসলামি কেন্দ্র রয়েছে যেগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ইসলামি জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বড় বাধা হচ্ছে মানব সম্পদের অপ্রতুলতা। আমাদের মাঝে এম. এ, পি.এইচ ডি ধারি হাজারো শিক্ষিতজন রয়েছে। কিন্তু তাদের খুব অল্প সংখ্যকের মাঝে সঠিক বোধ রয়েছে যার অনুপ্রেরণায় তারা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইসলামি বৈশিষ্ট্যের সংযোগ সাধন করবে। পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার মগজ ধোলাই প্রক্রিয়ার ফসল হচ্ছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা। তাই তাদের অধিকাংশকেই জ্ঞান বিজ্ঞানের ইসলামি ভাবধারার বিরোধিতা করতে দেখা যায়। আর বাকিরা এ বিষয়ে নির্লিপ্ত মনোভাব বজায় রেখে দিনাতিপাত করছে। তারা সত্য ও বাস্তবতার ব্যাপারে সন্দিহান। না থাকে প্রভাবিত হওয়ার মানসিকতা, না থাকে প্রভাবিত করার যোগ্যতা। নিম্নে এ ধরনের সংকট থেকে উত্তরণের চারটি প্রস্তাবনা পেশ করা হলো :

www.amarboi.org

১. ইসলামি অনুশাসন মেনে চলা। মুসলিম সমাজবিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে একটি ঐক্য ফোরাম গড়ে তুলতে হবে। এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে সমস্যার গভীরতা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। বুঝাতে হবে মানব উন্নয়নের অন্যান্য সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আর মুসলিম উম্মাহর জন্য তা সামান্যতম কাজেও আসবে না। বুঝাতে হবে মানবিক কর্মকাণ্ড সবই ঐশী বাণীর আলোকে পরিচালিত হবে। এই প্রচার প্রসারই হবে মুসলিম সমাজবিজ্ঞানীদের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তবে এর সদস্য হবে তারাই যারা দ্বীনি অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত। ইখলাস ও কল্যাণকামিতা যাদের জীবন পাথেয়। সৌভাগ্যের বিষয়, বাস্তব বিশ্বেও এ ধরনের সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে যার বয়স এখন ছয় বছর। যদি তা না থাকত তাহলে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমরা পরিকল্পনার বেড়াজালেই আবদ্ধ থাকতাম।

২. এই ধরনের সংগঠনগুলোর সাথে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। এতে তারা মানব সম্পদ সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাবে। মুসলিম সমাজবিজ্ঞানীরাও হলগুলোতে তাদের গবেষণার ফলাফল প্রচারের প্রয়াস পাবে। আমাদের সৌভাগ্য যে, উল্লিখিত সংগঠন বিশ্ব ব্যাপি তাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্ট চালিয়ে যাচ্ছে। তবে তারা এখনও স্বপ্ন দেখে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের যেখানে তারা তাদের কর্মকাণ্ড চর্চা করবেন অবাধে।

৩. প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে এই সংগঠনকে ডক্টরেট ডিগ্রি ধারি সম্ভবনাময় ইসলামের প্রতি আন্তরিক জ্ঞানীজনদের অনুসন্ধান করবে। ঐসকল বিজ্ঞজনদেরও খুঁজে বের করতে হবে যারা ইসলামি সংস্কৃতির পাশাপাশি পশ্চিমা সংস্কৃতিকেও বোঝে কিংবা বুঝার সক্ষমতা রাখে। যাদের রয়েছে ইসলামি প্রতিভা যার মাধ্যমে তারা একাডেমিক চত্বরের বাইরেও জাতি নিয়ে গঠনমূলক চিন্তাচেতনা পেশ করতে পারে।

৪. নিঃসন্দেহে তাদের সংখ্যা খুবই কম যারা সমাজবিজ্ঞানের ইসলামি ধারায় বিশ্বাসী। যার ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করার মতো সক্ষমতাও অর্জন করেনি ইসলামি সমাজবিজ্ঞান। তাই সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রযেজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে। এই ক্ষেত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি ধারি বা তার চাইতেও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষিতদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাছাড়া সদস্য ও তার প্রয়োজনভেদে বিশেষ প্রকল্পও হাতে নিতে হবে।

www.amarboi.org

সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি কল্পে বারংবার কর্মশালা, আলোচনা সভা, সেমিনার, সিম্পজিয়ামের আয়োজন করতে হবে। এগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অধ্যয়নের বিষয়বস্তু ও গবেষণার উপকরণ

এই সকল পরিভাষা কোনো অভিধানে আমরা পাব না। তবে আমাদের তা তৈরি করতে হবে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো :

ক. সমাজবিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার জন্য প্রয়োজনীয় রেফারেন্সের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষায়িত গ্রন্থ প্রণয়ন করতে হবে। এতে করে জাতির জন্য চিন্তা যারা করেন তারা জ্ঞান চর্চার বিশাল ভাণ্ডার প্রস্তুত পাবেন।

খ. যে সকল প্রবন্ধ কিংবা সাহিত্যকর্ম ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ কিংবা কোনো সমস্যার উপর আলোকপাত করবে সেগুলোকে বিচার বিশ্লেষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও গবেষণা করতে হবে যাতে গবেষকদের ক্ষেত্র সুপ্রশস্ত হয়। এই পদ্ধতিতেই আমরা ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের পরিমাণগত
মান বৃদ্ধি করতে পারব। জ্ঞানীজনেরাও তাদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে পারবেন।

গ. সৃজনশীল কর্ম : আমরা যখন মানব সম্পদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব এবং প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ সরবরাহে সক্ষম হব, তখন আমাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হতে হবে উন্মুক্ত অধ্যয়নের আয়োজন করা। এখানে সদস্যরা ইসলামের আলোকে লিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলো উপস্থাপন করবেন। প্রতিটি শাখার প্রধান সমস্যাগুলো নিয়েও তারা তাদের চিন্তাভাবনা উপস্থাপন করবেন। এগুলো বাস্তবায়নের উত্তম পন্থা হচ্ছে বিতর্ক ও উন্মুক্ত সেমিনারের আয়োজন করা। তাছাড়া গ্রন্থ প্রণয়ন ও গবেষণার জন্য যোগ্যতম সমাজবিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে নিয়েজিত করতে হবে।

যখন ইসলামি সমাজবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম হব তখন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে উপযুক্ত পাঠ্য বই প্রণয়নের দিকে নজর দিতে পারি। এই প্রচেষ্টা দ্বিতীয় ধাপে রাখার কারণ হলো প্রশিক্ষিত শিক্ষক ছাড়া কোনো

www.amarboi.org

পাঠ্য বই কাজে আসে না। আর যদি শিক্ষক পাঠ্য বইয়ের সাথে একাত্মতা পোষণ না করে ভিন্ন মানসিকতার হয় তা হলে পরিস্থিতি আরো গুরুতর হবে। তার দৃষ্টিভঙ্গি যতই অপূর্ণ থাকুক তা ক্ষতির জন্য যথেষ্ট।

উপরিল্লিখিত পদক্ষেপ তিনটিকে একিভূত করতেও কোনো বাধা নেই। কেননা প্রত্যেকেই একে অপরের সম্পূরক। বরঞ্চ একিভূত করার লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করাই উত্তম।

এই প্রবন্ধ সমাজবিজ্ঞানের ইসলামিকরণ সময়ের দাবি। মানবজাতি, ব্যক্তি, সমাজ, প্রকৃতি ও বিজ্ঞান যে কোনো অধ্যয়নের জন্য তা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ড. ইসমাইল আল-ফারুকী মূলত এই প্রবন্ধে এই বিষয়ে জোর দিয়েছেন। এ বিষয়ে আলোচনা করতে তিনি পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের উপর আলোকপাত করে এটাও বুঝাতে চেয়েছেন যে বিভিন্ন বিষয় দিয়ে শুরু হলেও পর্যায়ক্রমে তা মানব সম্পর্কের দিকে গড়িয়ে যায়। এখানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আদর্শ ও পশ্চিমা জ্ঞান পদ্ধতি ত্রুটিগুলোও তুলে ধরেন। এই পদ্ধতির সাথে প্রকৃত বাস্তবতার সম্পর্ক নেই। পশ্চিমা জ্ঞান পদ্ধতি ও ইসলামি জ্ঞান পদ্ধতি সাংঘর্ষিক দুটি ভিন্ন পন্থা। ইসলামি পদ্ধতিতে সকল বাস্তবতার উৎস এক যদিও এর প্রতিফলনে বহুমুখী বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তার বক্তব্যের নির্যাস হলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ইসলামিকরণের আবশ্যকতা। তিনি মুসলিম বিশ্ববিদ্যলয়সমূহের মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর জোর দেন। ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা সমাজবিজ্ঞানীদের ঐক্য সংগঠন গড়ে তোলারও পরামর্শ দেন তিনি। সমাজবিজ্ঞানের গভীরে প্রোথিত ইসলামি বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকাশে প্রয়োজনীয় মানব সম্পদের প্রশিক্ষণের দিকনির্দেশনা দেন তিনি।

www.amarboi.org

গ্রন্থ পরিচিতি

সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ ও আলোচনার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। আর এ সমাজবিজ্ঞানেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে সমাজতত্ত্ব। সমাজে অবস্থানরত মানব জাতির আচার-আচরণ হচ্ছে এর মূখ্য আলোচ্য বিষয়। কেননা, বিষয়গুলো এতটাই জটিল যে সাধারণ কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্রের আলোকে মানবজাতির আচার-আচরণ ও মানসিকতা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

এ গ্রন্থে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য সমাজতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে, সাথে সাথে সমাজবৈজ্ঞানিক মতবাদসমূহের দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং চিরায়ত ইসলামি সমাজের পার্থক্যগুলোও তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়াই মূলত এ গ্রন্থটির উদ্দেশ্য।

ISBN : 978-984-8471-06-7

9 789848 471067